রঙ্গ-চিত্র

শ্রীকালিদাস রায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : জুন : ১৯৬৩

দাম : ৪·৫০

RANGACHITRA

Kabisekhor Kalidas Roy

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস, ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া অনুজা

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

কল্যাণীয়াসু

ভূমিকা

এই গ্রন্থের রচনাগুলি কবিশেখরের দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার ফল। বর্তমান শতাব্দীর সামাজিক জীবনের বহু কথা এইগুলিতে লেখক নিজস্ব সরস ভঙ্গীতে বিবৃত করেছেন। এগুলির কতকটা গল্প, কতকটা প্রবন্ধ, কতকটা নাটকীয়ত', কতকটা সাংবাদিকতা, কতকটা রম্যরচনা। সমাজসংস্কারমূলক প্রয়াসের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে কবিশেখর এগুলি রচনা করেছেন। আমাদের সামাজিক জীবনের অনাচার, অসঙ্গতি, নৈতিক দুর্বলতা, আর্থনীতিক দুরবস্থা সম্বন্ধে কবিশেখর পূর্বে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন—সেগুলির আশানুরূপ পাঠক না পেয়ে কবিশেখর নতুন সরস ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্যগুলি বিবৃত করেছেন এই শ্রেণীর রচনায় এবং প্রকাশ করেছেন দৈনিক পত্রিকায়। তার ফলে তিনি বহুসংখ্যক পাঠকপাঠিকা পেয়েছেন। বহু পাঠকই পত্রাদির মারফত তাঁকে এই শ্রেণীর রচনায় উৎসাহিত করেছেন। আমরাও সেই উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলাম। ইতি

প্রকাশক

সূচীপত্র

রঙ্গ-চিত্র

জাঁকের ঝাঁক

ফকিরদাদা আমার সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই, কাজেই আমাদের গাঁয়েরই লোক। এঁর বাবা দীনবন্ধু রায় গাঁয়ের জমিদারের তৌশিলদার ছিলেন। ফকিরদা আই-এ পরীক্ষার দরজায় বারকয়েক করাঘাত করে অকৃতকার্য হয়ে শেষে তাতে পদাঘাত করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তারপর মামার ডাকে ঝরিয়ায় গিয়ে কয়লার ব্যবসা শুরু করেন। শেষে গত মহাযুদ্ধের হিড়িকে সরস্বতীর ঐ পলাতক কুসন্তানটি বড় কারবারী হয়ে লক্ষ্মীর সুসন্তান হয়ে ওঠেন। গ্রামে আর যান না, গ্রামে তাঁর মৃত বড় ভাইয়ের দুই ছেলে থাকে। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে ফকিরদার সম্পর্ক এখনো আছে—কারণ, গ্রামে তাঁর পুকুর, বাগান এবং অনেক জমিজায়গা আছে। সে সবের দেখাশোনার ভার দিয়েছেন পুরুতঠাকুরের ছেলে জনার্দনকে।

একদিন ঢাকুরিয়া যাবার পথে বড় রাস্তায় একটা নতুন বাড়ির গেটের এক পাশে নেমপ্লেটে দেখলাম এফ সি রায়—অন্য দিকে মার্বেল-ফলকে 'দীন-ধাম'। বুঝলাম, এটা ফকিরদার নতুন বাড়ি—দীনুজ্যাঠার নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধ। কেমন একটা দুর্বল মুহূর্তে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম—প্রবেশের জন্য জবাবদিহি দিতে দিতে শেষে বাবুর বসবার ঘরে পর্দা ঠেলে ঢুকলাম। আপ-টু-ডেট ফ্যাশানে সাজানো ঘর। কার্ড পাঠিয়ে দিলাম উপরে। আধ ঘণ্টা পরে বাবু নেমে এলেন মুখে চুরুট, পরনে শার্ট-প্যাণ্ট, ডান হাতে ধরা শিকলিতে বাঁধা একটা কুকুর।

ফকিরদা—এই যে হৃষীকেশ। এসো এসো, পথ ভুলে গরীবের

আস্তানায় যে এসে পড়েছ দেখছি। যা-হোক একটা ডেরা বানিয়েছি—তোমরা আপনার লোক তোমরা না দেখলে কি তৃপ্তি হয়, ভাই ?

আমি—ফকিরদা, তুমি যে বাড়ি করেছ এবং কোথায় করেছ—তা জানব কি ক'রে বলো পা'কপাড়া থেকে ?

ফকির—তা জানবে কেন ? একটা খোঁজও রাখ না, মরলাম কি বাঁচলাম। গাঁয়ের সেই লক্ষ্মীছাড়াটা কোন চুলোয় গেল তার সন্ধান তো তোমরা রাখ না। গাঁয়ের লোক—আর আত্মীয় স্বজন তো আমার শ্রীবৃদ্ধিতে খুশী নয়—তারা এড়িয়েই চলতে চায়। চলুক, ক্ষতি তাদেরই। কোথা আমার গৌরব করবে—আমি গাঁয়ের মুখোজ্জ্বল করেছি—তা না ক'রে, সব করে হিংসে—সব কানে আসে হে—শুনতে পাই, আমার নাম দিয়েছে ফিকিরচাঁদ। অনুগত হয়ে চললে অন্ততঃ পঞ্চাশটা ছেলেকে প্রোভাইড করতে পারতাম। যাক, কেমন আছ বলো তো—

আমি—গত মে মাসে বড় কঠিন ব্যারামে—

ফকির—তা বেশ, বেশ। কি করছ আজকাল ?

আমি—আমি আজো সেই—

ফকির—আচ্ছা, ঋষি বলো ত বাড়িটাতে কত খরচ পড়েছে ?

আমি—তা কি ক'রে বল্‌ব ? আদার ব্যাপারী—

ফকির—আহা, তবু একটা আন্দাজ কর।

আমি—বোধ হয় ৭০।৮০ হাজার—

ফকির—দূর ! জায়গার দামই পড়েছে তাই। কত খরচ পড়েছে শুনলে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। তবু এখনও অনেক বাকি—গাড়িবারান্দা হয়নি, আউট-হাউস বাড়াতে হবে—ফুলবাগান হয় নি, টেনিস-লন হয়নি—অনেক বাকি। দু'মাস হলো মাথা গুঁজবার মতো হয়েছে। গৃহপ্রবেশে একটা ঘটা করে পার্টি দিয়েছিলাম।

আমি—আমরা তো নিমন্ত্রণ পাই নি—জানবো কি ক'রে ?

ফকির—ওঃ, সে বিলিতী প্যাটার্নে বড় বড় লোকদের জন্য—ছ' হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। যাদের চোখ টাটাবে, তাদের কি কেউ ডাকে? দেখ—আমার নাম যে ফকির, তা আমি নিজেই ভুলে গেছি—এ নাম কেউ জানে না। আমি এখন এফ সি রায় অথবা রায়সাহেব। এ-বাড়িতে ও-নাম উচ্চারণ কোরো না। বহুকাল পরে তোমার মুখে ও-নাম শুনে চমকে উঠেছিলাম। কোথাও পুরো নাম বলতে হলে ফকির বলি না—ফটিক বলি। বাপ-মার কি অবিবেচনা দেখ! যে হবে ধনপতি—আমীর, তার নাম কি না ফকির?

আমি—এইবার বিলাত ঘুরে এসো না?

ফকির—যাওয়ার সব ঠিক করেছিলাম—খুকীর টাইফয়েড হলো। জীবনমরণ-সমস্যা। পাঁচ-পাঁচটা এম-বি ডাক্তারে ছুটোছুটি ক'রে বাঁচিয়ে তুললে। বহু হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। ছুটো ফিরিংগি নার্স রেখেছিলাম, আর ওয়াচ করার জন্য দিনে একটা এম-বি, রাতে একটা এম-বি। ওষুধই লেগেছে ছু হাজার টাকার। তাই ভাবি—তোমাদের মতো কারো ঘরের মেয়ে হলে বাঁচত না। এ যে টাকা দিয়ে যমের কাছ থেকে প্রাণ কিনে নেওয়া। তাও তো —যে ডাক্তারের ফী ১২৮৲ টাকা, সে আমার বন্ধু, তাকে এক পয়সাও ফী দিতে হয়নি। তবে তার মেয়ের বিয়েতে একটা সাড়ে আটশো টাকার গয়না দিয়েছি।

আমি—যাক নারায়ণের কৃপায় মেয়েটা বেঁচে গেছে। এখন তো ভালই আছে?

ফকির—নারায়ণের কৃপায়? নারায়ণ তো বিরূপই ছিল—বলো মা-লক্ষ্মীর কৃপায়। খরচ এখনো ফুরোয়নি—নাইনিতালে একটা বাড়ি ভাড়া করে রেখেছি—চেঞ্জে নিয়ে যেতে হবে। ভেবেছিলাম, বিলেত গিয়ে বড় ছেলেটাকে সেখানে রেখে আসব ট্রেনিং-এর জন্য, আর ওখানে ভাগ্নে অরবিন্দকে একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়ে আসব। অরবিন্দ বি-এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাস

অনার্স পেয়েছে কিনা। তা সব পণ্ড হয়ে গেল অর্থাৎ ছ'মাস দেরি হয়ে গেল। তবেই বুঝছ চোখ টাটানোর মতো আয় বটে,—কিন্তু আশ্বস্ত হওয়ার মতো ব্যয়ও আমার। বড় মেয়ের বিয়েতে ৪৫ হাজার টাকা খরচ করেছি। চোখ দুটোকে ছানাবড়া করে তাকাচ্ছ যে! যাক, আমার অবসর নেই, অনেক কাজ। বিনা মতলবে তুমি এসেছ তা তো মনে হয় না—আসল কথাটা কি বলো ত। আগেই বলে রাখছি—আমার প্রিন্সিপল হচ্ছে আমি কাউকে ধার দিই না;—গাঁয়ের লোক না হলে সাহায্য চাইলে যথাসাধ্য দিতে পারি। আর সুপারিশ চাও তো তা দিতে আপত্তি নেই। তুমি ভালো লেখাপড়া শিখেছ—তোমার জন্য সুপারিশ করা কঠিন হবে না।

আমি—কোন ব্যক্তিগত মতলব আমার নেই। তবে মতলবের কথা যখন তুল্লে, তখন বলি—গাঁয়ের ইস্কুলটার জন্য তুমি কিছু টাকা দাও—তুমি ঐ স্কুলেরই-ত ছাত্র ছিলে। ইস্কুলটার নামকরণ তোমার বাবার কিংবা মায়ের নামে করিয়ে দেব। স্কুলের বিল্ডিংটা যাতে হয়—তাই করো। তুমি অর্ধেক দিলে সরকারের কাছ থেকে অর্ধেক আদায় করা যাবে। তা ছাড়া, আমরা চাঁদাও তুলছি।

ফকির—দেখ ঋষি, স্কুল তো তোমার, তুমি সেখান থেকে পাস করে বৃত্তি পেয়েছিলে। আমাকে তোমার স্কুল 'দূর দূর ছেই ছেই'—করত, আমাকে প্রোমোশনই দিতে চাইত না, আর পরীক্ষার হলে চুরির অপবাদ দিত। সেকেণ্ড মাস্টার আমাকে হল থেকে বার করে দিয়েছিল—আমি 'দেখে নেবো' বলেছিলাম। সে তখন ভয় পেয়ে মিটিয়ে নিয়েছিল। পণ্ডিতমশায়কে মার্‌বই বলেছিলাম। মারি তো নেই,—সেই ছুতো ধরে আমাকে টেস্টে আটকেছিল, শেষে সেক্রেটারিকে ধরে এলাউড হলাম। এই স্কুলের জন্যে আমাকে টাকা দিতে বলো? তোমার লজ্জা হয় না? তাছাড়া, গাঁয়ের যত ছোটলোকের ছেলেদের শিক্ষার আমি পক্ষপাতী

নই। শুনতে খুব অসঙ্গত লাগছে ? কিন্তু আমার যুক্তি আছে। চাষী কারিগরদের ছেলেরা স্কুলে পড়লে গাঁয়ের সর্বনাশ হবে। সামান্য শিক্ষায় চাকরিও পাবে না—বরং তারা ছোট-বড় চুল ছেঁটে, হাফ-প্যাণ্ট পরে, বিড়ি সিগারেট ফুঁকে উপদ্রব করে বেড়াবে। তারা চাষ করতে বা কামার ছুতোরের কাজ করতেও পারবে না। ফলে, গাঁয়ে এমন একটা বেকারের গ্যাং তৈরি হবে—যাতে গাঁয়ের মহাবিপদ ঘটবে। ঐ গ্যাংই শেষ পর্যন্ত ডাকাতের দলে পরিণত হবে। গাঁয়ের মেয়েদের মানইজ্জত থাকবে না। ঠিক কি না বলো ? লেখাপড়াই শিখেছ—ভবিষ্যৎ ভাবতে তো শেখনি। ঐ গ্যাং শেষে তোমারই ঠ্যাং ভাঙবে।

আমি—ভদ্রজাতির ছেলেদের জন্যও তো শিক্ষা চাই।

ফকির—তুমি বলো কি ঋষি ! ঐ হিংসুকদের হ্যাংলা ছেলেদের জন্য টাকা চাও ? যাদের ধরে ধরে চাব্‌কানো দরকার তাদের জন্য আমাকে আক্কেল-সেলামি দিতে হবে ? তাছাড়া, আরো কথা আছে। জানো, গ্রামে আমার কিছু প্রপার্টি আছে—তা থেকে আমি বিশেষ কিছু পাচ্ছি না। সব মেরে দেবে ভয়ে ভাইপোদের হাতে দেখাশোনার ভার না দিয়ে জনার্দনের হাতে ভার দিয়েছি। জনার্দন জানিয়েছে—গাঁয়ের লোকে পুকুরের মাছ সব চুরি করে মেরে দিচ্ছে—বাগানের ফল একটাও পাওয়া যাচ্ছে না—কেউ বাগান জমাও নিচ্ছে না। ধান বিক্রির আয়ও ঢের কমে গিয়েছে—ধানের দর বাড়ছে—অথচ আমার আয় কমছে। বুঝতে পারছি—শুধু খোলা মাঠে নয়, গোলা থেকেও ধান চুরি যাচ্ছে—তুমি চোর ডাকাতদের জন্য আমার কাছে টাকা চাচ্ছ ? লজ্জা করে না ? আমি জনার্দনকে লিখেছি—খরিদ্দার দেখ—আমি সব বিষয় আশয় বিক্রী করে দেব। গাঁয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদন করব। কল্যাণী বলে—'লোকে যখন লুটেপুটেই খাচ্ছে দাদা, তখন সম্পত্তি দেখার ভার তোমার ভাইপোদের দাও—খায় তো নিজেদের বংশের লোকেই খাক। পাঁচ

ভূতে খাওয়ার চেয়ে নিজের ভাইপোরা খাবে সেটাইত ভালো। জনার্দনও যে সাধু লোক তা বুঝলে কি ক'রে?'

আমি—কল্যাণী বুদ্ধিমতী, ঠিক কথাই বলেছে।

ফকির—চমৎকার যুক্তি! তা হলে সবই তো বে-হাত হয়ে যাবে। ঢাকের দায়ে মনসা-বিক্রি হয়ে যাবে। তুমি কি মনে কর ওরা যদি সব আত্মসাৎ করে, তবে আমার ছেলেরা গাঁয়ে ছুটবে মামলা করতে? তা থেকে বিক্রি করাই কি ভালো নয়? দেখ, তুমি কিছু কিছু কেন' তো দামে কনসিডার করব।

আমি—আমি টাকা কোথা পাব দাদা?

ফকিরদা (মুখ ভেঙ্‌চিয়ে)—ফাস্টো কেলাস এম-এ, টাকা কোথা পাব? বলতে লজ্জা করে না? ফাস্টো কেলাস এম-এ হয়ে লাভটা কি হলো? যাক। আমার অনেক কাজ—অবসর মোটে নেই—আমি কত কমিটির সেক্রেটারি, কত সমিতির সভাপতি, কত কোম্পানীর ডিরেক্টার তা জানো? ঘরের খেয়ে বনের মশা কম তাড়াই না। আমি চলি—তুমি বাড়িটার চার পাশ ঘুরে ফিরে দেখ—ফার্নিচারগুলো সব সাহেববাড়ি থেকে কেনা,—লক্ষ্য কোরো। তোমার বৌদিদির সঙ্গে দেখা কর—কল্যাণীর সঙ্গে দেখা কর। তাকে একটা বাড়ি করে দেব, ভাবছি। গুডবাই।

পীনাঙ্গী বৌদিদির সঙ্গে গেলাম দেখা করতে—পাশে ব'সে আছে ক্ষীণাঙ্গী বিধবা কল্যাণী। যেতেই কল্যাণী উঠে প্রণাম ক'রে একটা চেয়ার এনে দিল। বৌদিদি বললেন—যা-হোক এত দিন পরে গরিব বৌদিদিকে মনে পড়ল ঠাকুরপোর।

আমি—আমি আজ সব গরিবদুখীদের খোঁজ নিতেই বেরিয়েছি। কিসের ফর্দ করছেন?

বৌদিদি—আর বলো কেন? বড়মেয়ের পূজার তত্ত্বের ফর্দ। হাজার টাকা তো ছাড়িয়ে গেল। বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার যে কি হাঙ্গামা, তা তো জানো না। ঠাকুরঝি

বলছে—বিয়েতে পিয়ানো রেফ্রিজিরেটর থেকে পাপোশ, এশ-ট্রে পর্যন্ত তো দিয়েছ—এখন আবার এত বেশি দেওয়ার কি দরকার? আমি কয়েক টিন সিগারেট ধরছিলাম। ঠাকুরঝি বলছে—শুধু সিগারেটই তো জামাই খায় না—আরো অনেক কিছু খায়, সবই তো দিচ্ছ না?

আমি—মঙ্গলার বিয়ে হলো কোথায়?

বৌদিদি—তাও জানো না? বিয়েতে আসতে না পেরে থাক, নিমন্ত্রণ-চিঠিতে বেহাই-এর নাম পড়নি? কলকাতার খুব নামজাদা লাখপতি পরিবার যে।

আমি—চিঠিতে বেহাই-এর আর্থিক সঙ্গতির কথা বা ব্যাংক ব্যালান্সের কথা ছাপাতো ছিল না।

বৌদিদি—কেন রায়বাহাদূর তো ছাপা ছিল। তিন পুরুষ রায়বাহাদুর—আত্মীয়দের মধ্যে ১৪টা রায়বাহাদুর, ২০জন বিলাত ফেরত, পাঁচজন জজ। পাঁচখানা মোটার, ১০খানা বাড়ি। প্রাইভেট টিউটার থেকে জমাদার পর্যন্ত ৫০ জন চাকরবাকর। জমিদারি, ব্যবসা, চাকরি, বাড়ি ভাড়া, শেয়ার কত কি আয়। জজ, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেটে বাড়ি গিজ-গিজ করছে। বেহাই-এর বাবার নামে পিচঢালা রাস্তা। আমাদের বাজার হয় দিন ত্রিশ টাকার, ওদের হয় দিন একশো টাকার। আমাদের বাড়িতে সাহেবমেম আসে হুচার জন—ওদের বাড়িতে দলে দলে যায়, খায়, গায়, নাচে। ঠাকুরঘর থেকে পায়খানা পর্যন্ত মার্বেলে মোড়া। আমাদের সারা বাড়িতে মোটে পনেরো হাজার টাকার ফার্নিচার ওদের প্রতি ঘরেই ঐ দামের ফার্নিচার। ওদের কাছে আমরা গরিব মানুষ।

আমি—বিয়েতে খরচ পড়েছে ঢের তা হলে।

বৌদিদি—আমাদের ৬০ হাজার টাকার কম নয়। ওদের লাখ টাকা। ওদের দশদিন ধরে খাওয়ানো দাওয়ানো —এত লোকের আমদানি যে পঞ্চাশ জনের জুতো হারিয়ে গেল—বেহাই ৫০

জোড়া নতুন জুতো কিনে দিলেন। আঠারোটা যণ্ডামার্কা ঠাকুর রেঁধে কুলুতে পারেনি। বিশজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হ'ল। একেবারে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড রে ভাই।

আমি—জামাইয়ের নাম কি ?

বৌদিদি—শিবনাথ, নিমন্ত্রণপত্রেই তো ছিল। তাও মনে রাখনি ?

আমি—তবে দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশি। দক্ষযজ্ঞে শিব ছিলেন না, সে যজ্ঞ ছিল শিবহীন। লঙ্কাকাণ্ড বলতে পারেন। আমি তো ভেবেছিলাম—পাত্রের নাম অনিলকুমার।

বৌদিদি—এই দেখ গোল করেছ—বেহাই-এর নাম রায়বাহাদুর অনিলকুমার, চিঠিখানা ভালো করে পড়নি।

আমি—ও আমারই ভুল হয়েছে—বেহাই-এর নামই অনিলকুমার হবার কথা। লঙ্কাকাণ্ডই বটে। জামাই করে কি ?

বৌদিদি—করবে আবার কি ? অতো বড় লোকের ছেলের কিছু করতে হয় নাকি ! মাঝে মাঝে সই করে হাজার টাকা দামের সোনার কলমে। জামাইএর অনেক গুণ—ভালো শিকার করতে পারে,—ভালো খেলোয়াড়। চমৎকার বাঁশী বাজায়—বাঁয়াতবলাও বাজাতে পারে—বাড়িতে বাঁধা স্টেজ আছে—থিয়েটারে খুব ভালো এক্টো করে। কার্ত্তিকের মতো রূপ। তোমাদের মতো এম-এ বি-এ, পঞ্চাশজন ওর তাঁবে কাজ করছে।

আমি—মোহিতকে দেখছি না তো।

বৌদিদি—ও ভালো ফুটবল খেলে কিনা, তাই সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে খড়গপুরে খেলতে গিয়েছে। ও ত এবার বিলেত যাবে—পোশাক তৈরি হয়ে গিয়েছে—খুকীর অসুখের জন্য যাওয়া হয়নি। ওর সঙ্গে অরবিন্দও যাবে। এদেশে কি লেখাপড়া হয় ? বিলেত না গেলে ভালো শিক্ষা হবে কেন ?

আমি—মোহিতের ভাইকে দেখছি না তো।

বৌদিদি—সরিতের কথা বলছ ? তার স্কুলে একটা কি ফাংশন

আছে—সেই ছেলেদের সর্দার কিনা। সরিৎ বড় ভাল ছেলে। প্রত্যেক বৎসর পাস করেই প্রোমোশন পায়—ওর প্রাইভেট মাস্টাররা বলে—ও একটু খাটলে বৃত্তি পাবে। আমি বলি যদি বৃত্তি পায়—তবে সে টাকা তোমরাই ভাগ করে নিও। ওর তো টাকার অভাব নেই। ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়ানোর আর খুকীর গান শেখ-নোর জন্য হাজার টাকা মাসে খরচ হয়। তবু ওরা বড় ফাঁকি দেয়। ওরা বড় গরিব, কিছু বলি না। না এলেও মাইনে কাটি না। খুকীকে ইংরাজী পড়ায় একজন মেম সাহেব—সে কিন্তু ফাঁকি দেয় না। —খুকী অনেক ইংরাজি কথা শিখেছে। খুকু এখন তো পড়ে না—তবু মেমের মাইনে মাসে মাসে দুশো টাকা দিয়ে যাচ্ছি।

কল্যাণী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল—একটি কথাও বলেনি। এইবার সে কাছে ঘেঁসে এসে বসল—বৌদিদি ঝি-চাকর শাসন করতে গেলেন।

কল্যাণী—এতক্ষণ তো আমাদের খবর শুনলে—এইবার তোমার খবর বলো। তোমার এখন কয়টি ছেলেপুলে—তাদের কার কত বয়স—কে কি পড়াশুনা করছে—বৌদিদির শরীর কেমন? আমার কথা তাঁর মনে আছে? তোমার আয় কত? সব একে একে বলো।

আমি কল্যাণীর প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

কল্যাণী—বৌদিদিকে একদিন নিয়ে এসো, দেখতে বড় ইচ্ছা হয়। সেই ক'নে বৌটি দেখেছি—

আমি—তোমার বৌদিদির শরীর ভালো নয়। তাছাড়া, সে বড় লাজুক। বড়লোকের বাড়িতে সে কি আসতে চাবে? তার সাজ সজ্জা গয়নাও কিছু নেই। দূরও অনেকটা।

কল্যাণী—না—না, তাঁকে আসতে হবে না। অরুকেই বলবো ট্যাক্সি করে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে। একবার আমাদের গাঁয়ে যেতে ইচ্ছা করে—ভাইপোরা তো আছে—তাদেরও বহুদিন দেখি নি। গাঁয়ের সবার খবর জানতে ইচ্ছা করে। সোনার খাঁচার পাখী

হয়ে আছি এখানে। বিমলা পিসী, নেড়া, হাবুল, পুঁটি, মাধুরী, বিধু কাকা, সুরেনদা, অনু এদের প্রত্যেকের খবর, গুপ্তদের বাড়ির, বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ির, পুরুত ঠাকুরের বাড়ির, বিশ্বাসদের বাড়ির কে কেমন আছে—সব জানতে ইচ্ছা হয়। অল্প বয়সে জীবনকাকা মারা গেলেন, কাকীমা কি দুঃখে যে তোমাদের দুজনকে মানুষ করেছেন তা ভাবতে গেলে চোখে জল আসে। তোমার মামারা তোমাকে নিয়ে গেল ব'লে তোমার কলেজে পড়া হল। তোমার মামারাই অমিয়ার অত ভাল বিয়ে দিলেন। অমিয়া কেমন আছে? তুমি সারা গাঁয়ের কেন, সারা অঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করেছ, ঋষিদা।

আমি—আমি আর কি করেছি, দিদি, আমার আয় সামান্য।

কল্যাণী—তুমি বি-এ, এম-এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে প্রোফেসার হয়েছ, কত বই লিখছ, তোমার কত ছাত্র কৃতবিদ্য হচ্ছে। অরুকে বলি,—তুই তোর ঋষি মামার মতো হবার চেষ্টা কর। কাকীমা আমাকে কী ভালই না বাসতেন! অমি ও আমি যেন তাঁর যমজ মেয়ে ছিলাম। কত উপদ্রবই না করেছি! টুলের উপর উঠে কুলের আচার চুরি করে খেতাম। তিলের নাড়ুর ভাঁড় শিকেয় তোলা থাকত, চুরি করতে পারতাম না বলে কাকীমা সে ভাঁড়টা কুলুঙ্গিতে নামিয়ে রাখতেন—মোড়ায় চড়ে পেড়ে খেতাম। কাকীমা পৌষ মাসে পিঠে তৈরি করে, ভাদ্র মাসে তালের বড়া ভেজে, দোলের দিনে ফুটকলাই ছাঁচ কিনে, রথের দিনে পাঁপর ভেজে আমাদের দুই ভাইবোনকে খাওয়াতেন। কোন দিন পায়েস বা খিচুড়ি রাঁধলেও ডেকে পাঠাতেন। ভাইদ্বিতীয়ার দিন দাদার কপালে ফোঁটা দিতে গিয়েও তোমার কথা মনে পড়ে। বৌদিদি যখন নতুন বৌ, তখন সারাদিনের সঙ্গিনী ছিলাম আমি। মালতী দিদির সঙ্গে গাঁয়ের বনে বনে বৈঁচি বনকুল খেয়ে বেড়াতাম—সে মালতী দিদি আজ নেই। যশোদা বৈষ্ণবীর শিউলি গাছটা কি এখনো আছে? তা বোধ হয় তুমিও জানো না। মালতীদের পুকুরের ধারে সেই বকুল গাছটা?

বকুল আর শিউলি কুড়িয়ে নিলেই চলত। এই তুই ফুলে আমাদের খেলাপাতির ঠাকুর-পূজা হত। কত কথা মনে পড়ছে। ঋষিদা, তুমি আমাদের সারা গ্রামখানিকে তুটি ছলছল চোখে ভ'রে নিয়ে এসেছ। আমার জীবনের সুখের দিনগুলি তালপুকুরের পাড়ে সেই খড়ো ঘরের আঙিনার ধূলাকাদাতেই কেটেছে। আশীর্বাদ কর দাদা, অরু আমার মানুষ হোক। তাকে তোমার পায়ের ধূলো দিয়ে যাও।

আমার চোখে জল আসছিল—তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম। সে জল দেখলে কল্যাণী ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলত।

এমন সময় বৌদিদি এসে বলে গেলেন, একটু চা খেয়ে যেয়ো—এখন তো অসময়, আর কিছু খাবার দিলাম না। কথায় কথায় তোমাকে চা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

ঝি তুখানা বিস্কুট আর চা দিয়ে গেল।

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল। তারপর উঠে গিয়ে তার ঠাকুরঘর থেকে রেকাবে ক'রে তুটি সন্দেশ নিয়ে এল। কল্যাণী হাতে ক'রে না আনলে খেতাম না।

এমন সময় কল্যাণীর পুত্র অরবিন্দ এলো। কল্যাণী অরবিন্দকে বলল—অরু, এই তোর ঋষিমামা—যার কথা তোকে বলি। প্রণাম কর। এঁর ঠিকানা লিখে রাখ, একদিন ট্যাক্সি করে ঐ ঠিকানায় আমাকে নিয়ে যাবি।

আমি বিদায় নিলাম—অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে বাস-স্টপ পর্যন্ত এলো। পথে তার সঙ্গে তু'চারটা কথা হলো—

আমি—তুমি তো বি-এস-সিতে খুবই ভাল ফল করেছ—শুনলাম। বিলাতে পড়তে যাওয়ার কথা হচ্ছে?

অরবিন্দ—ফল ভাল এমন কি? একটা লো-সেকেণ্ড ক্ল্যাস অনার্স পেয়েছি কেমিষ্ট্রিতে। বিলাত? বিলাতে যাওয়ার কথা কে বলল? এমন কথা তো হয়নি কোনদিন।

আমি—তোমার মামাই বলছিলেন—তিনি তোমাকে আর মোহিতকে নিয়ে বিলাত গিয়ে তোমাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করে আসবেন। কিন্তু খুকীর অসুখের জন্য যাওয়া হল না।

অরবিন্দ—মামার তেমন পরিকল্পনা কোন ছিল বা আছে কিনা আমি তো তা কখনও শুনিনি। কিন্তু ওসব তো এখন অসম্ভব।

আমি—কেন ? খুকী ত বেশ সেরে উঠেছে।

অরবিন্দ—খুকীর প্যারা টাইফয়েড হয়ে ছিল—চৌদ্দ দিনে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। এমন সিরিয়াস কিছু হয় নি। তবে মামার এখন খুব দুঃসময় চলছে। ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। জায়গাটা সস্তায় পেলেও বাড়ি করতে মামার খুব দেনা হয়ে গিয়েছে। জায়গাটার মালিকানা স্বত্বে কি গোল বেরিয়েছে—সেজন্য কেস্‌ও চলছে। মেয়ের বিয়েতেও প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেস চলছে অনেকগুলি। বহুদিনের আয়কর বাকি ছিল—বহু টাকা এক সঙ্গে দিতে হয়েছে। কাজেই এখন খুব টানাটানি করে চালাতে হচ্ছে, দেশের বিষয়সম্পত্তি সব বিক্রী করছেন। চাকরবাকর অনেক ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। বাড়িটাও মরগেজ করা আছে। এম-এস-সি না পড়িয়ে আমাকে ব্যবসায়ে যোগ দিতে বলেছিলেন—আমি দু বছর সময় নিয়েছি—এম-এস-সিটা পাশ করার জন্য।

আমি—মেয়ের বিয়েটা তো খুব ভালোই দিয়েছে।

অরবিন্দ—খুব ভালো হয়নি, মামা। জামাইএর পরিবারের অবস্থা খুব ভালই ছিল, মামলা মোকদ্দমার পর এখন শরিকদের মধ্যে পার্টিশন হওয়ায় ভালো আর নেই। তা ছাড়া, ওদেরও দেনা খুব বেশি। জামাইটি অসৎ সঙ্গে পড়েছে। লেখাপড়া শেখেনি—যা আছে তাও উড়াচ্ছে।

বাস এসে পড়ল, আমি উঠে পড়লাম নানা কথা ভাবতে ভাবতে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিনোদ ইকনমিক্সে এম-এ পাশ করে একটা আফিসে কাজ করে। সে রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রাহক হয়েছে। সেদিন সে এসে বললে—এত দিনে মোটে তিন ভল্যুম পেলাম—।

বুঝলাম কিসের তিন ভল্যুম, তবু জিজ্ঞাসা করলাম—কিসের তিন ভল্যুম, বিনোদ? অমল মিত্রের নভেলের?

বিনোদ—কেন, রবীন্দ্ররচনাবলীর! এই রেটে বেরুলে তো তিন বছর লাগবে?

আমি—তাতো লাগবেই; আরও বেশী সময় লাগতে পারে। এ-ত সহজ ব্যাপার নয়—এ হ'ল শনৈশ্চর অর্থাৎ শনিগ্রহের রবি প্রদক্ষিণ। অথবা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্।

বিনোদ—একটা মানুষ এতও লিখতে পারে। পড়ে ওঠাই দায়। কবির শুধু দৈহিক শ্রমের কথা ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হয়। একখানা চিঠি লিখতেই আমার দু'ঘণ্টা সময় লাগে।

আমি—দুই ভল্যুম পড়া শেষ করলে নাকি? দেরি হচ্ছে ব'লে এত ব্যস্ত যে হচ্ছ?

বিনোদ—এখনো পড়া শুরু করিনি, সময় পাচ্ছি না, স্যার। দু' একবার হাতে ওজনটা অনুভব করে রেখে দিয়েছি।

আমি—তবে দশ বছর লাগলেই বা কি! কেন, কিসে ব্যস্ত আছ?

বিনোদ—ব্যস্ত? ব্যস্ত কিছুতেই নয়। অবসর যে একটুকুও নেই। ধরুন, সকাল ৮টা—৮॥টায় উঠলাম বিছানা থেকে, তারপর বাথরুম—তারপর চায়ের টেবিল, তারপর খবরের কাগজ—তারপর দাড়ি কামানো—স্নান। তারপর নাকে মুখে দুমুঠো গুঁজে ট্রাম ধরতে ছোটা—পাঁচ ছয়খানা ট্রাম ধরতে না পেরে শেষে একটা

ট্রামের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে ধাক্কা খেতে খেতে আপিসে, তারপর আপিসে পুরা তিনঘণ্টা বিশ্রাম করে কাজ শুরু করা। তারপর আবার ধাক্কাধাক্কি ক'রে সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী পোঁছানো। বাড়ী এসে পুরা দুঘণ্টা বিশ্রামের পর আড্ডায় যাই। শনি রবিবারে সন্ধ্যায়,—সপ্তাহে মাত্র দুদিন—সিনেমায় যাই। খেলার মরশুমে খেলা দেখতেও হয়। আপিসের খাটুনির পর রিক্রিয়েশন তো চাই। সময় কই স্যার?

আমি—আফিসে তো তোমার ঘণ্টা দুই মাত্র খাটনি। এত ক্লান্তি কেন?

বিনোদ—সারাদিন আঁটা পোশাকে থাকা, ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা চেয়ারে খাড়া বসে থাকা, আর যাতায়াতের জন্যই কি কম ক্লান্তি! এখন বলুন সময় কই? আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ এত সময় পেতেন কোথা থেকে—যাতে এক ওয়াগন বই লিখে গেলেন?

আমি—তিনি তো তোমার মত সাড়ে আটটায় উঠতেন না, গগনের রবি উঠবার দুতিন ঘণ্টা আগেই তিনি জাগতেন। তাঁকে তো তোমার মতো আপিসে এত পরিশ্রম করতে হতো না, দাড়ি কামানো, খেলা দেখা, সিনেমা দেখাও তাঁর ছিল না।

বিনোদ, তাহলে পড়বার সময় আদৌ নেই, বলছ।

বিনোদ—রবিবারে যুগান্তর ও আনন্দবাজার দুখানা কাগজই মায়-বিজ্ঞাপন মন দিয়ে পড়ি। তবে বই পড়ার অভ্যাস নেই। এম-এ পর্যন্ত পাস করতে অনেক মোটা মোটা বই পড়তে হয়েছে,—বই ছুঁতে আর ইচ্ছা করে না, স্যার।

আমি—৭৫৲ টাকা খরচ করে রবীন্দ্ররচনাবলী কিনছ কেন? পড়া না হোক চড়াদামে ছেড়ে দেবে বলে?

বিনোদ—কেন? পড়বো বলে। বিশ্বব্যাপী যাঁর খ্যাতি,—সারা ভারতবর্ষের যিনি গৌরব, তাঁর বই পড়ব না? অবসর পেলেই এক এক ভল্যুম ধরব আর তিনদিনে শেষ করব।

আমি—বাংলা খবরের কাগজ পড়ার বিদ্যে সম্বল নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা বুঝবে কি করে? বুঝে বুঝে পড়তে তো হবে!

বিনোদ—কী যে বলেন স্যার, ইংরাজিতে লেখা মোটা মোটা সাহেবদের ইকনমিক্সের বই পড়ে বুঝলাম আর বাংলায় লেখা বাঙালী রবীন্দ্রনাথের বই পড়ে বুঝব না? এম-এ-টা পাশ করতে হয়েছে তো! পাঁচ মার্কের জন্য—

আমি—এম-এ পাশ করেছ বলে রোগীর রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করতে পারো? বেদান্ত পড়ে বুঝতে পারো? ঘড়ি সারাতে পারো? ঘোড়ায় চড়ে পোলো খেলতে পার? রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছু পড়েছ?

বিনোদ—কলেজে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো গল্প পড়েছি, হু' তিনখানা তাঁর নভেলও পড়েছি—আবৃত্তি শুনেছি—গান শুনেছি, পাঠ্যপুস্তকে কয়েকটা কবিতাও পড়েছি—যেমন—আজিকে তোমার মোহন মূর্তি দেখিনু শরৎ প্রভাতে—

আমি—'শরৎ প্রভাতে' কবির মোহন মূর্তি দেখেছ?

বিনোদ—কই আর চোখে দেখলাম স্যার, আমার যখন ৮ বৎসর বয়স, তখনই তিনি মারা গেলেন। ছবি দেখেছি।

আমি—না—না—আমি বলছি তাঁর প্রধান শিষ্য শরৎচন্দ্রের ও প্রভাতকুমারের বইএ তাঁর সারস্বত মূর্তির প্রতিবিম্ব দেখেছ কিনা তাই বলছি—অর্থাৎ শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের বই পড়েছ কিনা।

বিনোদ—তাই বলছেন? শরৎচন্দ্রের চার পাঁচখানা বই পড়েছি—প্রভাতবাবুর হুটো গল্প পড়েছি।

আমি—রবীন্দ্রনাথের কবিতা গল্প কি পড়েছ বুঝেছি। উপন্যাস? যেমন চোখের বালি—গোরা—ঘরে বাইরে এসব পড়েছ?

বিনোদ—কলেজে পড়বার সময় নৌকাডুবি ও চোখের বালি পড়েছি—আর কিছু পড়িনি। এইবার সব পড়ব।

আমি—কোন নাটক? কোন প্রবন্ধ?

বিনোদ—চিরকুমার সমিতি বলে একখানা নাটক কতকটা পড়েছিলাম—শেষ করতে পারিনি। ভালো লাগেনি। শেষ প্রশ্ন বলে একখানা বইএর কয়েক পাতা পড়ে ভালো লাগল না—কাজেই আর পড়া হলো না। কোন প্রবন্ধ পড়িনি। বই কিনে পড়ার অভ্যাস একেবারেই নেই, হাতের কাছে কোন বই পেলেও তো পড়া হয় না। খোঁজ করে কোন বই পড়ারও অভ্যাস নেই। রবীন্দ্ররচনাবলী এইবার হাতের কাছে পাব—পয়সা দিয়ে কেনা বই, না পড়লে তো চলবে না, স্যার।

আমি—বিনোদ, রবীন্দ্রনাথের লেখা যে কী চীজ তা জানো না; তাই রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রাহক হয়েছ। বইগুলো র‍্যাকে সাজিয়ে রাখাই হবে—পড়া আর হবে না। এতো শরৎবাবু বা প্রভাতবাবুর বই নয় যে আরামকেদারায় শুয়ে গোটা বই শেষ না করে থাকা যাবে না। ৭৫৲ রবীন্দ্র রচনাবলীর ক্রয় মূল্য—দিতে হবে ঢের বেশী মূল্য। ভল্যুমগুলো তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছে না বলে ব্যস্ত হচ্ছিলে, রিটায়ার করার আগে তো ছোঁবারই অবসর পাচ্ছ না।

বিনোদ—কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পড়ব।

আমি—এ কি কলেজ স্ট্রীটের নভেল যে ফাঁকে ফাঁকে পড়লেই চলবে? একি অবসর মতো ভালবাসার মতো? এর জন্য তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে। ফাঁকে ফাঁকে প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টাই কতকটা সম্ভব।

বিনোদ—প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা কি তা তো বুঝলাম না, স্যার।

আমি—প্রস্তুত হওয়ার কথা বুঝলে না? তুমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেই কি এম-এ দিয়েছিলে?

বিনোদ—তারপর আই-এ, বি-এ পাশ করতে হয়েছে।

আমি—এর নামই প্রস্তুত হওয়া। রবীন্দ্র-সাহিত্য সর্বোচ্চ গ্রামের সাহিত্য কিনা?

বিনোদ—রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠের অধিকার লাভের জন্য আবার পরীক্ষা আছে নাকি ?

আমি—পরীক্ষা নয়। উৎকৃষ্ট বীজবপনের জন্য জমি চষতে হয়, চষা জমির পাইট করতে হয়। জলসেচনের ব্যবস্থা করতে হয়। সেইরূপ রবীন্দ্রসাহিত্যের বীজবপনের জন্য চিত্তভূমিতে কিছু সার সংযোগেরও প্রয়োজন।

বিনোদ—এজন্য কি করতে হবে বলুন।

আমি—তোমার জীবনযাত্রার অভ্যাসগুলি বদলাতে হবে, চরিত্রকে নতুন ক'রে গড়তে হবে,—সাহিত্যানুরাগের অনুশীলন করতে হবে। রবীন্দ্রসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের বহু দিনের তপস্যার ফল, বিনা কৃচ্ছ্রসাধনে তার আস্বাদ পাওয়া যাবে কেন ? তোমার ইকনমিক্স এতে কাজে লাগবে না। বরং বি-এর জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসটা যে পড়েছিলে, সেটা তোমার কিছু কাজে লাগবে। বি-এতে সংস্কৃত থাকলে আরো ভালো হ'ত। সংস্কৃত সাহিত্য কিছু পড়েছ ?

বিনোদ—সংস্কৃত সেই স্কুলে পড়েছিলাম, সাহিত্য-টাহিত্য নয়, —সামান্য ব্যাকরণ। এখন নর শব্দের রূপটাও ভুলে গিয়েছি। পণ্ডিত মশায়ের কানমলা ছাড়া কিছু মনে নেই।

আমি—সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ততঃ শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনখানা বই পড়ে নিতে হবে বাংলা অনুবাদ দেখে। বাংলার প্রাচীনকাব্য-সাহিত্য কিছু পড়েছ ? পদাবলী, মঙ্গলকাব্য ?

বিনোদ—কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত বাল্যকালে পড়েছিলাম। দিদিমাকে পড়ে শোনাতে হ'ত।

আমি—না ওতে হ'বে না। কালী সিংহের মহাভারত ও ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনূদিত রামায়ণ,—অন্ততঃপক্ষে রাজশেখর বসুর রামায়ণ ও মহাভারত পড়তে হবে। প্রাচীন সাহিত্যের অন্ততঃ অন্নদামঙ্গলখানা পড়ো। তা ছাড়া, পদাবলী সাহিত্য

ভালো করেই পড়তে হবে। তাক থেকে মোটা বইখানা নামিয়ে আনো ত।

বিনোদ (বইখানা নামিয়ে)—ও বাবা, এ যে গন্ধমাদন, হরেকৃষ্ণ মুখুয্যের কীর্তন গানের বই!—এত বড় বইখানা পড়তে হবে? এ যে বৃষোৎসর্গ ব্যাপার, স্যার।

আমি—আমি তিলকাঞ্চনের ব্যবস্থা দিচ্ছি। এর জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও রায়শেখরের বাছা বাছা পদগুলি পড়লেই হবে। তুমি ভাবছ বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি কেন? সাহিত্যিকমানস তৈরির জন্য দরকার। বুঝেছ?

বিনোদ—এর বেশির ভাগ তো হিন্দী, স্যার। হিন্দীও শিখতে হবে নাকি?

আমি—হিন্দী নয়, ব্রজবুলি, সঙ্গে সঙ্গে ওর অনুবাদ দেওয়া আছে। আচ্ছা, ইংরেজী কবিতা কিছু পড়েছ?

বিনোদ—স্কুলকলেজে কতকগুলো কবিতার সামারি ও এক্সপ্ল্যানেশন মুখস্থ করেছিলাম। কবিতাগুলোর নাম মনে নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝবার জন্য ইংরেজি কবিতা পড়বার কি প্রয়োজন?

আমি—ইংরেজি কবিতা আর কিছু না পড়, অন্ততঃ পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারির ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড পড়তে হবে। এসব কবিতা পড়লে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝবার সুবিধা হবে। মাইকেল, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্রের লেখা কিছু পড়েছ?

বিনোদ—পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু পড়েছি।

আমি—আর কিছু না পড়, মাইকেলের মেঘনাদ বধ ও বীরাঙ্গনা, বিহারীলালের সারদামঙ্গল, হেম-নবীনের কবিতা কিছু কিছু পড়তে হবে।

বিনোদ—বঙ্কিমবাবুর সব বই-ই পড়েছি।

আমি—না, সব বই পড়োনি। কেবল নভেলগুলো পড়েছ। প্রবন্ধের বইগুলোও পড়তে হবে।

রবীন্দ্রনাথের সামসময়িক কবি, যেমন—অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন, গোবিন্দ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ইত্যাদি কবিদের কবিতা এবং রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি মনীষীদের রচনাও পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথের রচনার রস উপভোগ করতে হলে আগে এঁদের লেখা পড়ে রসবোধের অনুশীলন করতে হবে। ধাপে ধাপে না উঠলে কুতবমিনারে ওঠা যায় না। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী গন্থ পন্থ লেখকদের লেখা আগেই পড়তে হবে, সাহিত্যরসিক মানস তৈরির জন্য। এঁদের রচনা রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষ্য, টীকা, ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট। রবীন্দ্রশিষ্যদের রচনা উচ্চতর রসের তৃষ্ণা জাগিয়ে দেবে।

এই ধাপগুলি পার হতে হতে তোমার রিটায়ার করবার সময় এসে পড়বে। তারপর রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ সুরু করতে পারো। ভল্যুমগুলো হাতের কাছে পেয়ে যে-কোনখানা টেনে নিয়ে পড়লেই চলবে না। এ বিষয়ে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

কবিতার বেলায় ছড়া, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি থেকে সুরু করে— শিশু, শিশু ভোলানাথ, কথা ও কাহিনী, কণিকা, পলাতকা, নৈবেদ্য গীতবিতান—তারপর—যদি বাঁচো তবে ধীরে ধীরে উপরদিকে উঠতে হবে।

কথাসাহিত্যে গল্পগুচ্ছ, বৌঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি থেকে সুরু করে ক্রমে উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে গোরা, শেষে—শেষের কবিতায় পৌঁছুতে হবে। নাটকের বেলায় বিসর্জন থেকে সুরু করাই ভালো। তবে চিরকুমার সভার পর আর আগানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। প্রবন্ধ-সাহিত্যের বেলায় ভ্রমণ-সাহিত্য ও জীবনস্মৃতিমূলক রচনা থেকে সুরু করাই ভালো। তবে দীর্ঘ জীবন

পেলে এই যথেষ্ট। একপুরুষে আর এর বেশী চলবে বলে মনে হয় না। বাকি অংশ পুত্রপৌত্রদের পড়বার বুঝবার ভার দিয়ে যেও। রবীন্দ্ররচনাবলী একপুরুষের জন্য নয়। রচনাবলী কিনলে ভালোই করলে, একটা সম্পত্তি ওটা। বন্ধক রাখাও চলবে, প্রয়োজন হলে। পুত্রপৌত্ররা যদি ভালো ক'রে লেখাপড়া শেখে, যদি সাহিত্য ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা-অনুরাগ থাকে, রবীন্দ্রনাথকে ভগবদ্‌ভক্ত বা বুর্জোয়া কবি বলে যদি নির্বাসিত করা না হয়, পাশ্চাত্ত্য কবিদের রচনার পুনরাবৃত্তি বলে যদি তাঁর রচনাবলীকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা না হয়, যদি বর্তমান ও আগামী যুগের দিঙ্‌নাগেরা অপাঠ্য, অস্পৃশ্য ও মান্ধাতার আমলের প্রত্নবস্তু বলে বিদায় না করে—তা হলে তিন চার পুরুষ ধরে রবীন্দ্ররচনাবলীর পাঠ সমাপ্ত হ'তে পারবে। রবীন্দ্রনাথ ত্রিযুগের কবি—তিনি অতীতের কবি, অনায়াসে তাঁকে হর্ষবর্ধনের সভায় বসিয়ে দিতে পারা যেত। যে যা বলুক বর্তমান যুগেরও কবি তিনি বটেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতেরও তিনি কবি—তাঁর রচনাবলীর অনেকাংশের আদর্শ পাঠক এখনও জন্মেনি। তার দিদিমা এখন হয়ত কমলা গার্ল্স স্কুলে নীচু ক্লাসে পড়ে। অতএব রচনাবলীর পাঠক তোমার অনাগত বংশধর-গণের মধ্যে প্রতীক্ষা করছে।

তোমার পাঠকত্ব সম্বন্ধেই আমার ঘোরতর সন্দেহ। তোমার পাঠসঙ্কল্পটা শ্মশান-বৈরাগ্যের মত সাময়িক মায়া মাত্র—সমস্ত খণ্ড প্রকাশিত হবার আগেই তা বিলীন হয়ে যাবে। তুমি এ বয়সে পড়াশুনা ক'রে প্রস্তুতও হবে না—তোমার পাঠবিমুখতা, আলস্য, প্রমোদ-পিপাসা, জীবনযাত্রার ধারা ও ক্লান্তি কোনদিন ঘুচবে না। বরং বয়সের সঙ্গে বেড়েই চলবে। পরীক্ষাগুলো পাস করতেই যাদের শক্তি-সম্বল সবই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তুমি তাদেরই প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথকে যদি এম-এ পর্যন্ত পাস করতে হ'ত তা হ'লে তাঁর অফুরন্ত শক্তি নিঃশেষ হতো না বটে, তবে রচনাবলীর

এতগুলো ভল্যুম হ'ত না। আমি হয়ত বৃথাই বকলাম, আমার আশঙ্কা হয় রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ তোমার দ্বারা সম্ভব হবে না। বই কিনলেই বই পড়া হয় না। তাহলে 'মেহগিনির মঞ্চ পরে পঞ্চ হাজার গ্রন্থ'—যার ঘরে, সে বৃহস্পতি হয়ে উঠত। পড়া যার নেশা সে একখানা বই না কিনেও অবিরত পড়ে। চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে ক'রেও বই সংগ্রহ ক'রে পড়ে। বইএর দোকানের কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়েও পড়ে। এমনকি যার বাড়িতে রাশি রাশি বই আছে, তার বাড়ি থেকে বইএর সঙ্গে বৌও আনে অর্থাৎ কিনা তার কালো মেয়েকেও বিয়ে করে। যার জ্ঞানে অনুরাগ বা আগ্রহ নেই—সারা বছরে একখানা বইও সে পড়ে না। লাইব্রেরী তার কাছে মালগুদাম। যে ছেলে ভাঁটা খেলে তার নাটাপারা চোখ। তোমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠের পক্ষে প্রতিকূল।

একদিন পরীক্ষাপাসের জন্য যথেষ্ট অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়েছিল—লক্ষ্য ছিল উদরান্ন-সংস্থান। রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠের জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী অভিনিবেশের প্রয়োজন হবে, অথচ কোন ঐহিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই এতে, সাংসারিক সুবিধাও নেই। ৭৫৲ টাকার বিনিময়ে রচনাবলী পাবে—কিন্তু সে অভিনিবেশ কি তার সঙ্গে পাবে? বাইরের ঘরের আলমারিতে বইগুলি সাজিয়ে রাখলে বাড়ির প্রেস্টিজ অবশ্যই কিছু বাড়বে। তবে আপ-টু-ডেট হতে গেলে তাতেও হবে না—শ'খানেক নব্যধারার কাব্যগ্রন্থও কিনতে হবে।

আমার কবি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অবধান নীরবে বসেছিলেন ঘরে—তিনি বললেন,

—বিনোদবাবু, শোনেন কেন জ্যাঠামশায়ের কথা। ওঁর প্রিন্সি-পাল সাহেব টেমপেস্ট পড়াবার আগে—

আমি—না রে হতভাগা। মার্চেন্ট অব ভিনিস।

অবধান—মার্চেন্ট অব ভিনিস পড়াবার আগে শেক্সপিয়ারের সব

নাটকগুলো, ইহুদী জাতের ইতিহাস, রোমান ইতিহাস পড়িয়েছিলেন —হোলি গ্রেল পড়াবার আগে এগারোখানা টেনিসনের আইডিল, ও কিং আর্থারের লেজেণ্ডস সব পড়িয়েছিলেন।

আমি—ঠিকই করেছিলেন।

অবধান—সেই গুরুর চেলা উনি। বর্ধমান যেতে হলে সকালে সারারাত না ঘুমিয়ে রাত তিনটায় সবাইকে ওঠান। দুঘণ্টা আগে হাওড়া স্টেশনে যান। আপনাকে যে মূল হিব্রুতে লেখা সাম্‌স্‌গুলো পড়তে বলেননি—এ আপনার ভাগ্যি। ওঁর কথা শুনবেন না। সবাই বুঝতে পারে—বালকেও বুঝতে পারে রবীন্দ্রনাথের এমন লেখা রাশরাশ আছে। তবে সে সব রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। পাতা উল্টাতে উল্টাতে সব পেয়ে যাবেন। রবীন্দ্র সাহিত্য পড়তে কোন আয়োজন করতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের লেখা মোটের উপর বেশ সোজা। আমাদের লেখা বরং শক্ত, আমাদের লেখা বুঝবার জন্য বরং সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি চাই। জ্যাঠামশায় নিজেই আমাদের লেখা বোঝেন না—সেজন্য বরং তাঁর প্রস্তুতি চাই।

আমি—হতভাগা, তোদের লেখা বুঝবার জন্য এই বয়সে আমাকে প্রস্তুত হতে হবে? বলিস কি? প্রলাপ বুঝবার জন্য প্রস্তুতি?

অবধান—এত বয়সে বিনোদবাবুকে যদি রবীন্দ্রসাহিত্য বুঝবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়, আমাদের লেখা বুঝবার জন্য আপনাকে বৃদ্ধ বয়সে প্রস্তুত হতে হবে বৈকি?

আমি—দেখ, আমি জ্যাঠা নই, তুই জ্যাঠা।

দেখলে বিনোদ, আজকালকার ছেলেদের আস্পর্ধা! আবার দাঁত বার ক'রে হাসছে নির্লজ্জটা।

নির্লজ্জ

নীলমণি আমার এক বন্ধুর ছেলে, পড়াশুনা কখনো করেনি,—খেলাধূলা, আমোদ, উৎসব, ক্লাব-সমিতি—নানারূপ হুজুগ ফাংক্‌সন নিয়ে কাল কাটাত। ফলে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করতে পারল না। শেষে এখন একটা পাবলিশিং হাউসে কাজ করে, আর একটা মাসিক পত্র আফিসে যাতায়াত করে, তার জন্য লেখা সংগ্রহ করে, সাব-এডিটর বলে তাতে তার নামও ছাপা হয়। কয়েকটা গল্প লিখেছে, কবিতাও লেখে মাঝে মাঝে। এই তার সাহিত্যসেবা।

সে এসে প্রণাম করে বললে—"আপনাকে একটা সুসংবাদ দিতে এলাম। আমি কাল বেনারস যাচ্ছি—সেখানে একটা সংস্কৃতি সম্মেলনে আমাকে প্রধান অতিথি করেছে।"

আমি—সে কি রে! বেনারস অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত বাঙালীর বাসভূমি—সেখানে সভায় তুই প্রধান বক্তা! সভাপতি কে?

নীলু—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খুব বড় অধ্যাপক।

আমি—তুই তো লেখাপড়া শিখিস নি, কি বলবি সেখানে? চিন্তার বিষয়। ভাবিয়ে তুল্লি! তোর একটা দায়িত্ব বোধ নেই?

নীলু—ভাববেন না জ্যাঠামশায়, সে ঠিক হয়ে যাবে। আপনার আশীর্বাদে আপনাদের নাম ডোবাব না। ঠিক হয়ে যাবে।

আমি—তা তো হয়ে যাবে—তারা কি তোকে ধরে মারবে? কিন্তু তুইত কম নির্লজ্জ নস্!

নীলু—এই যে বিদ্বৎসমাজের নিমন্ত্রণ পেয়ে ভারতবর্ষের কত লোক ইউরোপ যাচ্ছে—তাদের সবাই তো সে দেশের ভাষাও জানে না—অনেকে ইংরেজি লেখাপড়াও ভালো করে জানে না। তারা কি নির্লজ্জ?

আমি—তারা তো যাচ্ছে গেস্ট হয়ে, কোন ডিস্‌কোর্স বা লেকচার দিতেও যাচ্ছে না, ভারতের বাণীপ্রচার করতে বা

বাদানুবাদ করতেও যাচ্ছে না। পরদেশী ভাষা যদি নাই জানে তাতে লজ্জা কি? তা ছাড়া তাদের সেক্রেটারি থাকে, দোভাষী থাকে। চলনসই ইংরেজী সবাই জানে। এ আর তা এক হলো?

নীলু—যাই বলুন, কি শিক্ষাক্ষেত্রে কি রাজনীতিক্ষেত্রে কি সাহিত্যে কি চাকরিবাকরি যোগাড় করতে বা রাখতে নির্লজ্জ না হলে সাফল্য বা উন্নতি নেই, কোন সুবিধাসুযোগ পাওয়া যায় না। আমাকে আপনি নির্লজ্জ বললেন—সারা দেশই তো নির্লজ্জে ভরে আছে।

আমি—সে কিরে, বলিস কি? সারা দেশ?

নীলু—লজ্জা মানে তো দাসমনোভাব, আত্মপ্রত্যয়হীনতা, উদ্যম ও সাহসের অভাব, ভীরুতা। যে কোন উপায়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে যদি কেউ দেখেন তাঁর চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিত্বশালী বিদ্বান্ ও গুণী লোক তাঁর তাঁবেদারি করছে, অধীনে কলম পিষছে—বকুনি খাচ্ছে—তাতে কি তাঁর লজ্জা হয়? লজ্জা পেলে উচ্চপদে চাকুরি করা চলে? যে আসনে মহামনীষীরা বসে গেছেন, একদা উপযুক্ত মানুষের অভাবে সে আসনে সাধারণ একজনকে বসাতে হয়—তাঁর লজ্জা থাকলে সে আসনের কাজ কি করে চলে? সে আসন কি শূন্য থাকবে?

গণ্যমান্য ব্যক্তি বিদ্বজ্জনের সভায় সভাপতি হয়ে পাঁচ মিনিট বাংলায় দু-কথা বলতে গিয়ে যদি গলদ্‌ঘর্ম হন—একটি মূল্যবান কথাও মুখ দিয়ে যদি না বেরোয়—তবে তাঁর কি তাতে লজ্জা হয়?

আবার এমন সব বক্তা আছেন—যাঁরা দাঁড়িয়ে উঠলে আর বসতে চান না—অনর্গল আবোল-তাবোল বকে যান, এক কথার পুনরাবৃত্তি করেন, সে বক্তৃতার না আছে পরম্পরা, না আছে কোন যুক্তি। শ্রোতারা একে একে উঠে চলে যায়—তবু তাঁদের কি তাতে লজ্জা হয়? তাঁরা সভা থেকে সভান্তরে বীরদর্পে চলে যান।

যদি কেউ পরের লেখা পুস্তকে (প্রধানত পাঠ্য পুস্তকে) নিজের

নাম সই করে মুঠো-মুঠো টাকা আদায় করেন এবং সেই বইএর নির্জলা প্রশংসা শোনেন অনুগত ভক্তদের মুখে,—তবে তাঁর কি তাতে লজ্জা হয়?

বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বৈঠকখানায় যান দেখবেন সকাল সন্ধ্যায় শোনা যাবে স্তাবকের দল দিনের পর দিন মিথ্যা চাটুবাক্যে কর্তার গুণগান করছে। কর্তার কি তাতে লজ্জা বোধ হয়?—কর্তা কি বিরক্ত হয়ে ক্যানিউটের মতো স্তাবকদের দূর করে দেন? দূর করে দিলেও কি স্তাবকরা লজ্জা পায়?

কপালে চন্দনের ফোঁটা পরে গলায় মালা ছুলিয়ে অভিনন্দিত মহাজন অত্যুক্তিতে ভরা মানপত্র পাঠ শুনতে থাকেন—তাঁর তাতে কি লজ্জা বোধ হয়? তিনি কি বলেন—মিথ্যা অত্যুক্তি শুনতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। থামুন, থামুন। আমি ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য নই।

দেনা করে কেউ কেউ বাবুগিরি করে—ঘর-ছুয়ার সাজায়—তুচ্ছ উপলক্ষেও লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়—সমাজে বেশ নাম ডাক আছে। কিন্তু পাওনাদার এলে খিড়কি দরজা দিয়ে পালায়, তাদের কি লজ্জা বোধ হয়? পণপ্রধান বিবাহাদি, পারিবারিক অনুষ্ঠানের কোন কোন নিমন্ত্রণে কি ভোক্তা ও ভোজয়িতা উভয়েরই লজ্জা পাবার কথা নয়?

অনেক মূলধনী, মহাজন ইত্যাদি মানুষের দুর্বলতা মূর্খতা নিরুপায়তার সুযোগ নিয়ে এক্সপ্লয়েট করে, তারা কি লজ্জা পায়? পণলোভী পুত্রাধিকারী আপন নিকট আত্মীয়কে বিপন্ন ও ঋণগ্রস্ত ক'রে কি লজ্জা পায়? বাড়ির মালিক আশ্রয়প্রার্থীর কাছে অত্যন্ত অসঙ্গত সেলামি ও ভাড়া দাবি ক'রে কি লজ্জিত হয়? পক্ষান্তরে গৃহখানি-মাত্র-সম্বল নিরুপায় বিধবা বা ছাপোষা অল্পবিত্ত গৃহস্থের বাড়ির অংশ সামান্য ভাড়ায় অধিকার ক'রে আইনের দোহাই দিয়ে বছরের পর বছর তাকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে কি ভাড়াটিয়া লজ্জিত হয়? এমন কি যে নিজে বাড়া তৈরী করেছে সেও যদি এ সুবিধা না

ছেড়ে, চড়া হারে নিজের তৈরী বাড়িখানা ভাড়া দেয়—তবে তাকে কি বলবেন ?

কোন এক্সপ্লয়েটারই মানুষের নিরুপায় অবস্থার সুযোগ নিতে ছাড়ে না। তারা কি নির্লজ্জ নয় ?

বর্তমান যুগের তরুণসমাজের কথাই ধরুন। ট্রামে বাসে বালবৃদ্ধবনিতাকে ঠেলে প্যান্টপরা যুবকরা নিত্যই ট্রাম বাসে উঠছে নামছে। বৃদ্ধ লোকেরা তাড়াতাড়ি উঠে সীট দখল করতে পারে না ব'লে ট্রাম-বাসে টলতে টলতে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে চলে—আর পৌত্রের বয়সীরা দিব্যি আরাম করে বসেই রসালাপ করতে করতে চলে। তাদের কি লজ্জা বোধ হয় ?

বিজাতীয়া বা অবাঞ্ছিতা নারীর মোহে পড়ে যারা মাতাপিতা ভাইবোন ধর্ম সমাজ কুলাচার সব ত্যাগ করে—তারা কি লজ্জা পায় ? তাদের বিপরীত-পথচারী শ্বশুরারিদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায় না কি ?

পীনাঙ্গ প্রৌঢ় পীনাঙ্গী গৃহিণীর সহিত রিক্স থেকে নেমে যদি চার পয়সার জন্য আপন বাড়ির দুয়ারে পেয়ে রিক্সওয়ালাকে গাল মন্দ করেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলায় ঘর্মাক্ত ফেরিওয়ালার ডালা ধরে যদি পুরমহিলারা একটা বেশি আমের জন্য টানাটানি করেন, আর অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিয়ারা বাজারে চার পয়সায় যদি আরো এক আঁটি শাক টেনে নিতে চান কাঙালিনীর ডালা থেকে, তবে তাঁরা কি লজ্জা পান ?

ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করলে যিনি চোখ রাঙান এবং বলেন, আদালত খোলা আছে নালিশ করে নাওগে, তাঁর কি লজ্জা আছে ?

পক্ষান্তরে যে টাকা ন্যায্য নয় শ্রম-বিনিময়ে প্রাপ্য নয়—তা গ্রহণ করতে কজন লজ্জা পায় ?

কাজের ভার নিয়ে কাজ দিতে না পারলে কজন লজ্জিত হয় ?

আমরা কি কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারলে লজ্জিত হই? বই পড়তে নিয়ে বই ফেরত না দিলে বা না দিতে পারলে লজ্জিত হওয়ার কথা। কিন্তু ক'জন তাতে লজ্জিত হয়? আপনি তো একজন গ্রন্থকার; প্রকাশক ও লেখকের সম্পর্কের কথা আপনার ভালো করে জানার কথা। কোথাও লেখক সবল ও প্রবল কোথাও প্রকাশক; প্রবলের পক্ষ থেকে চক্ষুলজ্জার বালাই সর্বত্র আছে কি না বলুন ত? চক্ষুলজ্জা থাকলে পুস্তক ব্যবসা চলত? শুধু এ ব্যবসা কেন, কোন ব্যবসাই চলত না। বয়স লুকিয়ে অর্থাৎ কমিয়ে—যাক আর দৃষ্টান্ত বাড়াব না। ইউনিভার্সিটি এজ্ বলে একটা কথাই চলিত আছে। আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি—আর দেব না আমার বেহায়া ভায়ারা রাগ করবে। দৃষ্টান্ত বাড়ালে আপনার সত্যই ধারণা হবে নির্লজ্জে এদেশ ভরা। যার জন্য আমাদের লজ্জা পাওয়ার কথা তার উল্লেখ করলে আমরা রাগ করি, তর্ক করি, দু-কথা শুনিয়ে দিই লজ্জা পাই না। খুব ভদ্র যে সে বলে 'সরি'। লজ্জা পাওয়াটা মনুষ্যত্বের লক্ষণ। এখন বলুন জ্যাঠামশায়, নির্লজ্জ না হলে এদেশে—এদেশে কেন—সব দেশেই বোধ হয়, উন্নতির বা গণ্যমান্য হবার কোন আশা আছে কি না?

কোন একটা বিষয়ে বড় ডিগ্রী পেয়ে কেউ উচ্চাসন লাভ করলে এদেশে তাঁকে সবজান্তা মনে করা হয়। সত্যই তো তিনি সর্বাধিকারী বা সর্বজ্ঞ নন। যে বিষয়ে তাঁর অধিকার মোটে নেই সেই বিষয়ের বিচার-ভার বা কোন কর্মভার তাঁকে দিলে যদি তিনি বলেন—এ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাতে তাঁর লজ্জার কোন কারণ নেই, বরং সেরূপ ভার গ্রহণেই লজ্জা আছে। ভুলক্রমে অনধিকার চর্চার ভার কারো হাতে অর্পিত হতে পারে—লজ্জা থাকলে অনধিকারী সে ভুল বুঝিয়ে দেবেন এইতো স্বাভাবিক। ক'জন অনধিকারী তা করেন?

নারীদের কথা আর বললাম না। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম

জানিয়ে নীলু বল্‌লে—জ্যাঠামশায়, আর একটা কথা বলে শেষ করব—রাগ করবেন না কিন্তু।

আমি—বল্, কি আর বাকি রাখলি বলতে?

নীলু—আপনাকে তো নব্যযুগের লেখকরা আর বাংলা ভাষার তরুণ অধ্যাপকরা কবি বলে স্বীকারই করে না। ওরা বলে ওঁর লেখা ঐতিহ্যমূলক গ্রামকেন্দ্রিক, একেবারে সেকেলে। কোন বৈশিষ্ট্য নেই ব্যাকরণ-ঘেঁষা, অপাঠ্য। তা সত্ত্বেও আপনি এখনও কবিতা লেখেন —এতে আপনার লজ্জা—

আমি—ওরে থাম্ থাম্। আমি বেশ বুঝেছি তুই ঘরে বসে পড়াশুনা করে ঢের উপযুক্ত হয়েছিস। তুই যে সব যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিলি তাতে বুঝেছি—তোদের বড় বড় সাহিত্যকদের চেয়ে যে-কোন সভায়—যে কোন সম্মেলনে পৌরোহিত্য করবার ঢের বেশি যোগ্যতা লাভ করেছিস। তুই একদিন একটা কোন বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের সভাপতি হতে পারবি।

নীলু একটা অভিভাষণ লিখে নিয়ে এসেছিল। সেটা একটু দেখে শুনে দেওয়ার জন্য দিয়ে হাসতে হাসতে বীরদর্পে চলে গেল।

টাইম-সার্ভার

চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। ল্যানস্‌ডাউন রোড দিয়ে আসছি—একখানা মোটর সাঁ করে এসে প্রায় চাপা দিয়েছিল আর কি! মোটরচালক কোটপ্যান্ট-পরা ভদ্রলোকটি বল্‌ল—'কোথা যাবি? উঠে পড়। উঠে পড়।' মোটরের দুয়ারে হাত দিয়ে দেখি আমাদের মেজদা মোটরের রথী সারথি দুই-ই। আমি বললাম—'মেজদা, তোমাকে চিনতে পারিনি—তুমি কোথেকে? কার মোটর? ব্যাপার কি? এ পোশাক কেন?'

মেজদা—ওঠ ত, তারপর বলছি। একেবারে এক ঝলক প্রশ্নবাণ!

তাড়াতাড়ি মোটরে উঠে বস্‌লাম।

আমি—খুব দামী মোটর, কার মোটর বলত।

মেজদা—শোন, আমি এখন মিঃ এন সি মিত্র জমিদার সাহেবের সেক্রেটারী। এটা তাঁরি মোটর।

আমি—বা! আমি ত কিছু জানি না। তোমাকে আমি চিনতেই পারিনি। একেবারে ফিরিঙ্গি বনে গেছ।

মেজদার একটু পরিচয় দিই। আমার সহপাঠী বিনয়ের মেজদাদা এই বিজয়। স্কুল হতেই বিজয় লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল—গান-বাজনা, ফুটবল, টেনিস, শিকার, সাঁতার, ব্যায়াম, থিয়েটার এই সব দিকেই তার অনুরাগ। সে যে কোন দিন রোজগার করতে পারবে—তা বিনয়ের বাবা স্বপ্নেও ভাবেননি। তিনি ওর আশাই ত্যাগ করেছিলেন।

মেজদা একটা সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—ধরা।

আমি—সিগারেট ত খাই না, মেজদা।

মেজদা—এখনো সেই সুবোধ গোপালটিই আছিস। ভাইটালিটির অভাবে তোর কিচ্ছু হবে না।

আমি—মেজদা, তুমি সেক্রেটারী হয়েছ। তোমার বিদ্যে ত জানি। ইংরেজিতে চিঠিপত্র লেখ কি করে?

মেজদা—ও সব এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী লেখে—সে ইংরেজির এম-এ। ও-একটা ষ্টিরিওটাইপ্‌ড্‌ ব্যাপার।

আমি—তবে তুমি কি কর?

মেজদা—আমি মিত্তির সাহেবের সঙ্গে শিকারে যাই হাজারি-বাগ অঞ্চলে, সুন্দরবন অঞ্চলে। তিনি যত পার্টি দেন তা অর্গানাইজ করি, তাঁর সঙ্গে বৈকালে টেনিস খেলি, সন্ধ্যার সময় বিলিয়ার্ড খেলি। দার্জিলিং, শিলং, সিমলা গেলে সঙ্গে থাকি গাইড হয়ে। টাকা-কড়ির কাজ সব আমার হাতে। সেক্রেটারীও বলতে পারিস, কম্প্যানিয়নও বলতে পারিস।

আমি—যে রকম মনে হচ্ছে তুমি মদও ধরেছ হয়ত।

মেজদা—মদ ত ধরেছিই—নইলে চাকরী থাকে না। মাতাল হই না, সোবার থাকি, আর নিজের পয়সায় খাই না। তা ছাড়া, বুঝেছিস সব রকম খানাই খাচ্ছি। বাই দি বাই, আসছে বছর, এই মাস পাঁচেক পরেই বিলেত যাচ্ছি যে সাহেবের সঙ্গে।

আমি—বিলাত যাবে? তোমার ইংরেজির বিদ্যে ত আমার জানা আছে। কি ক'রে ম্যানেজ করবে?

মেজদা—সে মেজদা আর নেই, ইংরেজি আমি লিখতে পারি না, কিন্তু ফ্লুয়েণ্টলি বলতে পারি। সাহস, শুধু সাহস চাই, ব্র্যাস চাই, ড্যাশ চাই। তোরা যেমন পাছে গ্রামার ভুল হবে বলে ষ্ট্যামার করিস, আমার তা নয়—আনডণ্টেডলি বেশ বলে যাই, থামি না, সাহেবদের মুখে শুনে শুনে শিখেছি।

আমি—বাঃ! মেজদা, তুমি অনেক ভালো ভালো ইংরেজি শব্দ শিখে ফেলেছ দেখছি। ইংরেজি বই পড়ে বুঝতে পারো?

মেজদা—এখন কত কথা শিখে ফেলেছি। আমি ইংরেজিতে কথা বলে যাচ্ছি—বল আমার সঙ্গে? বইফই পড়তে চেষ্টা করি না, তবে চিঠিপত্র পড়ে বুঝি। ওরে ফারপোতে তোকে কিছু খাইয়ে নিয়ে যাই,—নাম এখানে।

আমি—না মেজদা, ওসব আমার চলবে না।

মেজদা—এখনো তুলসীপাতার ঝোল চালাচ্ছিস। তোর কিছু হবে না। মাষ্টারি আর টিউশনী করে জীবন কাটবে।

কয়েক বছর পরে এক ভদ্রলোক কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে পিছু হতে এসে ঘাড়ে হাত দিতেই চমকে উঠলাম—'চিনতে পার্‌লি না গলার স্বর শুনে?' ভালো করে তাকিয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠলাম—'মেজদা!'

মেজদা—চিনেছিস্ তবে। না চিনবারই কথা।

আমি—একি মেজদা তোমার এত বড় দাড়ি! তুমি সাদা ধুতি চাদর পরেছ! ব্যাপার কি? তোমার সেই জমিদার সাহেবটি গেল কোথায়?

মেজদা—সে বেটা রুইনড্ হয়েছে, সে রেস খেলতে লাগল। তা ছাড়া, পঞ্চমকার—মদ, মেয়েমানুষ, মামলা, ময়দান, মোসাহেব।

আমি—তুমিও ময়দানে রেস খেলতে?

মেজদা—আমিও ধরতাম টাকা। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই দাঁও মারতাম, ও বেটা ফতুর হয়ে গেল। আমি এখন যে এক ব্রাহ্ম জমিদারের এষ্টেটে কাজ করি।

আমি—চললে কোথা?

মেজদা—সমাজে প্রেয়ার করতে, আয় না দেখবি।

আমি—না আমি কোথা যাব? পাগল নাকি? বরং তোমার ঠিকানা দাও, বাড়ীতে দেখা করব।

মেজদা—না না তুই আয়। হাসিস না যেন ওখানে গিয়ে। খুব শান্ত সভ্য হয়ে থাকবি।

সেখানে মেজদার ভক্তির ভান দেখে আমি বহু কষ্টে হাস্যসংবরণ করে বসে থাকলাম।

আমি—মেজদা, একি আবার তোমার নতুন অভিনয়!

মেজদা—ওরে গাধা, তুই কি বুঝবি, যখন যা তখন তা। জানিস আমি ব্রাহ্ম-বান্ধব পত্রিকার ট্রেজারার ও সহকারী সম্পাদক। এখন সেই অফিসে যাব। যাবি আমার সঙ্গে?

আমি আর সঙ্গে গেলাম না, আমার ঠিকানা দিয়ে এলাম। ৩।৪ দিন পরে মেজদা এসে বলল—আজ তোর বৌদি তোকে নিমন্ত্রণ করেছে রাত্রে, খেতে যাস।

আমি—ভালো কথা, তুমি কোথায় বিয়ে করলে? কবে করলে? কিছুই জানালে না!

মেজদা—বিয়েটা ব্রাহ্মমতেই হয়েছে। কাউকে জানানো হয়নি। তবে সুবিধার কথা হচ্ছে—তোর বৌদিদি ভিনজাতের মেয়ে নয়। স্বজাতিই বটে। যাস্ যেন।

সন্ধ্যার সময় মেজদার বাসায় গেলাম। দুয়ারের উপরে লেখা 'ওঁ তৎসৎ', ঘরের দেওয়ালে একটা কাচের ফ্রেমে দুলছে 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।' ঘরে ব্রাহ্মভক্তদের ছবি। বৌদিদির সঙ্গে আলাপ হল। বৌদিদি শিক্ষিতা, সাহিত্যেরও কিছু কিছু খোঁজ রাখেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মেজদা বলল্—তোকে তিনটে আর্টিকেল লিখে দিতে হবে।

আমি—আর্টিকেল কেন? কিসের ওপর?

মেজদা—তবে শোন, ভিন্ন ভিন্ন কাগজে বিজয় বসুর নাম দিয়ে যত লেখা বেরোয় সব আমি আমার নিজের নামে চালাচ্ছিলাম। ফলে, আমাকে ব্রাহ্ম-বান্ধব কাগজের সহকারী সম্পাদক হতে হল। সম্পাদক আমার মনিবের খুড়শ্বশুর, তিনি বলেন, পরের কাগজে এত লেখা দেন, আর নিজের কাগজে কেন লেখেন না? ব্রাহ্ম কাগজের মত লেখা চাই ত, অন্য লেখা হলে তোর বৌদির কাছেই

লিখিয়ে নিতাম—তোর বৌদি কবিতা লেখে। গল্পও দু' একটা লিখতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় আছে,—শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করে, ধর্ম সম্বন্ধে সে কিছু জানে না। এখন তোকে ক'খানা বই দিচ্ছি এঁদের। তুই এ থেকে তিনটে আর্টিকেল আমাকে লিখে দে। প্রত্যেক আর্টিকেলের জন্য তোকে ১৫৲ টাকা করে দেব। এরপর আরো লিখতে দেবো—মাসে মাসে কিছু কিছু প্রাপ্তি হবে-রে।

আমি—দেখ' দেখি আমাকে কি বিপদে ফেললে। এঁদের ধর্ম ও সমাজের কথা আমি কি লিখব, বল'।

মেজদা—খুব পারবি। এই ইংরেজি বাংলা বইগুলো দিলাম ত। টাকার জন্য ভাবিস না। এখানেও বেশ দু' পয়সা আছে রে আছে! এঁরা একটু সরল-প্রকৃতির লোক। মানুষকে সহজে অবিশ্বাস করেন না। একটু চোখ বুজেই থাকেন ; বুঝলি।

আমি ৭টা প্রবন্ধ মেজদাকে লিখে দিয়েছিলাম। মেজদার নামে বেরিয়েছিল—আমি একশো পাঁচ টাকা পেয়েছিলাম। মেজদা আমাকে ঠকায়নি।

অনেক দিন আর মেজদার খোঁজ পাইনি। কয়েক বছর পরে জন্মাষ্টমীতে এক মফঃসল শহরে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়ী। দুপুর বেলায় সহসা তুমুল কলরবের সঙ্গে খোল-করতালের শব্দ শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। শুনলাম, স্থানীয় রাজাবাহাদুরের নন্দোৎসবের সংকীর্তন আসছে। ৫।৭ শ' লোক নিয়ে কীর্তনের দল। বৈষ্ণবরাজা দলের আগে আগে চলেছেন,—তাঁর পিছুতে একজন বৈষ্ণব গুণ্ডা সমস্ত পথ বড় ঝাণ্ডা হাতে করে আসছে—১৬ খানা খোল আগে আগে বাজতে বাজতে চলেছে। পথে পথে দধি হরিদ্রার জল ছিটানো হচ্ছে। ঝাণ্ডা-ধারীকে দেখে চিনি মনে হতে লাগল। যার কথা মনে আসছে সে মফঃসল শহরে কীর্তনের দলে ঝাণ্ডাধারী হয় কি করে তাই ভাবছি। আমার বন্ধুটি শহরের

গণ্যমান্য লোক। কাজেই তাঁর দরজায় এসে দলটি থেমে উদ্দণ্ড কীর্তন আরম্ভ করল। ঝাণ্ডাধারী সহসা আর একজনের হাতে ঝাণ্ডা দিয়ে একখানা খোল কেড়ে নিয়ে আড়াই হাত তিন হাত লম্ফ দিয়ে দিয়ে বাজাতে লাগল। অন্য ১৫ জন খুলেকেও সাধ্যমত লম্ফ দিতে হল। কীর্তনের মিছিল চলে যাওয়ার পর আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"খোল নিয়ে সবচেয়ে বেশি যে লাফ দিচ্ছে, ও কে বলুন ত।"

তিনি বললেন—"ও হলো বিজয় বোস, রাজার এষ্টেটের সুপারিন-টেনডেণ্ট। পরম বৈষ্ণব-ভক্ত মানুষ। হরিনামের ঝোলা সব সময়েই গলায় ঝোলে।"

আমি—বিজয় বোস? থাকে কোথা?

বন্ধু—থাকে আমাদের পাড়াতেই।

বৈকালে আমি বিজয়দাদার বাড়ী যাব-যাব মনে করছি এমন সময় একটি ছেলে এসে একটু চিরকুট দিল—তাতে শুধু লেখা আছে—"কিরণের সঙ্গে চলে এসো। রাত্রে এখানে খাবে।" ইতি মেজদা। বুঝলাম, নৃত্যের মধ্যেই মেজদা আমাকে দেখেছিল।

কিরণের সঙ্গে গেলাম বিজয়দার বাড়ী। দুয়ারের উপরে লেখা—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বিজয়দা রাধামাধবের ঘরে বসে মালা জপ ছিলেন—তাঁর গলায় তুলসীর মালা—মাথায় মস্ত বড় টিকি, গায়ে গঙ্গামাটির ছাপ, গোঁপদাড়ি কামানো।

মেজদা বল্‌ল—এখানে কবে এলি? ভাল আছিস্।

আমি—মেজদা, একি ব্যাপার! এ আবার কি ভোল! কত কাচই কাচবে তুমি?

মেজদা—এডাপটেশন,—যে কোন অবস্থার সঙ্গে এডজাষ্ট করে চলা। জড় তা পারে না, জীবই তা পারে। বাঁচতে হলে অনবরত

চারিপাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। এ বিষয়ে যে যোগ্যতম সেই সারভাইভ করে। তুইত লেখাপড়া জানিস—তোকে আর বেশি কি বলব ?

আমি—বাঃ মেজদা, তুমি তো দার্শনিক হয়েছ—তুমি রীতিমত ডারউইনের মত কথা বলতে আরম্ভ করেছ। এসব শিখলে কোথা ?

মেজদা—কেন ব্রাহ্মসমাজে কত জ্ঞানী লোকের সঙ্গে মিশেছি জানিস। আমিও কত জ্ঞানের কথা সবাইকে শুনিয়েছি—কি করে যে শোনাতাম তা আমিই ভেবে অবাক হয়ে যাই। বোধহয় এনভাইরনমেণ্টের গুণ।

আমি—ওখান হতে সরলে কেন ?

মেজদা—আরে ভাই, এক পাজি অডিটার এসে সব গোল বাধালে। অডিটর বেটা হিন্দু—সে একবারও চোখ বুজত না। বেগতিক দেখে সরে পড়লাম। এখানে ওসব উৎপাত নেই।

আমি—তুমি আমাকে কাল দেখেছিলে ?

মেজদা—বা রে—তোকে দেখেইত খোলখানা কেড়ে নিয়ে বাজাতে লাগলাম।

আমি—ওঃ তোমার এই বয়সে কি গায়ের জোর! ভাদ্দুরে রো'দে নগর পরিক্রমা ঝাণ্ডা হাতে, শাস্তি কম নয়। তুমি সব পারো।

মেজদা—তখন যে তোরা বলতিস মেজদার পড়াশুনা নেই—কেবল কুস্তি, ব্যায়াম। দেখ, শরীরখানা গড়েছিলাম বলেইত ভাদ্দুরে রোদে খোল গলায় ৪।৫ হাত লাফাতে পারলাম। তোরা সব ননীর পুতুল,—দেখিয়ে দিলাম পাথুরে শরীরের কেরামতি ননীর পুতুলদের।

তা ছাড়া, ঐ রাজা সাহেব, কত বড় লোক! খালি পায়ে তপ্তপথে শুধু গায়ে সারা শহর পরিক্রমা করলেন—সে কথা ত বলছিস্ না। লক্ষপতি মনিব যদি এতটা পারে, তবে আমি দুচার হাত লাফাতে আর পারব না ? রাধা-গোবিন্দর মন্দিরের উঠান তেতে আগুন,

তাতেই রাজাবাহাদুর গড়াগড়ি দিলেন—আমি উঠান হতে গড়াতে গড়াতে পথে এলাম—তারপর গড়াতে গড়াতেই আসছিলাম—রাজাবাহাদুর হাত ধরে তুললেন বলেই উঠলাম। তা ত তুই দেখিসনি।

আমি—আচ্ছা মেজদা, মনিবের সামনে যা কর, তা কর—বাড়ীতে এত সব ভণ্ডামি ঢঙ কেন ?

মেজদা—ওরে গাধা, গুপ্তচরের কি অভাব আছে ? ঝি-চাকরগুলোই রটাবে আমি আসল বৈষ্ণব নই। আমার ভণ্ডামি প্রমাণ করার জন্য শহরের লোকের চেষ্টা কি কম ? খুব সাবধানে থাকতে হয় বুঝলি।

আমি—এখন আর যা-তা খাও না,—তাহলে।

মেজদা—যা তা খাওয়াতো ব্রাহ্মসমাজে গিয়েই অনেকটা ছেড়ে দিয়েছিলাম—ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ার পর মদ আর ছুঁইনি,—মুরগী অবশ্য খেতাম। এখন মাছমাংস বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসতে পায় না। এখন মালপোয়াই প্রধান খাদ্য। খাসা জিনিস! এখন-ত দুবেলা ঠাকুরের ভোগ খাই। তোরা ভাবিস নিরামিষের মধ্যে বুঝি ভালো খাদ্য নেই। দুধ, ঘি, ছানা, মাখন ত কোন শাস্ত্র, কোন ধর্ম কেড়ে নিতে পারছে না। তা ছাড়া দাল দিয়ে কত মুখরোচক খাদ্য তৈরী হচ্ছে। তোর বৌদি কত খাবার তৈরী করেছে খেয়ে যা। সবেতেই তুলসীপাতা, বাস্, মহাপ্রসাদ হয়ে গেল। বৈষ্ণবরা কত উপাদেয় খাদ্য খায় তা চৈতন্য চরিতামৃত পড়ে দেখিস।

আমি—বৌদির এসবে আপত্তি হয় না ?

মেজদা—দূর বোকা, সেত সহধর্মিণী। সে খুবই বুদ্ধিমতী, এখন সে পরম বৈষ্ণবী। তার গলাতেও তুলসীর মালা দেখলি না।

আমি—অত লক্ষ্য করিনি—তবে বেশভূষা খুব সাদাসিধেই দেখলাম।

যাই হোক বৌদিদির আহারের আয়োজনটা কখনও ভুলব না। কি চমৎকার দই-বড়া আর মালপোই খেয়েছিলাম!

রাজবাড়ীতে ভাগবত পাঠের সভা বসবে। মেজদাকে তার সব ব্যবস্থা করতে হবে শুনে চলে এলাম আটটার মধ্যেই।

তারপর কয়েক বৎসর পরের কথা। হুগলী জেলার একটি গ্রামে পূজার ঠিক আগেই এক পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসব ছিল। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ছেলেরা সভাপতিত্ব করবার জন্য। স্টেশনে মোটর এসেছিল আমাকে নিতে—আমি একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম—গাঁয়ে তোমাদের মোটর কোথা পেলে ?

ছেলেরা বলল—আমাদের গাঁয়ে নেই, স্যার। পাশের গাঁয়ের বিজয়বাবুর মোটর। তখন কে বিজয়বাবু তা খেয়াল করিনি।

সভাস্থলে গিয়ে দেখি সভাপতির চেয়ারের পাশে বসে আছেন বিজয়দা। আমি অবাক হয়ে গেলাম। তখন মনে পড়ল এই অঞ্চলের এক গাঁয়ে বিজয়দাদার পৈতৃক বাড়ী।

আমি—মেজদা, তুমি এখানে ?

মেজদা—তুই এখানে কেন সেটাই আশ্চর্যের কথা। আমি যে প্রধান অতিথি। আমিই তো তোকে আনালাম। এরা কি তোর নাম শুনেছিল নাকি। আমার ত বাড়ীই এখানে, পাশের গাঁই তো আমার গাঁ। আমি এলাম তোকে নিয়ে যেতে।

আমি—সে কি মেজদা, আজই বাড়ী ফিরব বলে এসেছি।

মেজদা—আমি তোর বাড়ীতে একটা লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি—পূজোটা তুই আমার বাড়ীতে কাটিয়ে বাড়ী ফিরবি। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে চল।

আমি চেয়ে দেখলাম, মেজদার গলায় তুলসীর মালা নেই, মাথায় টিকি নেই। সভার পর মেজদার সঙ্গে তারি মোটরে তার বাড়ী গেলাম। মেজদার বেশ বড় দোতালা বাড়ী, প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, চকমিলানো বাড়ীর মধ্যে বেশ বড় আঙিনা। বাড়ী ঢুকতেই নবৎখানা। পাশেই ঠাকুরবাড়ী, সেখানে মন্দিরে মহিষমর্দিনীর নিত্য সেবা,—প্রত্যহ বলি হয়।

মেজদার বাড়ীতে দুর্গোৎসবে খুবই ধুম। তিনদিন গ্রামের লোকের মহামহোৎসব, এ বাড়ীতে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা। তিন দিনে অনেক বলিদান হল। রাত্রে যাত্রা, পাঁচালী কিংবা কবির গান।

রুদ্রাক্ষের মালা মেজদার গলায়, কপালে রক্ত চন্দন অনুলিপ্ত, পরনে গরদের কাপড়, অনবরত কণ্ঠে মা মা ধ্বনি। পূজোর তিনদিন মেজদা তিন ঘণ্টা ধরে চণ্ডী পাঠ করল বীরেন ভদ্রের চেয়ে উচ্চতর কণ্ঠে।

১৬টা ঢোল আর ১০খানা কাঁসরের সঙ্গে যখন সন্ধ্যায় দেবীর আরতি হ'ত, তখন সারা বাড়ীটা গম গম করত, মাঝে মাঝে মেজদার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে 'জয় মা জগদম্বা' ধ্বনি। রাজসিক আবহাওয়া চারিদিকে।

বিজয়ার দিন সকালে মেজদাদাকে বললাম—মেজদা একি কাণ্ড। বৈষ্ণবতা গেল কোথা ?

মেজদা—সেটা ত ভেখ, ভেখ নইলে কি ভিখ মেলে রে ভাই। আমরা আসলে শাক্ত। সব ভেখ ছেড়ে দিয়ে এখন আমার নিজের কৌলিক ও মৌলিক জীবনে ফিরে এসেছি। তার সঙ্গে, যা ছেড়েছিলাম, সবই ফিরেছে। তবে বয়সের সঙ্গে যার সামঞ্জস্য হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাই ফিরিয়ে এনেছি। রিটায়ার করেছি। পৈত্রিক ভিটাতেই যখন এলাম, তখন পৈত্রিক ধর্মকেও ফিরে পেলাম। এখন কোন বেটার ধার ধারি না।

তা ছাড়া, দেখ গাঁয়ের প্রভু হতে গেলে বৈষ্ণব হলে চলে না। শাক্ত না হলে কেউ মানে না—ভয়ও করে না। বাংলার জমিদাররা তাই সবাই ছিল শাক্ত।

আমি—তা তো হলো,—কিন্তু এত ধনসম্পদ কি ক'রে হলো ?

মেজদা—চিরদিন খোকাটি থেকে গেছ। এত বছর আমি যে এত অভিনয় করলাম, তাকি শুধু পেটে খাবার জন্য ?

টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখিনি—সব টাকা এই গাঁয়ে লাগ্‌নিতে

ছেড়েছিলাম। তেজারতি—তেজারতিতে এ সব হয়েছে। গাঁয়ের চারশো বিঘে জমি আমার হাতে এসেছে, গাঁয়ের সব পুকুরগুলো এখন আমার। তা ছাড়া, ছোট-খাটো তালুকও ২।১টা কিনেছি। বুঝলি হাঁদারাম। লেখ কবিতা আর পাড়াগাঁয়ের সভায় এসে মোড়ুলি কর। আমার তো একটা মেয়ে, তার বিয়ে দিয়েছি একজন বিলাত ফেরতা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। দাদার ছেলেদের পড়াশুনোর খরচ সব আমিই দিয়েছি—তারা বেশ ভালো কাজকর্ম করছে। আর সেই বিনয়টা চাকরী করতে গেল, এখন তার পেনসন হয়েছে শুনলাম মোটে ২৫০৲ টাকা। তাকে বললাম গাঁয়ে আয়, তোকে কিছু দেব। সে বল্লে তোমার অধর্মের পয়সা নেব না। নিবি না তো মর। একটা ছোট বাড়ী করেছে রাঁচিতে, সেখানে আছে। লেখাপড়া শিখে এই তো তার দশা। জয় মা জগদম্বা তোমারি করুণা—

যা দেবী সর্বভূতেষু তস্কারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

বৃদ্ধ চরিত্র

আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখা বা বলা আমার স্বভাব নয়। ধনী বা সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধদের কথা বলছি না। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত সমাজ সংসারের বৃদ্ধদের কথাই বলছি।

এ সমাজে সচরাচর দেখতে পাই—যৌবনে যাঁরা বেহিসেবী ছিলেন, বার্ধক্যে তাঁরা অত্যন্ত হিসেবী হয়ে পড়েন।

যৌবনে যাঁরা ট্রেনে কোথাও যেতে হলে ইণ্টার ক্লাসের নীচে নামতেন না, বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনতে দেখি। যাঁরা কখনও বাজারে আসতেন না, রিটায়ার করার পর তাঁরা বাজারে এসে দু'চার পয়সা নিয়ে দরকষাকষি করেন, ঝাপ্সা চোখে প্রত্যেকটা আলু বেগুন অনেকক্ষণ ধরে পরখ করে কেনেন। যৌবনে যাঁরা সকল লোককেই সহজে বিশ্বাস করতেন, বোধ হয় বারবার ঠেকে ঠেকে ঠকে ঠকে দেখে দেখে শিখে, বার্ধক্যে কাউকে তাঁরা সহজে বিশ্বাস করতে চান না। সমগ্র সংসারের দলিলপত্র, দেনা-পাওনার হিসাব, রসিদ ইত্যাদি তাঁরা সযত্নে রক্ষা করেন।

কোন কোন বৃদ্ধ লোককে দেখেছি খামের চিঠিপত্র পথের ডাকবাক্সে না ফেলে বা কারো হাতে ফেলতে না দিয়ে নিজে পোষ্ট অফিস যান তা ফেলতে। প্রিমিয়াম, ট্যাক্স, ইলেট্রিক বিল ইত্যাদির টাকা নিজেই দিতে যান।

পিতাপুত্রে একসঙ্গে কোন কাজে বেরিয়ে ভিড়ের সময় যুবক পুত্র ট্যাক্‌সি ডাকতে চায়, পিতা ট্রামে বাসে উঠবার জন্য জেদ ধরেন।

পরিচ্ছদ জীর্ণ, ছিন্ন বা শ্রীহীন হলে যুবকরা ফেলে দেয়। অনেক বৃদ্ধ কিন্তু ছাতা, জামা, জুতায় তালি বসিয়ে মেরামত করে সেগুলি বেশ চালান। কেউ সূঁচে সূতা পরিয়ে দিলে ছেঁড়া কাপড়-জামা নিজেরাই সেলাই করে নেন। অল্প ময়লা হ'লে তাঁরা জামা কাপড়

ধোবাবাড়ী পাঠাতে চান না—যৌবনে তাঁরা কোন দিনই তা করেননি। যৌবনে যিনি টাকার ভাঙানির আনি-পয়সা একটি একটি করে গুণে নিতেন না, তিনি বার্ধক্যে প্রত্যেক পাই পয়সা গুণে ভালো করে পরখ করে নেন।

যৌবনে যাঁরা হাতে টাকাকড়ি থাকলে দু'চার টাকা ধার দিতে বা কাউকে কিছু দান করতে ইতস্ততঃ করতেন না, বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের কাছ থেকে দুই-চার আনা চাঁদা আদায় করাও শক্ত হয়।—অম্লান বদনে তাঁরা ভিখারী ফিরিয়ে দেন। চাঁদা না পেয়ে পাড়ার ছেলেরা তাঁদের একটা কোন অবাঞ্ছিত নামকরণ করে।

যে বয়সে সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন থাকবার কথা অনেকে সেই বয়সে সংসারের খুঁটি নাটি নিয়ে উঞ্ছ মনোভাবের পরিচয় দেন, কোন কোনদিকে ক্ষীণ দৃষ্টিকেও শ্যেনদৃষ্টিতে পরিণত করেন।

আসন্ন মৃত্যুর বা পরলোকের ভয়ে স্বভাবতই বৃদ্ধদের ধর্মে মতি হয়, তাঁরা গুরুর আশ্রয় নেন, ধর্মগ্রন্থ পড়েন, আর ইহলোকের মেয়াদ বাড়াবার জন্য আহার-বিহারে সংযত হ'ন, দৈহিক বিপর্যয় ও বিপর্যাস তাঁদের খিটখিটে ক'রে তোলে, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁদের সন্দিগ্ধচিত্ত ও Cynic ক'রে তোলে, অতি সতর্ক করে তোলে, উপদেশদানে মুখর ও স্মৃতিকথার বিবৃতিতে বাচাল ক'রেও তোলে। এসবের কারণ বেশ বুঝতে পারি।

কিন্তু তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসেবী বা কৃপণ, অনুদার, স্বার্থপর ও সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে এত অবহিত হ'ন কেন? একটা কারণ হতে পারে, তাঁদের অবসর অফুরন্ত, সময় কাটে না। তাই খুঁটিনাটিও প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। এছাড়া, নিজের হাতে গড়া—নিজের শ্রমজলপাতে গড়া সংসারের প্রতি বিদায়ের আগে অন্ধ মমতাও হতে পারে। প্রকৃত কারণ, অর্থাভাব ও অর্থাগম সম্বন্ধে প্রত্যাশার অভাব। অর্জন যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন ক্ষয়, ব্যয় ও অপচয় নিবারণকেই অর্জনের অনুকল্প ব'লে গণ্য করতে হয়।

অপরের উপর নির্ভর করতে অসম্মতিও এর মূলে থাকতে পারে।

বিশেষ করে অর্থাগম সম্বন্ধে প্রত্যাশার অভাবই অনেক বৃদ্ধকে অতিরিক্ত হিসেবী ও অনুদার ক'রে তোলে। বৃদ্ধদের কয়জনই বা সরকারী চাকুরে? সরকারী চাকুরেরা অবশ্য পেনসন পান। এক সময়ে যখন পূরা মাহিনা পেতেন, তখন যে চালে চলতেন সে চালে চলাতো আর সম্ভব হয় না। কাজেই ব্যয়সঙ্কোচ করবার জন্য তাঁদের প্রয়াস হয় প্রচণ্ড। বহু পরিবারের পরিজনদের ঐ পেনসনের টাকাই প্রধান সম্বল।

যাঁরা পেনসন পান না, তাঁদের কেউ কেউ, ডাক্তার হ'লে চেম্বার খুলে বসতে পারেন, আইনজীবী হলে আশি বছর বয়সেও ষ্ট্রেচারে শুয়ে আদালত থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আসতে পারেন। বাকি বৃদ্ধদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কিংবা জীবন-বীমার সামান্য সম্বলের এক পয়সাও অপচিত না হয় যাতে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়।

এখন কথা হ'তে পারে—বৃদ্ধদের নিজস্ব আয় না থাকতে পারে, কিন্তু ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি, যাঁদের তাঁরা লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন, তাঁদের আয় তো থাকে।

বৃদ্ধদের পার্ক-মজলিসে এ প্রসঙ্গ উঠলে একজন বলে উঠলেন—এ প্রশ্নের কথাই উঠ্‌ত না গত শতাব্দীতে কিংবা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এখন দিনকাল বদলে গেছে হে, ভায়া।

আর একজন বললেন—এযুগের অনেক বৃদ্ধের আত্মমর্যাদাবোধ এত বেশী যে তাঁরা দীনভাবে কষ্টে থাকলেও, ভ্রাতা বা পুত্রের সাহায্য নিতে চান না। যেমন—আমি নিজে খুব কষ্ট করেই চালাই, তবু ভ্রাতা বা পুত্রের কাছ থেকে এক পয়সাও নিই না। নিতে অপমান বোধ হয়।

আর একজন বললেন—'তারা কিছু দিতে না চাইলে বা দিতে না পারলে তাই ব'লে মনকে প্রবোধ দিতে হয় এবং সে কথাই প্রচার করতে হয় বাধ্য হয়ে। অনেকের সন্তানসন্ততি আশানুরূপ

অর্জনক্ষম হয় না এবং তাদেরও সন্তানসন্ততির সংখ্যা বাড়তে থাকে, লক্ষ্মীশ্রীর যত অভাব হয়, ষষ্ঠীশ্রী ততই যে বৃদ্ধি পায়। তাদেরই অফুরন্ত অভাব, দেবে কোথা থেকে ভাই।

আর একজন বললেন—অনেক বৃদ্ধের নিজেরই অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রতিপাল্যের সংখ্যা অল্প নয়। বেশি বয়সে বিয়ে করলে বা দ্বিতীয়-তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করলে তা হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত তাদের বিশ বছর বয়সের পরও কন্যাগুলি পাত্রস্থা হয়নি। কোন কোন পুত্র হয়ত বেকার বসে আছে—সকলের শিক্ষাই হয়ত সমাপ্ত হয়নি। আবার অনেক বৃদ্ধের হয়ত পুত্রগুলি বেশ অর্জনক্ষম, কিন্তু তাদের চালচলনের চাপ এত বেশী যে তাদের নিজেদেরই কুলায় না। পুত্র পদস্থ হলেই শুধু হয় না, পদের মর্যাদা রাখতেই তার প্রাণান্ত হয়। যারা টানাটানির সংসারে পালিত হয়েছে, তারা অর্জনক্ষম হয়ে হয়ত প্রাণ ভরে শখ মিটিয়ে, সাধ মিটিয়ে ভোগ ক'রে নিতে চায়। এখন প্রত্যেক অর্জনক্ষম যুবকের ব্যক্তিগত ব্যয় কত জানো? তাদের যানবাহন, পোশাক-আশাক, টিফিন-লাঞ্চ, আমোদ-প্রমোদের ব্যয় কত খোঁজ রাখো?

আর একজন বললেন—আগে সন্তান মানুষ করার ব্যয়টাকে পিতা মনে করত ভবিষ্যতে সংসারের সুবিধার বা হিল্লের জন্য টাকা লাগনি করা বা দাদন দেওয়া, একদিন এর পরিশোধ হবে। একে ছেলেরাও পিতৃঋণ ব'লে মনে করত,—এজন্য কৃতজ্ঞ হয়েও থাকত। সেদিন তো আর নেই।

একজন পেনসনপ্রাপ্ত অপুত্রক বৃদ্ধ বললেন—কেন কৃতজ্ঞতা পোষণ করবে? পিতাই এই প্রতিকূল যুগে ও দুঃখের জগতে তাদের সৃষ্টির জন্য দায়ী, তাদের পালন করতে, মানুষ করতে তো পিতা বাধ্য। এর জন্য আবার কৃতজ্ঞতা কি? একে ঋণ ব'লে মনে করবার কোন কারণ নেই।

বৃদ্ধ পিতা-মাতার কোন সম্বল না থাকলে তাদের না হয় তারা

পালন করল,—কিন্তু তাদের জামাতৃতোষণ, কুপোষ্যপোষণ, খেয়ালখুশী, খয়রাতি, নানা কুসংস্কারের নামে বাজে খরচ বা তীর্থের নামে দেশ ভ্রমণের খরচা দিতে ছেলেরা বাধ্য নয়। এমন কি পিতা-মাতার অন্য সন্তানদের পালন করতেও তারা বাধ্য নয়। আত্মীয়কুটুম্বদের নিয়ে তাঁরা বাড়াবাড়ি করবেন—তার ব্যয়ভার বহন করতে তারা বাধ্য নয়। আপনারা সেকেলে মনোভাব ত্যাগ করুন। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সামনে পা ফেলে চলতে শিখুন।

এক কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ বললেন—অনেক বৃদ্ধের সঞ্চিত অর্থ কিছু-না-কিছু হয়ত থাকে, কিন্তু কন্যাদের বিয়ে দিতে দিতে তারা নিঃসম্বল হয়ে যায়। বিবাহের ব্যয় দিন দিন এত বেড়ে গেছে যে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে পৈতৃক সম্পত্তি থাকলে বিক্রী করতে হয়, বাড়ী থাকলে তা বন্ধক দিয়ে ধার করতে হয়। পুত্রেরাও বিয়ে করতে চায় না—তারা ভগিনীদেরও বিয়ে দিতে চায় না—ভগিনীদের চাকরির চেষ্টা করতে বলে, আত্মনির্ভর হতে বলে।

অগ্রগতিশীল নিঃসন্তান বৃদ্ধটি বললেন—ঠিকই বলে। কত পুরুষই তো বিয়ে করছে না—কতকগুলো মেয়েকেও অবিবাহিতা থাকতে হবেই। তাছাড়া, পণ দিয়ে বিয়ে দেওয়া ছাড়া এযুগে আর কোন উপায় কি নেই? নিজেদের স্বামী নিজেরাই নির্বাচন করে নিক না তারা।

কিন্তু বৃদ্ধেরা একথা শুনে নিশ্চিন্ত বা আশ্বস্ত হতে পারে না। কন্যাদের পাত্রস্থ করতে না পারলে তারা শান্তিতে মরতেও পারে না। আমি বললাম—না হে তা নয়। তারা জল বাস্তুহারা মাছ। তাদের যে জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। প্রাক্তন যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মরা উচিত ছিল।

মেয়ের হয় না বিয়ে বরের অভাবে,
ছেলের হয় না বিয়ে ঘরের অভাবে।

বৃদ্ধ পিতা মারা গেলে একটা ঘর খালি পাওয়া যায়,—তখন

ছেলের বিয়ে করা সম্ভব হয়। বৃদ্ধেরা ছেলের বিয়েতে যে অনেক সময় এত বেশি পণ যৌতুক চায়, তা পণের টাকায় একটা ঘর বাড়াতে পারবে ব'লে। পণের টাকাটা ভূতভোজনে ব্যয় না ক'রে, ভবিষ্যতের সম্বল করে রেখে দিক না তারা। যাই হোক, রহস্য থাক, আগেকার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক।

নানা কারণে এযুগের বৃদ্ধেরা অনুদার, কৃপণ, হিসেবী ও অতিরিক্ত সংসারাসক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। কতকটা আত্মনির্ভর হতে হচ্ছে তাদের।

আজকাল বৃদ্ধদের পরলোকের চিন্তার চেয়ে ইহলোকের চিন্তাই প্রবল হয়েছে। ইহলোকের মেয়াদও তাদের আগেকার চেয়ে বেড়েছে—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তারা এখন খুবই অবহিত। ঔষধ পথ্য সম্বন্ধে খুবই সতর্ক। দেহ মেরামতির কেরামতিও দিন দিন বাড়ছে। রক্তের চাপ, বহুমূত্র ইত্যাদিকে দমিয়ে রাখার নানা ব্যবস্থা হয়েছে। ক্যান্সার ও থ্রম্বসিস এছুটি ছাড়া মরার রোগও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আয়ু বৃদ্ধির জন্য আয়ুর্বেদীয় ব্যয় আছে— তার জন্য টাকা চাই, সে টাকা আসে কোথা থেকে? দুবেলা দুমুঠো অন্ন হলেই তো আর চলে না। আফিম না খেলেও একসের করে দুধও চাই। বৃদ্ধদের ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক ব্যয় আছে।

সুখের বিষয়, এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। যুগসন্ধিক্ষণে এইরূপ বিপর্যয় ঘটে। এখনকার বৃদ্ধেরা সতর্ক হবার প্রয়োজনবোধ করে নি, গতানুগতিক ভাবেই চলেছে। ভবিষ্যতের বৃদ্ধেরা অর্থাৎ এখনকার যুবকেরা বাপ-জ্যাঠার মতো বেকুব নয়, অদূরদর্শী নয়। তারা বেশ সেয়ানা। বার্ধক্যে যাতে কষ্ট না হয়, অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে না হয়, বরাবর চাল যাতে বজায় রাখতে পারে, সে বিষয়ে তারা সচেতন। তারা অবশ্য-প্রতিপাল্যের সংখ্যা নানা উপায়ে কমিয়ে আটঘাট বেঁধে তৈরি হচ্ছে। অনেকে আদৌ

বিয়ে করছে না, অনেকে বেশি বয়সে বিয়ে করছে, কিন্তু সন্তান যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক, আবার সন্তান জননের বয়স্কালের পরিসরটা সঙ্কীর্ণ হওয়ায় দুই-একটার বেশি সন্তানের পিতৃত্ব লাভ ঘটছে না।

একজন যুবক সেদিন একখানা নিমন্ত্রণ চিঠি পড়ে বলছিল—"একি ? আমার পঞ্চম পুত্রের সহিত অমুকের ষষ্ঠী কন্যার শুভ-বিবাহ !" কি অশ্লীল পত্র ! দুটোর একটাও 'কনিষ্ঠ' নয়। এরূপ ষষ্ঠীর কৃপা রীতিমত Criminal ! এরূপ নিমন্ত্রণে যেতে হবে, খেতে হবে, আবার শাড়ী কিনে দিতে হবে ? পুলিশে দেওয়া উচিত এদের। টীকা অনাবশ্যক।

এখনকার বৃদ্ধেরা ঠেকে শিখছে কিন্তু এ শিক্ষায় লাভ নেই, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে—ভবিষ্যতের বৃদ্ধেরা তাদের দেখে শিখে লাভবানই হচ্ছে। তারা গতানুগতিক নয়, তারা সুদূরদর্শী, তাদের জীবনযাত্রা সুপরিকল্পিত।

নিঃসঙ্গতার প্রতিকার

একদিন একজন তরুণী মহিলা এক সংখ্যা সঞ্জীবনী নামে পত্রিকা হাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মহিলাটি প্রণাম করে বসতেই বললাম—কাগজ বার করেছেন, কাগজের জন্য আমার একটা লেখা চাই, এইত? মহিলাটি বলল—"হাঁ স্যার, ঠিক ধরছেন। আমি আপনার কন্যার মতো, আমাকে আপনি বলবেন না। আমার নাম রেবা, আমি আর আমার—"

আমি—ওঃ, তুমি আর তোমার বান্ধবীরা মিলে কাগজ বার করেছ—এইত? তোমরা বহু পত্রিকায় তোমাদের লেখা পাঠিয়ে হৃদ্দ হ'য়ে গেলে, কেউ ছাপল না। তাই রাগ করে নিজেরাই কাগজ বার করলে, কেমন তাইত?

রেবা—হাঁ, স্যার, ঠিক ধরেছেন,—অন্য কারণও আছে।

আমি—তা তো বুঝলাম মা লক্ষ্মী, তোমাদের কাগজেই তোমাদের লেখাগুলো ছাপা হতে পারবে, কিন্তু সে লেখা তো কারো হাতে পৌঁছুবে না, এ কাগজ নগদ বিক্রীও হবে না, এর গ্রাহকও হবে না। শুধু ছাপার অক্ষরে নিজের কাঁচা হাতের লেখাগুলো দেখেই তৃপ্তিলাভ করতে হবে। ছু'দিনেই এ সখ মিটে যাবে। যাই হোক এর জন্য ব্যয় তো আছে, কোথা থেকে ব্যয়নির্বাহ হচ্ছে?

রেবা—আমার এক বান্ধবী ধনিকন্যা। তার বাবার একটা প্রেস আছে, বিনা খরচায় ছাপা হচ্ছে, কাগজের দামটা আমি দিই। আমার স্বামী একটা বিদেশী ফার্মে কাজ করেন, সেই ফার্মের পূরা একপাতা বিজ্ঞাপন তিনি যোগাড় করে দেবেন, তাতেই খরচ উঠে যাবে। আমার বান্ধবীর বাড়ীর নিচেকার ঘরে আমরা আপিস করেছি।

আমি—তোমাদের ছু'জনের কোন ছেলেপুলে হয়নি নিশ্চয়।

রেবা (সলজ্জে)—না, স্যার, ঠিক ধরেছেন।

আমি—ছাপবার খরচ লাগছে না প্রেসে, তা স্থখের কথা।

কিন্তু জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বেরুবে তো ভাদ্রে। নিজেদের প্রেস-ও অফ-টাইম ছাড়া এ কাজ করবে না—যতই তাগিদ দাও। এই ধরো না, এই সংখ্যার লেখাগুলো তোমরা প্রেসে দিয়েছিলে অঘ্রানে ছাপা হলো চৈত্রে। তোমরা মাঘমাসেই সরস্বতী পূজার দিন প্রথম সংখ্যা বা'র করতে চেয়েছিলে তো। ঠিক কিনা ?

রেবা—হাঁ, আপনি জানলেন কি করে ? তাই চেয়েছিলাম বটে, তবে কপি অঘ্রানে প্রেসে দিইনি, পৌষের গোড়ায় দিয়েছিলাম। পৌষ থেকে প্রেসে পাঠ্যপুস্তক ছাপার হিড়িক পড়ে গেল কিনা, তাই দেরী হ'লো।

আমি—কাজেই দেখ বিনা পয়সার কাজ প্রেসে ধর্না দিয়ে বসে থাকলেও করাতে পারবে না। তুলালীর আবদারে পিতা একটা সংখ্যা ছেপে দিয়েছেন, ব্যবসা নষ্ট করে মাসে মাসে তা সম্ভব হবে না, মা লক্ষ্মী। বাৎসল্যেরও সীমা আছে।

রেবা—এবার তিনি বলেছেন, লেখা যোগাড় করে দে,—দ্বিতীয় সংখ্যা ছেপে দিচ্ছি।

আমি—উঁহুঁ—ভাদ্রের আগে বেরুবে না। কলেজ সীজন আস্‌ছে, অনেক মোটামোটা বইএর পাণ্ডুলিপি আষাঢ়ের আগেই এসে পড়বে প্রেসে। কাগজের খরচ বেশি নয়, হয়ত তুমি দিতে পারবে, মোটে ২০০ কপি তো। ২৫ খানা করে ছাপলে সে খরচ যৎসামান্য হতে পারবে।

রেবা—তুশো নয় স্যার, আড়াইশো ছাপছি। কাগজ তিন মাসের মত কিনে ফেলেছি, স্যার।

আমি—বিজ্ঞাপনের কথা বলছিলে, বিজ্ঞাপন তু'একটা সুপারিশে পাবে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের দাম পাবে না, বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় তোমরা করতে পারবে না। এজন্য যত বার যেতে হয়, তত বার যেতে তো পারবে না।

রেবা—আমার বান্ধবীর বাবা দ্বিতীয় সংখ্যার লেখার জন্য ভীষণ

তাগিদ দিচ্ছেন। কিন্তু লেখা কোথায় পাব? কেবল নিজেদের লেখা দিয়ে তো কাগজ চালানো যায় না।

লেখার জন্য গিয়েছিলাম রাধারাণী দেবী, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, মায়া বসুর কাছে—এঁদের লেখা পাব।

আমি—বাণী একটা চার লাইনের বাণী তোমাদের দিতে পারেন, আশাপূর্ণা আশা দিতে পারেন। রাধারাণী বাধা দেবেন না তোমাদের কাজে, তবে তিনি আজকাল লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। আর মায়া? মায়া তো ইলিউশন—তার উপর কি নির্ভর করা যায়? দেখ চেষ্টা ক'রে। লেখিকাদের সহানুভূতি পেতে পার। এ-তো সাহিত্য-সেবিনী দেবীদের কথা,—সেবীদের কাছে গিয়েছিলে?

রেবা—বিনা টাকায় কোন সাহিত্যিক লেখা দিতে চান না।

আমি—The age of chivalry is gone, Madam.

এখন ম্যামনের যুগ। লেখার জন্যও সবাই টাকা চায়—এরপর তারা শুধু দেখা দেওয়ার জন্যও টাকা চাইবে। সিনেমা আর্টিষ্টরা তা অনায়াসে পারেন, সিনেমার লেখকরাও দাবি করবেন?

রেবা—আমি বললাম, কাগজ আত্মনির্ভর হলেই দক্ষিণা দেব। ধার থাকল, লিখে দিচ্ছি।

আমি—এত বড় প্রতিশ্রুতির উপরও তাঁরা নির্ভর করতে পারলেন না। ভদ্রমহিলার মুখের কথাই কি যথেষ্ট নয়? তারা কি বললে? সুদের কথা তুললে নাকি?

রেবা—না, তাঁরা বললেন,—পত্রিকা আত্মনির্ভর হলেই লেখা দেব। জানি না কত দিনে আত্মনির্ভর হ'তে পারব।

আমি—বেশি দিন নয়—হাজার দুই গ্রাহক আর ষোলপাতা বিজ্ঞাপন পেলেই আত্মনির্ভর হতে পারবে। তিন হাজার গ্রাহক ও ২৪ পাতা বিজ্ঞাপন পেলেই লেখকদের দক্ষিণা কিছু কিছু দিতে পারবে। বেশিদিন নয়, বছর ৪০ চালাতে পারলে সেটা সম্ভব হবে।

সূতিকাগৃহে শিশুদের সেপ্‌টিক হতো,, তাতে বহু শিশু মারা যেত। এখন সরকারী চেষ্টায় প্রতিষেধিকা-সতর্কতার ফলে শিশুমৃত্যুর হার ঢের কমে গেছে। কিন্তু সূতিকাগারের শিশু-পত্রিকাগুলিকে বাঁচানোর জন্য সরকার কোন চেষ্টারই দরকার বোধ করছেন না। কাজেই পত্রিকাগুলি হচ্ছে ছত্রিকাগুলির মতো ক্ষণজীবী, এই ছত্রিকাগুলিকে কর্তৃপক্ষ ছত্র দিয়ে রক্ষা করেছেন না, লেখকরাও দু'ছত্র লেখা দিয়ে দুদিনও বাঁচান না।

রেবা—তাহলে তো ভীষণ চিন্তার বিষয়।

যাই হোক, আপনি তো একটা প্রবন্ধ দিন, রম্য রচনা হওয়া চাই। আচ্ছা, ছত্রিকার মানে কি ?

আমি—বলছি। রম্যরচনা-টচনা হবে না। রম্যরচনা হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। তবে একটা কবিতা দিতে পারি, তাও কিন্তু তৃতীয় সংখ্যায়। দ্বিতীয় সংখ্যার পর একটা ফাঁড়া আছে,, ঐ ফাঁড়াটা কেটে গেলে এসো, অবশ্যই একটা কবিতা দেব। আমার তো দক্ষিণার দাবি নেই, আমার দাক্ষিণ্যেরও অভাব নেই। কিন্তু মালক্ষ্মী, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। হাঁ, ছত্রিকার মানে—ব্যাঙের ছাতা।

রেবা—শুনেছিলাম আপনার কাছে যে লেখা চায় সেই পায়, আপনিও বিমুখ করবেন ?

আমি—আমার ঠিকানা দিয়ে কে তোমাকে পাঠালো ? কে এ শত্রুতা করল ?

রেবা—ব্রজেন মিত্তির আর প্রমথ ঘোষ। তাঁরা কিন্তু টাকা চাননি। বললেন, হাতে লেখা নেই। ভবিষ্যতে দেবার চেষ্টা করব।

আমি—আর কার কাছে লেখা চেয়েছিলে ?

রেবা—আরও তিনজন মিত্রের কাছে গিয়েছিলাম—তাঁরা বল্‌লেন—পূজার খুব দেরি নেই—পূজার লেখা লিখতে হচ্ছে এখন, পূজার পর এসো দেখা যাবে।

আমি—মিত্রতার প্রতিশ্রুতি এর বেশী কি আর হবে? আচ্ছা, আমার কাছে যে এলে আমার একখানা বইএর নাম করো দেখি।

রেবা—(মাথা চুলকিয়ে) বই-এর নাম তো মনে নেই। তবে আপনার একটা কবিতা মুখস্থ আছে।

আমি—ছাত্রধারা তো?

রেবা—হাঁ স্যার, ম্যাট্রিকে পাঠ্য ছিল।

আমি—দেখ আমি আগে শিক্ষক, পরে লেখক। শিক্ষকতাই মুখ্য—লেখকতা গৌণ। কাজেই লেখকের কাজ করবার আগে শিক্ষকতার কাজ করে থাকি।

রেবা—দেখুন, শুধু নিজেদের লেখা ছাপার জন্য আমাদের পত্রিকা নয়—বি-এ পাশ করে এম-এ পড়ব ভেবেলিলাম, তা পড়া হলো না। স্বামী চাকরি করেন, তাঁর ক্লাব, খেলা, খেলা দেখা, সিনেমা দেখা ইত্যাদি অনেক হবি আছে—আমি বাড়ীতে একাকিনী, সময় কাটে না। আমার বান্ধবীরও তাই। বান্ধবীরও আত্মীয়স্বজন কেউ তার বাড়ীতে থাকে না, আর আমি তো একান্নবর্তী পরিবার থে'কে শ্বশুর-শাশুড়ীর আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু নিঃসঙ্গ নিষ্কর্মা জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। একবার ভেবেছিলাম, শ্বশুরশাশুড়ীর কাছেই ফিরে যাই, কিন্তু ফিরতে লজ্জা করল। স্বামী বললেন, আমি রোগে পড়লে যখন চারদিক অন্ধকার দেখবে, তখন আমাকে নিয়ে ফিরে যেও। মা-বাপ প্রসন্ন না হলে রোগ সারবে না। ফিরে যাওয়া হ'লনা। তাই একটা অকুপেশনের জন্য কাগজ বার করেছি।

আমি—তুমি কি লেখ? তোমার বান্ধবীই বা কি লেখে?

রেবা—আমি গল্প লিখি—বান্ধবী লেখে কবিতা। আমার গল্প ও তার কবিতা একটু দয়া করে দেখে দিতে হবে আপনাকে।

আমি—কবিতাগুলো আমি দেখে দিতাম, তবে আজকাল তো

কবিতার ধারা বদলে গেছে, কোন আধুনিক কবিকে দেখালেই ভালো হয়। ওরা বলে আমাদের দিন ফুরিয়ে গেছে, আমাদের লেখায় ছন্দ আছে, কিন্তু গন্ধ নেই। আর গল্পগুলো একজন গল্প-লেখককে দেখাও। প্রবন্ধ লেখ তো আমাকে দেখিয়ো।

রেবা—আপনি একখানা চিঠি দিয়ে দিন না মাতঙ্গ বাবুকে কিংবা কন্দর্পবাবুকে, গল্পগুলোকে দেখে দেবার জন্য ?

আমি—সর্বনাশ ! দাদা বলে ডেকে ওরা মৌখিক শ্রদ্ধা যেটুকু জানায়, তাহলে তাও জানাবে না। তুমি এম-এ পড় না কেন ?

রেবা—আমি পড়তে চেয়েছিলাম, স্বামী বল্‌লেন, 'চাকরি করতে তো যাচ্ছ না, যে জন্য পড়া তা অর্থাৎ বিয়ে তো হয়ে গেছে। যা ক'রে বি-এ পাশ করেছ টায়ে টোয়ে, তাতে আর এম-এ পড়ার কেলেঙ্কারিতে কাজ নেই। তোমার মার্কশীটতো আমি দেখেছি। খুব বিশ্রে হয়েছে। লিখছ,—লেখা নিয়ে থাক।'

আমি—লেখা ছেড়ো না। তবে পত্রিকা প্রকাশ বছরে দু'খানা কর—নববর্ষসংখ্যা আর পূজাসংখ্যা। তাতেই তোমাদের লেখাগুলো ছাপা হতে পারবে এবং এই দুই সংখ্যা বার করতেই তোমাদের সারা বছরে সময় কাটানোর অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, নিজের সংসারের রান্নাবাড়ার কাজও তো করতে পারো। রান্নাও তো একটা আর্ট, কবিতা লেখার চেয়ে বড় আর্ট। কবিতায় রস জমানোর চেয়ে খাদ্যে রসসৃষ্টি ঢের সোজা।

রেবা—সত্যি বলতে কি রান্নার ভয়ে একান্নবর্তী পরিবার থেকে পালিয়ে এসেছি, স্যার। রাঁধবার জন্য কি স্যার বি-এ পাশ করেছি ?

আমি—সত্যই তো রান্না-তো ঝি-চাকরের কাজ। তোমাদের কাজ তো ভোজন ও প্রসাধন। গরীব মেয়েরা বাধ্য হয়ে রাঁধে, তাদের অনুকরণ করা তো সম্মানজনক নয়। প্রত্যহ সিনেমা দেখলে

তো পারো, তা ছাড়া, নভেল পড়ো, নভেল তো তোমাদেরই জন্য। অন্য কোন বিষয় তো ভাল লাগবে না।

রেবা—সিনেমা দেখা কি প্রত্যহ সম্ভব? নভেল অবশ্য পড়ি। নভেলগুলো পড়ে মনে হয় এসব ঘরাও কথাতো আমরাও লিখতে পারি। তাই থেকে তো গল্প নভেল লেখার হাতে খড়ি। তাই পড়ে পড়েইতো লিখতে শিখেছি। খান পঁচিশ নভেল পড়লেই একখানা নভেল অনায়াসে লেখা যায়।

রেবা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল,—আপনি যেসব কথা বললেন, সে-সব ভেবে দেখার দরকার। মাঝে মাঝে এলে বিরক্ত হবেন না, স্যার। লেখা না দেন উপদেশ দেবেন। অভিজ্ঞ লোকের উপদেশ শোনা দরকার। আপনার কথাগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগ্‌ল।

আমি—না—না—দুঃখিত হয়োনা—রেবা। একটু বসো। আমি আপাততঃ একটা আশীর্বচন দিচ্ছি। এই নাও।

জীবন অঙ্কুরে ভরা তুমি সঞ্জীবনী,
তোমার মাঝারে শুনি শিশু পদধ্বনি।

রেবা—আমাদের পত্রিকা শিশুদের জন্য নয়।

আমি—শিশুদের না হোক শিশুর মায়েদের জন্য তো বটে।

* * *

দেড় বছর পরে রেবা এলো।

আমি—কি রেবা, তোমার পত্রিকার কি হ'লো?

রেবা—আর একটা সংখ্যা বেরিয়েছিল—তা আপনার কাছে পাঠাইনি। যা বলেছিলেন তাই হ'লো।

আমি—আজ কি মনে ক'রে?

রেবা—আপনার আশীর্বাদে আমার একটি খোকা হয়েছে—আগামী রবিবারে তার অন্নপ্রাশন। আপনি একটা ৪ লাইন আশীর্বাদ লিখে দিন। সেটা ছাপ্‌ব—আর আপনি নিজে গিয়ে

আশীর্বাদ করবেন। আমি গাড়ী পাঠাব, আমার নিজের গাড়ী হয়েছে। বেলা ১১টা থেকে ৩টা-৪টা পর্যন্ত গাড়ী আমার অধিকারে থাকে, খোকাকে নিয়ে আত্মীয়স্বজন ও বান্ধবীদের বাড়ীতে ঘুরে বেড়াই। খোকাকে নিয়ে সময় আমার বেশ কেটে যাচ্ছে। ভাল কথা, খোকার একটা নাম ঠিক করে দেবেন।

আমি—বা—বা বেশ, খুব খুশী হলাম। আমি তো শিশুর পদধ্বনি আগেই শুনেছিলাম।

রেবা—ওমা, তাই নাকি? সেই দু' লাইন কবিতায় সেই কথা ছিল নাকি? সে দু' লাইন যে দ্বিতীয় সংখ্যায় ছেপেছিলাম। কি লজ্জার কথা! (পা ছুঁয়ে) আপনি একজন মহাপুরুষ!

আমি—তোমার বান্ধবীর খবর কি? তার ছেলে হ'ল না মেয়ে হলো?

রেবা—তার একটি খুকী হয়েছে। সেও নামকরণের জন্য আসবে,—১৫ দিন পরে তারও খুকীর মুখে ভাত।

আমি—তাহলে আর তোমরা নিঃসঙ্গ নও।

রেবা—সারাদিনই খোকাকে নিয়ে কেটে যাচ্ছে আর লিখবারও সময় পাই না, নভেল পড়ার-ও অবসর পাই না। বান্ধবীর-ও তাই। বহুকষ্টে বহু চেষ্টায় পূজার সময় সঞ্জীবনীর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রেস থেকে বার করেছিলাম—নাম দিয়েছিলাম পূজাসংখ্যা। ঐখানেই পত্রিকা পর্বের ইতি। গাড়ী পাঠাব, যেতে হবে কিন্তু—আমার ভীষণ ইচ্ছা আপনি নিজে গিয়ে আশীর্বাদ করেন।

আমি—নিশ্চয় যাব, মা—নাতিকে আশীর্বাদ করে আসব। কবিতা চার লাইন এখনি লিখে দিচ্ছি—নিয়ে যাও—

সময় সাগরে পড়ে মা তোমার খেত ডুবুহাবু,
তাহারে বাঁচালে তুমি ওগো খোকাবাবু।
তুমি হলে ভেলা,
এখন তোমাকে নিয়ে সারাদিন মা করুক খেলা।

রেবা—(হেসে) বাঃ বেশ লিখেছেন। সত্য কথাই লিখেছেন। ডুবুহাবু, হাবুডুবু নয় কেন? উল্টে গেল কেন?

আমি—তোমার জীবনটাই যে উল্‌টে গেল, মা। ভালো কথা, তোমার ছেলের নাম রাখো চিত্তবিনোদন। পছন্দ না হ'লে ৮।১০টা নাম নিয়ে যাব, তার মধ্যে বেছে নেওয়া যাবে। আর তোমার বান্ধবীর কন্যার নাম তো তোমরাই আগেই ঠিক করেছ, তার নাম থাকবে সঞ্জীবনী। তোমাদের সঞ্জীবনী তার কন্যার মধ্যে দীর্ঘায়ুষ্মতী হয়ে থেকে যাক।

বিড়াল ও কোকিল

একদিন একজন বাংলার তরুণ অধ্যাপক এসে উত্তেজিত ভাবে অভিযোগ করলেন,—কর্তারা আমাদের কী মুশকিলে ফেলেছেন বলুন দেখি।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম,—কী ব্যাপার বল ত। কী মুশকিল হ'ল ?

অধ্যাপক—সংকলনে বঙ্কিমবাবুর 'বিড়াল' প্রবন্ধটা নির্বাচন ক'রে—

আমি—কেন ? ও-প্রবন্ধটা তো বেশ চমৎকার। পড়ানোও কঠিন নয়। বর্তমান যুগধর্মের কথা কত আগে বঙ্কিম অ্যান্টিসিপেট করে গিয়েছিলেন, এ-সব ত তোমরা খুব ভালই জান। তোমাদের মতে তো এটা বঙ্কিমবাবুর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। এ নিয়ে সমাজ-তন্ত্রবাদের কথা বেশ ফলাও করে বলতে পার।

অধ্যাপক—সে-জন্য বলছি না। বিড়াল পড়াতে আরম্ভ করলেই ক্লাসের ছেলেরা সব 'মেও মেও' করে ডাকতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি 'মেও' কথাটা না লিখতেন, তা হলেও বরং হ'ত। আমরা তরুণ অধ্যাপক, আমাদের ক্লাস কণ্ট্রোল করা কত কঠিন হয়ে পড়ে, তা আপনারা বুঝবেন না।

বুঝলাম অধ্যাপক কী মুশকিলের কথা বলতে এসেছেন। আমি বললাম, ভায়া, নির্বাচনের সময় এটা ত কর্তারা ভাবতে পারেন নি।

তখনই আমার মনে হল, স্কুল ফাইন্যালের পাঠ-সংকলনে ঐ কমলাকান্তের দপ্তর হতে "বসন্তের কোকিল" লেখাটা পড়াতে গিয়ে শিক্ষকদের একই বিপদ হয়।

একজন শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন—স্যার, বঙ্কিমের এত ভালো লেখা থাকতে পাঠসংকলনে 'বসন্তের কোকিল' কেন? পড়াতে সুরু করলেই ছেলেরা একযোগে কু-উ কু-উ ডাক ছাড়ে।

আমি বলেছিলাম—তোমার বাহাদুরি আছে,—ক্লাসরুমে বসন্ত সঞ্চার করতে পার। বসন্তের কোকিল রচনাটি যে ছেলেদের মনে বসন্তের আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে এটা ভাবা উচিত ছিল। ছেলেদের এ-রূপ ক্ষেত্রে যে আত্মসংযম করা কঠিন, তার সাক্ষী আমি নিজেই। আমি যখন বালক তখন একদিন আমাদের ক্লাসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "কুকু" পড়ানো হচ্ছিল। আমি নিজে কুহু কুহু ডেকে উঠেছিলাম। আমি শিষ্টশান্ত ছেলেই ছিলাম এবং ক্লাসের ফার্স্ট বয়ও ছিলাম। অথচ কী একটা ভাবে আবিষ্ট হয়ে ঐ দুষ্কর্ম করে ফেলেছিলাম, পরে তা বহু চিন্তা করেও স্থির করতে পারিনি। এজন্য শিক্ষকের কাছে আমি কানমলা খেয়েছিলাম এবং বেঞ্চির উপরও আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল। ছাত্রজীবনে প্রথম ও শেষ দণ্ড বসন্তের কোকিলের জন্য ভোগ করেছিলাম—কুহু কুহু ডেকে আমাকে কানমলায় 'উহু উহু' করতে হয়েছিল। শিক্ষক তখন কি জানতেন সারা জীবন কুহু কুহু ডাকবার জন্যই unsubstantial fairy place থেকে আমি এই জড়জগতে এসেছি! কাজেই আমার অধিকার নেই—সেই কুহু-ডাকা ছেলেদের দোষ দেবার। দোষ আমাদেরই, আমরা যে লেখায় "মেও" বা "কুউ" ডাক আছে, সে লেখা পাঠ্যপুস্তকে দিই কেন?

শিক্ষক—আপনারা সংকলন করবার সময় সত্যই অনেক কিছু ভেবে দেখেন না, বালকদের মনস্তত্ত্বের কথা ভাবেন না। আপনারা সাহিত্যের রসোৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখা বাছেন। সে-জন্য অনেক সময় কৌতুকরসের লেখাও সংকলনে দিয়ে থাকেন।

আমি—তাতে কি দোষ হ'ল?

শিক্ষক—কৌতুকরসের লেখা ছেলেরা বাড়িতে রাশি রাশি পড়ুক, তাতে তারা আনন্দই পাবে। কিন্তু কৌতুক-রচনা পাঠ্যপুস্তকে না দেওয়াই ভাল। ৪০।৫০ জন ছেলের সমবেতভাবে কৌতুকরস সম্ভোগের রূপটা কি তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে জানে না।

'বাংলা' বিষয়টার প্রতি ছেলেদের বিশেষ শ্রদ্ধা নেই, কাজেই বাংলা যাঁরা পড়ান, তাঁদের বহু কষ্টেই ক্লাসের কাজ চালাতে হয়। বাংলা ক্লাসটাকে সাধারণ ছেলেরা অনেকটা বিশ্রামের এবং গল্প-গুজবের ক্লাসই মনে করে। তারপর যদি হাসির গল্প, কবিতা ইত্যাদি শিক্ষকদের পড়াতে হয়, তা হলে ক্লাস অট্টহাস্যে ও হট্টগোলের কুমারহট্টে পরিণত হয়।

ছেলেরা শিষ্টতার মর্যাদা ভুলে শিক্ষককে 'মাই ডিয়ার' মনে করতে থাকে। শিক্ষকের পক্ষেও গম্ভীরভাবে হাসির লেখা পড়ানো চলে না, তাঁকেও হাসতে হয়।

আমি—হাঁ, তা ঠিক বলেছ। ব্রাহ্ম অধ্যাপক ডঃ হীরালাল হালদারের মত নিজে না হেসে হাসির লেখা পড়াবার ক্ষমতাই বা ক'জনের আছে?

শিক্ষক—প্রভাতবাবুর 'মাষ্টার মশায়'-এর মত অথবা শরৎচন্দ্রের 'নতুনদাদার' মত গল্প পাঠ্যপুস্তকে দেবার সময় আপনারা ভাবতেই পারেন নি তাতে পড়ানোর সময় ক্লাসের অবস্থা কী রূপ হবে।

অতিরিক্ত শোকাবহ রচনাও পাঠ্যপুস্তকে না দেওয়াই উচিত।

আমি—তা মিথ্যে বলনি। একসময় জসিমউদ্দিনের 'কবর' আমাকে পড়াতে হয়েছিল। আমার মনে আছে, তাতে ছেলেরা বড়ই অস্বস্তি বোধ করত।

সত্যেন্দ্রনাথের 'ছিন্ন মুকুল', যতীন্দ্রমোহনের 'কাজলা দিদি' ইত্যাদি কবিতা যদি দরদ দিয়ে পড়ানো যায়, তা হলে ছেলেদের চোখ ছলছল করার কথা। কিন্তু আমাদের অকরুণ পড়ুয়াদের মনে একটু কারুণ্যের স্থষ্টি করা কি উচিত নয়? আমার তো মনে হয় এসব রচনা ছেলেদের চরিত্রগঠনে অনেকটা সাহায্য করে।

শিক্ষক—প্রভাতবাবুর "মাষ্টার মশায়" ও রবীন্দ্রনাথের "গিন্নী" গল্প সম্বন্ধে কেউ কেউ আপত্তি করে বলেন, এই দুটি গল্পে মাষ্টারদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, অতএব ছেলেদের পাঠ্য না হওয়াই উচিত।

শ্রীকান্তের "নিশীথ অভিযান" নামক অংশ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। ওটা মাছচুরির বর্ণনা। অতএব ছেলেদের চুরির ও চোরের বাহাদুরির গল্প না পড়ানোই উচিত। "মহেশ" গল্পের গো-হত্যার করুণ চিত্রটি সম্বন্ধেও আমাদের আপত্তি আছে।

আমি—আপত্তি তুললে সব লেখার সম্বন্ধেই একটা না একটা আপত্তি তোলা যেতে পারে, আর অনেক ভালো লেখাই বাদ দিতে হয়। যেমন—

রূপকগল্প পাঠ্য করার আগে ভেবে দেখা উচিত—শিক্ষকরা তার অবাঞ্ছিত অর্থ কিছু করবেন কিনা। রবীন্দ্রনাথের "তোতা কাহিনী" যখন পাঠ্য করা হয়, তখন একজন বলেছিলেন— এটা আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির নিন্দার কথা। কোন্ শিক্ষক যে কী অর্থ করে শিক্ষাবিভাগকে অশ্রদ্ধেয় করে তুলবেন তার ঠিক কী। ইংরাজ সরকার এখন আর নেই, কিন্তু ইংরাজ সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি ত এখনও চলছে।

কিন্তু আমি বলি—যা সত্য তা ছেলেদের শোনা জানা উচিত। এটা রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। বক্তব্য-প্রকাশের এমন চমৎকার ভঙ্গীর সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় ঘটানোও তো চাই।

আমাদের অভিমত, সব রকম ভাবের লেখাই ছেলেদের পড়ানো উচিত। তা হলে বিবিধ ভাব ও রসের আস্বাদ পেয়ে তাদের চিত্ত ও চরিত্র গড়ে উঠবে।

নারীশক্তির সীমা

পুরাতন ছাত্রী অমলা তার নতুন বাড়ীতে একদিন যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল। একদিন সকালে অমলার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। দেখি সে তার ছেলে-মেয়ে ও স্বামী নরেশের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে। যেতেই নরেশ বলে উঠ্‌লো—"এই যে মাষ্টার মশায়, আপনি একটা সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যান। বেশ সময়ে আপনি এসে পড়েছেন।"

আমি—কি সমস্যা হ'ল আবার? চায়ের পেয়ালায় তুফান নাকি?

নরেশ—তার চেয়ে ঢের বেশি। ইনি এঁর বান্ধবীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে ক'দিন হতে কেবল পীড়াপীড়ি করছেন—আমাকে সাহিত্যিক হতেই হবে। এঁর বান্ধবী কি-একজন সাহিত্যিকের স্ত্রী। এখন বলুন ত—

নরেশের কথা শেষ না হ'তেই অমলা ব'লে উঠল—উনি কি বলেন জানেন? বলেন, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। আচ্ছা, আপনি জিজ্ঞাসা করুন, ওঁকে ব্যারিষ্টার কে করলে?

নরেশ—তবে শুনুন, আমার ভগ্নীপতি অসীমবাবু ব্যারিষ্টার তা বোধ হয় আপনি জানেন। বিয়ের পর ইনি আমাদের গৃহ অলংকৃত করার পর বার কয়েক অসীমের বাড়ী গিয়েছিলেন—তারপর হ'তে ঝোঁক ধরলেন আমাকেও ব্যারিষ্টার হয়ে আসতে হবে। উনি বললেন—'তোমার ভগ্নাপতি হ্যাট-নেকটাই পরে সাহেব সেজে আদালতে যায়—আর তুমি চোগা চাপকান সামলা এঁটে ওকালতি করতে যাবে—তা হবে না।' আমি তখন ওকালতিতে বেশ পশার জমিয়েছি—বাবার মক্কেলগুলো সবই পেয়েছি। কিছু সঞ্চয়ও করেছি। ওঁর জ্বালাতে আর তিষ্ঠুতে পারলাম না। ছুটলাম বিলাতে, ব্যারিষ্টার হয়ে এসে তবে রেহাই পেলাম।

অমলা—তাতে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে একবার জিজ্ঞাসা করুন না। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী কি শুভংকরী উনিই বলুন।

আমি—মা-লক্ষ্মী তো বাবাজী তোমাকে ভালো উপদেশই দিয়েছিলেন। উনি তো গাধাকে ঘোড়া বানিয়েছেন বল্‌তে হবে, আমরা যা করি।

নরেশ—ভালো কি মন্দ তাও আপনি বিচার করুন। ব্যারিষ্টারিতে আয় বেড়েছে সত্যি, কিন্তু ব্যয়ও বেড়েছে ঢের। ব্যারিষ্টারি চালে ত চলতে হচ্ছে। এত দিন ওকালতিতেও ঢের বেশি আয় বাড়ত, কিন্তু ব্যয় এত বাড়ত না। কিছু সঞ্চয় থাকত। এতে Not a single farthing জমার ঘরে।

অমলা—আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, সমাজে, আদালতে কত মান বেড়েছে, তার বুঝি কোন দাম নেই ?

আমি—তা বাপু তোমার মান-খাতির ঢের বেড়েছে। এই ধর' না, আমারই ত 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকছে। বাড়ীতে ঢুকতেও কেমন গা ছম ছম করছিল।

নরেশ—ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসে প্রথম প্রথম ট্রামে-বাসে আদালত যেতাম। উনি ঝোঁক ধরলেন, মোটর না চড়ে আদালত যেতে পাবে না।

অমলা—অন্যায়টা কি বলেছি, মাষ্টার ম-শাই ? বলুন ত আপনি বিজ্ঞ মানুষ !

আমি—মা-লক্ষ্মী ঠিকই ত বলেছিলেন। সত্যি ব্যারিষ্টার হয়ে ট্রামে-বাসে চড়া ত চলে না। তার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভালো। কেরানী, মাষ্টার, দোকানদারদের সঙ্গে ট্রামে যাওয়া চলে না।

অমলা—বলুন আদালতের পিওন চাপরাসীদের সঙ্গে—

নরেশ—তারপর শুনুন। ২।৪ দিন ট্যাক্সি ক'রে এলাম-গেলাম, তাতে বড় বেশি খরচ পড়তে লাগ্‌ল। তখন ভগ্নীপতির মোটরে যাতায়াত সুরু কর্‌লাম। এতেও আমার মান থাকছে না দেখে—উনি

বললেন—'মোটর কেনো।' সঞ্চিত অর্থ বিলাতেই শেষ করে এসেছি। উনি ওঁর গহনাগুলো দিয়ে বল্লেন—'এগুলো বেচে মান রাখ।' তা' আর আমি নিলাম না। কিস্তিবন্দী পেমেণ্টের ব্যবস্থা ক'রে মোটর কিনলাম।

অমলা—জিজ্ঞাসা করুন আমার গৃহিণীপনার গুণে সে ধার শোধ হয়েছে কিনা।

নরেশ—ধার অবশ্য শোধ হয়েছে। এক বছর আমি নিজেই ড্রাইভ করেছিলাম—এখন ড্রাইভার রেখেছি।

অমলা—ওতে ওঁর লাভ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন।

নরেশ—লাভ কিছু হয়েছে বৈ কি? ওঁদের বাপের বাড়ী, মাসী-পিসির বাড়ী, বান্ধবীদের বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার সুবিধে হয়েছে,—সিনেমায় যাওয়ারও সুবিধে হয়েছে, আর আমারও সোশাল কলগুলো রেসপণ্ড করার সুবিধে হয়েছে।

অমলা—তা ছাড়া, ওঁর মান কত বেড়েছে সেটা বেমালুম চেপে যাচ্ছেন। মোটর না হলে আজকাল কোন ভদ্রলোকের চলে, বলুন ত?

আমি—একথা মা লক্ষ্মী ঠিকই বলেছেন। একজন মোটর-মিস্ত্রী মোটর ড্রাইভারের মান নির্মোটরদের চেয়ে বেশি। তাছাড়া, মোটর না থাকলে মোটর-চাপা পড়ার আশঙ্কা থাকে। যান না থাকলে মানও থাকে না। যানইত আসল জান—মানের জন্য যানও চাই জানও চাই। তা ছাড়া, মহাযানীদের যুগে হীনযানীরা অপাংক্তেয়।

নরেশ—মান যদি বেড়ে থাকে তবে ওঁরই বেড়েছে।

অমলা—বাজে কথা বোলো না। আমাকে কেবা চেনে? ওঁকেই ত সকলে চেনে—তাদের মধ্যেই মান বাড়াটার কথা বল্‌ছি। উনি বোঝেনই না—মান জিনিসটা কত বড়, উনি বোঝেন অনেক টাকা থাকলেই হ'ল।

তারপর দেখুন, নিজের বাড়ী না হলে মান থাকে কি করে?

আমার বাবা, আমার দুই বোন—এদের নিজেদের বাড়ী, ওঁর ভগ্নীপতি, বড় ভাই আর মামাতো ভাইদের নিজের বাড়ী, আর উনি থাকতেন ভাড়া-বাড়ীতে। আমি ব'লে ব'লে এই বাড়ীটা করিয়েছি। নিজে দাঁড়িয়ে মজুর মিস্ত্রী খাটিয়েছি। অবশ্য টাকার অভাবে বাড়ীটা আমার মনের মত হয়নি। আমার বোনদের বাড়ীর মত সামনে একটা ফুলের বাগান—আর আশে-পাশে বড় Compound থাকলে ভালো হ'ত। যা হোক, আপাততঃ মাথা গুঁজবার ঠাঁইত হ'লো।

আমি—এটা বাবাজী খুব ভালো কাজ করেছ। কথায় বলে, পরভাতী হই তাও ভালো, পরঘরী যেন না হই। তা-ছাড়া নিজের বাড়ী না হ'লে মানই বা থাকে কি করে?

নরেশ—কনট্রাক্টরের কাছে মরগেজ আছে বাড়ীখানা। ভাড়া যা দিতাম তাকে তাই দিচ্ছি মাসে মাসে। এখনো ১৫ হাজার টাকা দেনা।

অমলা—ওসব বাজে কথা শোনেন কেন? কিছু দেনা আছে। মানী লোকদের অমন দেনা থাকেই। মানী লোক ছাড়া আর কাউকে কি কেউ দেনা দেয়? দেনার জন্যই প্রমাণ হয়ে গেল তুমি মানী লোক।

আমি—দেনা থাকে সম্ভ্রান্ত লোকেরই, সাধারণ ছাপোষা লোকেরা দিন আনে দিন খায়। তাদের দেনা দেবে কে, যে দেনা থাকবে? পাড়ার মুদিও তাদের দশ টাকার জিনিস ধারে দেয় না। যার মানপ্রতিষ্ঠা আছে, লোকে তাকেই দেনা দেয়। দেনার পরিমাণ হতেই বুঝতে হবে মান-প্রতিষ্ঠা কতটা।

নরেশ—তা-ত হলো, স্যার। এবার যে দারুণ সমস্যায় পড়ে গিয়েছি। এবার ত আমার শক্তিতে কুলোয় না। ওঁর সঙ্গে স্কুলে পড়ত অনিলা। তার বিয়ে হয়েছে যার সঙ্গে সে একজন সাহিত্যিক। ইদানীং উনি আবিষ্কার করেছেন—ঐ সাহিত্যিকটির মান খাতির আমার চেয়ে ঢের বেশি।

আমি—কি নাম সাহিত্যিকটির ?

অমলা—বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী

আমি—ও বিনয়বাবু, হাঁ, উনি মস্ত নামজাদা সাহিত্যিক। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস সবই লেখেন।

অমলা—ঐ শোনো। শোনো ওঁর মুখে।

আমি—বিনয়বাবুর মানের খবর কি ক'রে জানলে ?

অমলা—দেখুন, রেডিও খুললেই শুনি—এইবার বিনয়বাবু একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন। মাসিক খুললেই দেখি ওঁরই লেখা। দৈনিক কাগজ খুললেই দেখি উনি এখানে ওখানে সভাপতি। দৈনিকে কতবার যে ওঁর ছবি বেরুল, তার হিসাব রাখা যায় না। মাসিকের পাতায় পাতায় ওঁর বইএর বিজ্ঞাপন।

এক নিমন্ত্রণবাড়ীতে আমি আর অনিলা গিয়েছিলাম। কে আমাকে পোছে ? সবাই অনিলাকে ঘিরে ধরল। অথচ ওর গায়ে একখানাও গয়না নেই,—একখানা টাকা দশেক দামের সাদা হাওড়ার হাটের শাড়ী পরে গিয়েছিল। যার বাড়ী যাই, তার টেবিলে দেখি বিনয়বাবুর একখানা না একখানা বই। আমার ছোট ভাই বলছিল —পূজার ছুটীর আগে ওদের কলেজে বিনয়বাবুর 'কালোবাজারের' অভিনয় হবে।

সেদিন অনিলার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম—দেওয়ালের গায়ে দেখলাম কতকগুলো Group Photo. সেগুলোতে বিনয়বাবু ফুলের মালা গলায় দিয়ে বসে। কাল দেখলাম শ্যামবাজার থেকে আসবার পথের ছুপাশে প্লাকার্ড আঁটা—বিনয়বাবুর 'বেদের মেয়ে' ছবি দেখানো হবে সিনেমায়। শহরটা যেন বিনয়বাবুর নামাবলী গায়ে দিয়ে বিনয়বাবুর নাম জপ করছে। বুঝলাম মান কাকে বলে ? অথচ সে কোনো অফিসে আদালতে যায় না। দেশ-বিদেশে সভাপতিত্ব করতে যায়।

নরেশ—এই সব দেখে উনি ঝোঁকে ধরেছেন—আমাকেও

সাহিত্যিক হতে হবে। তাতে মান বাড়বে—১৫ হাজার টাকা দেনাও শোধ হয়ে যাবে।

অমলা—কেন, অন্যায়টা কি বলেছি? বিনয়বাবু বি-এ পাশও করেনি। আর তুমি এম-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার, বিলেত গিয়েছ, সারা ইউরোপটা ঘুরেছ। কত বই পড়েছ—কত লেখাপড়া শিখেছ—কত দেখেছ। সে পারে আর তুমি পারবে না? তুমি বড় গেঁতো, মানের জন্য একটু গা ঘামাও।

নরেশ—মেয়েদের মধ্যে ত দেখি সিনেমার অভিনেত্রীদের মান বেশি—পথে পথে তাদের ছবি, মুখে মুখে তাদের নাম। তুমি সিনেমার অভিনেত্রী হও না কেন? খুব মান বাড়বে।

অমলা—কি যে বলো তার ঠিক নেই। আমি কি দুঃখে—ছেলেপুলের মা সিনেমার অভিনেত্রী হতে যাব?

নরেশ—আমিইবা ছেলেপুলের বাবা, ব্যারিষ্টার, কি দুঃখে সাহিত্যিক হতে যাবো? আচ্ছা তা না হয় নাই হলে? গায়িকাদের মান ওদের নীচেই। রেডিও খুললেই তা বুঝতে পারো। এক সময় গানত গাইতে,—গায়িকা হও না কেন? খুব মান বাড়বে। আমি বরং একজন ওস্তাদ রেখে দিচ্ছি।

অমলা—কবে বিয়ের আগে গান শিখতুম—সে গান শেখা বিয়ের জন্যে। বিয়ে হয়ে গেল গানও শেষ হলো। বারো বছর আর সেতার হারমোনিয়াম ছুঁইও নেই। তা'ছাড়া, আমি কেন গায়িকা হতে যাব? আমার কিসের অভাব!

নরেশ—অভাব ত আছে। মানের অভাব। আমিও লেখাপড়া শিখেছিলাম—বিয়ের জন্যে। আর ইয়ের জন্যে—বিয়ে হয়ে গেল, আর ইয়ে অর্থাৎ রোজগার করছি—আমি কি দুঃখে সাহিত্যিক হতে যাব?

অমলা—মান খাতিরের জন্যে গো মান খাতিরের জন্যে। দেখ, আমার কথা শুনে তুমি নিজের সমাজে গণ্যমান্য হয়েছ। কিন্তু সে

সমাজটা নেহাৎ ছোট। আমার কথা যদি শোনো তবে গোটা দেশে তুমি বিনয় বাবুর চেয়েও গণ্যমান্য হতে পারবে। কি বলেন, স্যার? মিথ্যে বাজে গল্প বানানো কি এমন কঠিন? তা'ছাড়া, বিলেতের কথা লেখ না কেন?

আমি—মালক্ষ্মী নেহাৎ মন্দ বলেননি। একজন অল্প বিদ্যার অল্প আয়ের অ-পদস্থ লোক ৪০খানা বই লিখে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, তুমি ২।১খানা বই লিখেই তার চেয়ে ঢের বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবে। তখন বিনয়বাবুই আসবে তোমার কাছে বইএর মতামত নেবার জন্য; সাহিত্যিকরা তোমার হাইকোর্টে আসবে বইএর বিচারপ্রার্থী হয়ে, যেমন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে যায়। তোমাকেই তারা বই উৎসর্গ করবে। তুমি সভায় সভায় সভাপতি হবে—সাহিত্যসম্মেলনে বার বার সভাপতিত্ব করবে। সাহিত্য-সরস্বতীর 'সবে ধন নীলমণি' হয়ে উঠবে।

ঐ সব সাহিত্যিকরা সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে আর কত উঁচু হবে? তুমি ব্যারিষ্টারির মালভূমিতে দাঁড়িয়ে তাদের কৃপার চোখে দেখতে পারবে।

নরেশ—তাত আমি ভাল করে জানি, স্যার। কিন্তু বাংলা লেখাত আমার একবারেই আসে না। আর বিদ্যের কথা? আইনই সব বিদ্যেকে গ্রাস করেছে। তা'ছাড়া, আমি অঙ্কের এম-এ। সাহিত্য পড়িও না—কি দেশী, কি বিদেশী। আপনাদের বিনয়বাবুর নামও আমি শুনিনি।

আমি—আচ্ছা। অমলা, বিনয়বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলে, তার অবস্থা কেমন দেখলে?

অমলা—অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক খারাপ মনে হল। ৫।৬টা ছেলেমেয়ে। ভাড়া বাড়ীতে থাকেন। মা-বাপ, ভাই-বোন অনেক লোক বাড়ীতে। অনেকগুলো প্রতিপাল্য। একটা চাকর আছে, রাঁধবার লোক নেই। বাড়ীতে ফার্নিচার বিশেষ কিছু নেই।

আমি—অমলা, সবাইকে ভগবান সব দেন না। তোমাকে যা দিয়েছেন, তার তুলনা কোথা? তুমি এতেই তুষ্ট থেকে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। নরেশকে আর পীড়ন কোরো না। নরেশ যদি সত্যিই সাহিত্য চর্চা করতে যায়, তবে ওর সাহিত্যও হবে না, আইনও ভুলে যাবে। প্র্যাকটিস নষ্ট হয়ে যাবে। সাহত্য জন্মায় অন্তরের তাগিদে। বাইরের তাড়নায় বা পীড়াপীড়িতে সাহিত্য হয় না। পত্নীর তাগিদে শাড়ী, বাড়ী, গাড়ী—এ সব হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হয় না। বিলেতের কথা লিখে কেউ সাহিত্যিক বলে গণ্য হয় না, ডাঃ নিয়োগী শুধু বিলেত কেন, বহু দেশের কথা লিখেছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সাহিত্যিক বলেনি। প্রভাত মুখুয্যে সাহিত্য করেছিলেন, কিন্তু ব্যারিষ্টারির দফা খতম হয়েছিল।

চিরজীবনই বেচারাকে পীড়ন করছ—তাতে লাভ হয়েছে কতটা জানি না। তবে তার একটা সীমা আছে। নরেশ তোমার কথায় সব পারে, কিন্তু তার ক্ষমতার একতিয়ারের বাইরে কিছু করতে পারে না। সাহিত্যসৃষ্টি একটা স্বতন্ত্র শক্তির কাজ। এ শক্তি বিধিদত্ত, এ শক্তি নিয়ে যারা জন্মায়—তারা সমস্ত জীবন ধরে তাই নিয়ে অনুশীলন করে, অধ্যবসায় সহকারে সাধনা করে, তবে সে একদিন সাহিত্যিক হয়ে ওঠে। বিধাতা সকলকে সব শক্তি দেন না। স্যার আশুতোষ গান গাইতে পারতেন না, স্যার পি সি রায় কবিতা লিখতে পারতেন না, বি সি রায় ছবি আঁকতে পারতেন না, মহাত্মা গান্ধী উপন্যাস লিখতে পারতেন না।

নরেশ একখানা আইনের বই লিখতে পারে, খেটেখুটে একটা থীসিস লিখতেও পারত, কিন্তু তাতে সাহিত্যিক মান পাবে না।

নরেশের মুখখানা প্রসন্ন ও অমলার মুখখানা বিষণ্ণ দেখে আমি বিদায় নিলাম।

কবি যশঃপ্রার্থী

একদিন সভ্য বি-এ পাশ-করা একটি যুবক একখানি কবিতার খাতা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল কবিতা শোনাতে। আট-নয়টা কবিতা সে সুর করে পড়ল। কবিতাগুলো কাঁচা হাতের লেখা হলেও নেহাৎ মন্দ নয়। আমি তাকে বললাম—মাসিকে সাপ্তাহিকে এগুলো ছাপতে পাঠাও না কেন?

কবি—সে স্যার আর বলবেন না। মাসিকে কবিতা পাঠাতে পাঠাতে হদ্দ হয়ে গিয়েছি। লেখার সাথে টিকিট বসানো খাম পাঠাই, কোন জবাবও পাই না। কিন্তু বৌদিদির নাম দিয়ে দুটো কবিতা 'পঞ্চবটী' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম, সে দুটো ছাপা হয়েছে। তরুণ সম্পাদক আরও লেখা চেয়েছে।

আমি—বেশত, সব কবিতাই তাঁরই নাম দিয়ে পাঠিয়ে তাঁকেই কবি বানাও আপাতত। তারপর যখন বেশ নাম হবে—তখন বই ছাপার সময়ে বললেই হবে ওটা ছদ্মনাম। স্বয়ং শরৎবাবুই প্রথম জীবনে তাই করেছিলেন জান?

কবি—সম্পাদক শুধু কবিতা চায়নি, আলাপ করতেও চেয়েছে! তাতেই বৌদিদি ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছে—"ভবিষ্যতে আমার নামে লেখা পাঠাবে না কোথাও। একি কেলেঙ্কারি!"

আমি—তবে এক কাজ করো। খুব দামী প্যাডের কাগজে তোমার লেটারহেডিং ছেপে নাও। তোমার হাতের লেখা ভাল নয়, যার হাতের লেখা মুক্তোর মত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, তাকে সপ্তাহে সপ্তাহে সিনেমা দেখিয়ে তার দ্বারা কবিতাগুলোর নকল করিয়ে নাও, তারপর খুব দামী খামে পুরে একটা ট্যাক্সি কিংবা অন্যের মোটরে চড়ে সম্পাদকদের বাড়িতে হানা দাও। আর যাওই যদি তবে নিতান্ত শুধু—যাক, সেসব কথা আপাতত থাক। দেখ, প্রত্যেক পত্রিকার একটা করে গোষ্ঠীব্যূহ আছে। তাতে ঢুকে পড়ো না কেন।

কবি—কেমন করে ব্যূহের মধ্যে ঢুকতে হয় তা' ত জানি না, স্যার।

আমি—অভিমন্যু ষোলো বছর বয়সে একটা সাংঘাতিক ব্যূহ ভেদ করেছিল আর তুমি বিশ বছর বয়সে একটা কাগজের ব্যূহ ভেদ করতে পারবে না ?

কবি—অভিমন্যু ঢুকতে জান্ত বেরুতে জান্ত না, আমারও তো স্যার তারই মতো দশা হবে।

আমি—না হে না, তুমি একবার ঢুকলে সেখানে অষ্টম রথী হবে। আচ্ছা, আপাতত এক কাজ করতে পারো তোমার কবিতার খাতা নামজাদা সাহিত্যিকদের পড়তে দাও না কেন ?

কবি—সে চেষ্টাও করেছিলাম স্যার। একজন কবি বললেন—বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, না স্যার। তারপর বললেন,—কারো প্রেমে পড়েছ ? আমি 'না' করলাম। তখন তিনি বললেন—তবে আর কবিতা কি লিখবে ? —ভাগো।

একজন কথাসাহিত্যিক বললেন—সময় নেই। মরবারও সময় নেই। জানো আমার বইএর সপ্তাহে সপ্তাহে সংস্করণ হয়। একটা করে প্রুফ দেখবারই সময় পাই না। আর একজন বললেন—নিজের লেখা দ্বিতীয়বার পড়ে দেখারই অবসর নেই; একটা করে প্রুফও দেখতে পারি না। কৃষ্ণদয়াল বাবু বলেন—আমার বইগুলো নাকি ভোলানাথের ঝুলি। তা হোক, তাতে বিক্রী তো দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। ভুলটুলগুলো শুধরে দিলে হয়ত বিক্রী কমে যাবে। যাক —আমার কলমের কালি শুকোয় না। বুঝলে, যাও ভাগো।

বইএর দোকানে যাঁরা বসেছিলেন—তাঁরা আপনার নাম ঠিকানা লিখে দিলেন। তাই আপনার সাথে—

আমি—হ্যাঁ। এটা আমাদের দস্তুর বটে, যাদের উপর রাগ থাকে আমরা তাদের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে সাহিত্য-হট্ট-বিবিক্ষুদের বিদায় করি। আচ্ছা, তোমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তো অনেক শিক্ষিত লোক নিশ্চয়ই আছেন—তাঁদের শোনাও না কেন ?

কবি—তাও চেষ্টা করেছি—আমার জামাইবাবু একজন অধ্যাপক তাঁকে শোনাতে গিয়েছিলাম, তিনি বললেন, কপি হয়েছ, গাছের ডালে গিয়ে বসো। কবিতা তো শুনলেনই না। উল্টে তিনি কপিবর বলে ডাকেন। মেসোমশায়ের ভাই একজন ভালো উকিল। তিনি বললেন—ডেঁপো ছেলে,—যাও পড়াশুনা করগে, এই বয়সে ছড়া পাঁচালী লেখা ধরেছ—এরপরে মদ ভাঙ ধরবে।

মেজো পিসেমশায় সমস্কৃতে দুর্দান্ত পণ্ডিত তর্করত্ন—না—ন্যায়চঞ্চু। ভাবলাম তিনি নিশ্চয় কবিতা শুনে খুব সুখ্যাতি করবেন—ও বাবাঃ—তিনি বললেন—তোমার পিতৃদেব একজন আঢ্য ব্যক্তি তা বলে তুমি সদ্য উদ্ভিন্ন যৌবনেই এরূপ উন্মার্গগামী হবে—এটা ত স্পৃহণীয় নয়।

আমি—আমি না হয় বেকার মানুষ, কেজো লোকদের কবিতা শোনবার অবসর নেই। সেন্স অব হিউমারও সবার নেই। কবিতা শোনা একটা শাস্তি। আমি যদি এ-মুলুকের কাজী হ'তাম তা হলে লঘু অপরাধে বিধান দিতাম—সাতদিন উপরি উপরি ৪।৫ ঘণ্টা করে কবিতা শুনতে হবে। আর অপরাধটা আরো একটু বেশী হলে পাঁচ বছর সিনেমা দেখা বন্ধ করে দিতাম।

কলেজে পড়বার সময়ে এক জমিদারকে কবিতা শোনাতে যেতাম—তাঁর শুনবার ভয়ঙ্কর আগ্রহ ছিল—সকালে বিকালে সন্ধ্যায় দুপুরবেলায় যখনই কবিতা শোনাতে যেতাম তখনই একটা কবিতা শেষ হবার আগেই তাঁর নাক ডাকতে শুরু করত। তিনি শেষে বললেন, তোমার কবিতা খুবই ভালো। আমার ভাই ইনসোমনিয়াতে ভুগছে—তাকেই শোনাতে হবে প্রত্যহ। আমি শুধু পরীক্ষা করে নিলাম।

আচ্ছা, সভাসমিতি, কবিতা-সম্মেলন ইত্যাদিতে কবিতা আবৃত্তি কর না কেন?

কবি—চেষ্টা করেছি স্যার। 'আব্রিত্তি' আমি ভালোই করি, কিন্তু

বই ছাপা না থাকায় কেউ পাত্তা দেয় না। কবিতার বই ছাপবার জন্য ভীষণ টাকার দরকার। বাবা তো কবিতার উপর সাংঘাতিক চটা। তাঁর বিশ্বাস কবিতার জন্যই আমি অনার্স পাই নি। তাঁর ধারণা বখাটে ছেলেরাই কবিতা লেখে মেয়েদের সঙ্গে মেশামিশি করবার জন্য।

আমি—আমি কিন্তু এক বাপকে জানি—তাঁর ছেলে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কবিতা লেখার চর্চার জন্য কলকাতায় থাকে—আর তিনি পাকিস্তানে ডাক্তারি করে মাসে মাসে টাকা পাঠান ছেলেকে সাহিত্যিক বানানোর দুরাশায়। তিনি ছাড়া ছেলের কবিতায় আজো কোন নারী বা পুরুষ মুগ্ধ হয়নি। তিনি বছরে হাজার টাকার উপর খরচ করছেন।

কবি—পাকিস্তানী বাবা আমার নেই। কিন্তু পাকিস্তানী পিসিমা আছেন। কলকাতায় থাকেন। আমার ছোট পিসিমার অবস্থা ভীষণ ভালো, আমাকে তিনি ভীষণ ভালবাসেন। তা ছাড়া, আমার বৌদিদি আমার কবিতার ভয়ঙ্কর ভক্ত। বই যদি ছাপি তবে বোধহয় টাকার অভাব হবে না। আচ্ছা, আপনি যদি বলে দেন তবে কোন প্রকাশক কি একখানা কবিতার বই ছাপে না? আমি কেবল পঞ্চাশখানা বই চাই—আর কোন টাকাকড়ি চাই না। বইএর স্বত্বও তারই হবে। আমার বই ছাপবার নিদারুণ অভীপ্সা।

আমি—কোন বাতুল প্রকাশককে তো জানি না।

কবি—আমিই যদি পাঁচশোখানা বই নিজে ছাপি তাহলে কি হয়? পিসিমা আর বৌদিদি টাকা দেবেন। সে বই আমি প্রত্যেক সাহিত্যিককে উপহার দেব।

আমি—তা হলে সব টাকাটা, পিসিমার ভীষণ ভালবাসা, বৌ-দিদির ভয়ঙ্করী ভক্তি ও তোমার নিদারুণ অভীপ্সা সবই জলে যাবে। এ জল অশ্রুজল। উপহার দেওয়া কবিতার বই কেউ কখনো পড়ে না। তবে একখানা কবিতার বই হাতে করে কবি

সম্মেলন বা সভা-সমিতির দরজায় গিয়ে বলতে পার—তুমি গ্রন্থকার-কবি।

কবি—তবে কবিতা শোনানোর বা প্রচারের উপায় কি ?

আমি—দেখ, ছাপার যন্ত্র বেরিয়েছে কিন্তু পড়ার যন্ত্র তো বেরোয় নি। কাজেই পড়া আর হয় না। এক উপায় শহরের পার্কে পার্কে কবিতা পাঠ করো, তাতে ঊষাচর ও নিশাচররা শুনবে। আর এক উপায় হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফর্মে কবিতা পাঠ—ডেলিপ্যাসেঞ্জার ছাড়া অন্য যাত্রী যারা ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষমাণ, তারা শুনতে পারে। সবচেয়ে ভালো ট্রেনের থার্ডক্লাসে (উপর ক্লাসে নয়, মারের ভয় আছে) কবিতা পড়া। শ্রোতাদের পালাবার উপায় নেই। একজন কবি তাই করে কিছু রোজগারও করত—কবিতার ছাপা পাতার জন্য দু'এক পয়সা করে প্রত্যেকের কাছ থেকে নিত। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়তে গিয়ে একবার মাত্র গলাধাক্কা খেয়েছিল। তোমাদেরই একজন সুপরিচিত কবি জেলের বন্দীদের কবিতা শুনিয়ে জেলখানাকে মাতিয়ে রাখত।

সেরূপ বন্দী এখন জেলে থাকলে তোমাকে জেলে যেতে বলতাম। হিন্দী কবিদের মত যদি সুর করে গান গেয়ে কবিতা পড়তে পারতে তা হলে পার্কে স্টেশনে তোমার চারিপাশে লোকারণ্য জমে যেত। লোকসভা, শোকসভা, ভোটসভা, ভোজসভা, জলসা সবেতেই তোমাকে ডাকত।

কবি—তা তো পারি না স্যার। তা ছাড়া ঐসব স্থানে কবিতা পড়তে গেলে যদি আত্মীয় বান্ধবরা দেখে, তবে লজ্জার অবধি থাকবে না যে। পুলিসের ভয়ও তো আছে।

আমি—লজ্জা ঘৃণা ভয় না করলে জয় কেউ কি কবি হয় ?

কবি—বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কথা অনস্বীকার্য। তবু—আপনি একটা ভদ্রগোছের কিছু বলুন, যা সম্ভব এমন একটা উপায় বাৎলে দিয়ে। আমার প্রতিশ্রুতি, আমার দুর্মর

উচ্চাশা, আমার উদগ্র আপ্রাণ চেষ্টার অবদান এসব কি ব্যর্থ হবে ?

আমি—তবে—ভদ্রগোছের উপায় একটা বলি—মাঝে মাঝে পরিচিত যুবকদের চায়ে নিমন্ত্রণ কর—তার সঙ্গে টা-এরও ব্যবস্থা কর।

কবি—তা পারি, বাবা ছ'টার আগে বাড়ি ফেরেন না। বৌদিদি বেশ খাদ্যরচনা-কুশলী, নানারকম তালব্য বস্তু তিনি—

আমি—না না, এমন কোন তালব্য খাদ্য দেবে না যা ৪।৫ মিনিটেই শেষ হয়ে যায়। দরকার দন্ত্য বস্তুর, চানাচুর সহ মুড়ি একথালা করে দেবে। আর তিন পেয়ালা করে চা দেবে। যত ক্ষণ দন্ত চলবে, ততক্ষণই কর্ণ অবহিত থাকবে—ততক্ষণই কবিতাপাঠ চলবে, এতে তুমি ১০।১২টা কবিতা ইনফ্লিক্ট করতে পারবে। মুড়ি বা চিঁড়ে ভাজার চেয়ে খেতে বেশী সময় লাগে এমন কিছু হলে আরো ভালো হয়।

কবি—তবে তিন হাত লম্বা একগাছ ক'রে আখ দিতে হয়।

আমি—তোমার কবিতাই তো এক একগাছি আখ—'তপত কুশারী' অর্থাৎ—তপ্ত ইক্ষু।

কবি—কবিতাকে আকর্ষণীয় করবার এটা একটা ভদ্রগোছের পরিকল্পনা বটে।

আমি—এইবার একটা সম্ভ্রান্তগোছের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা দিই—

এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবে বললে, আমি বলি—বি-এল ক্লাসেও ভর্তি হও। কবিতার খাতাখানা বৌদিদির বাক্সে আপাতত রেখে দাও—খুব বিশ্বস্ত জিম্মাদার তিনি। তারপর 'আপ্রাণ' চেষ্টা করে দুই পরীক্ষায় পাস কর—একটাতে ফার্স্ট ক্লাস পেলে ভালো হয়। বাংলায় এম-এ পড়ো না যেন। নেহাৎ অনিবার্য আবেগের বেগ এলে এক-আধটা কবিতা লিখতে পার—কিন্তু প্রকাশ বা প্রচারের

জন্য আগ্রহকে দমন করবে। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে অবসর-বিনোদনের জন্য কবিতা লিখবে। পদস্থ হলে কবিতার জন্য কোথাও তোমায় অপদস্থ হতে হবে না। তখন তোমার শ্রোতার অভাব হবে না। কারো ইষ্ট করতে না পার অনিষ্ট করবার শক্তি অর্জন করবে—তখন দেখবে তোমার লেখার পাঠক, অনুরক্ত ও ভক্তের অভাব হবে না। হাইকোর্টের উকিল ব্যারিষ্টার হলে প্রত্যেক কবিতা গোটা বার-লাইব্রেরিকে শোনাতে পারবে। কোন শ্রেণীর বিচারক হলে দেশের নানা আদালতের উকিলরা তোমার বই কিনবে, পড়বে, বই হাতে করে এজলাসে আসবে—তোমার লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করতে তোমার বাংলোয় আসবে। শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে কর্ম করলে শিক্ষক-ছাত্ররা তোমার অনুরক্ত পাঠক হবে। তোমার কবিতার বই ছাত্রদের অবশ্য-পাঠ্য হয়ে যেতে পারে। তারপর অফিসার বা অধিকর্তা হলে তোমার অধীন কর্মী কেরানীরা তোমার লেখা মুখস্থ করবে। এতে একটা বিপদও আছে অবশ্য।

কবি—বিপদ কী আছে?

আমি—আমার পরিচিত এক অফিসার প্রৌঢ়বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে কবি হয়ে গঠেন। তাঁর অধীনের কর্মীরা তাঁর কবিতার ভক্ত শ্রোতা হলো এবং পরস্পরের মধ্যে কর্তার লেখার সুখ্যাতিতে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। তারা তাঁর কবিতার আবৃত্তি করত। ক্রমে আফিসটা ইয়ারদোস্তদের আড্ডা হয়ে উঠল। কেউ কেউ অফিসারকে 'দাদা' বলতে সুরু করল এবং বৌদিদির কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আফিসের কাজে শৈথিল্য দমন করা তাঁর সাধ্যাতীত হয়ে উঠল। যাক, এ হলো ব্যতিক্রম; মোট কথা তুমি পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠলে দেশে তোমার লেখার ভক্ত উপভোক্তা এমন কি স্তাবকের অভাব হয়ে না। সম্পাদক, প্রকাশক, ভূমিকার্থী, অভিমতার্থীর ভিড় হবে তোমার দরজায়। তখন একখানা যে কোন বই লিখলেই তুমি বঙ্গসাহিত্যের মাতব্বর, মণ্ডল, অভিভাবক ও

বিচারক হয়ে পড়বে। নানা কমিটির মেম্বর হয়ে সাহিত্যিকদের ইষ্ট অনিষ্ট যা খুশী তাই কয়তে পারবে। আর যদি মাস্টার বা কেরানী হয়ে ৫০ খানা বইও লেখ তবু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না, সভামঞ্চে ঠাঁই পাবে না, গ্যালারিতে বসতে হবে।

'প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।' কাজেই আগে সম্ভ্রান্ত হও, উচ্চপদস্থ হও, সমতলে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য বলা আর পাহাড়ে অন্তত মালভূমিতে দাঁড়িয়ে বলার মধ্যে পার্থক্য আছে। যীশুখৃষ্টকেও পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সারমন দিতে হয়েছিল।

কবি—(দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে)—বুঝলাম স্যার, এটাই আপনার আসল উপদেশ। যা বল্লেন তাই করা যাক। নমস্কার।

তত্ত্বকথা

১৩৬৫ সালের বৈশাখ মাস।

নীলকণ্ঠ ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর একদিন আমার বাড়ীতে এসেছিল। নীলকণ্ঠ বড় হৃদয়বান লোক—তার সাহিত্যরসবোধও আছে। সে বল্‌লে এই বিয়েতে একটি জিনিস আমার বড়ই মর্ম্মস্পর্শ করেছে।

আমি—কি বলো দেখি, দেখি তা নিয়ে কবিতা হয় কিনা। জানোত আমরা intellectualism-এর কবি নই, Sentiment-এর কবি।

নীলু—ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে গলির মোড়ে যখন কয়েকজন লোককে থালা-ডালা হাতে আসতে দেখা গেল, তখন বাড়ীর স্ত্রী-লোকেরা কলরব করে উঠল। 'তত্ত্ব আসছে তত্ত্ব আসছে। শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা'। আমার নতুন বৌমা আমার মেয়ের কাছে তখন বলেছিল—'ঠাকুরঝি, শাঁখের বাদ্যে আমার বুক দুড় দুড় করছে। বাবা যা পাঠিয়েছেন তা হয়ত এ-বাড়ীর লোকের পছন্দ হবে না।' আমার মেয়ে এসে হাসতে হাসতে আমাকে বৌমার কথা বল্‌ল।

আমি—কেন? শ্বশুর বাড়ীতে এসে অবধি বোধ হয় বাপের বাড়ীর কেবল নিন্দাই শুনেছে। কথাটা কবিতার বিষয় বটে। তুমিও একটু হাসলে, কেমন?

নীলু—না, দাদা, আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। মনটা আমার বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখে জল এলো।

আমি—তুমি কি করলে?

নীলু—আমি জানি তত্ত্ব-বিচারিকারা প্রত্যেক শাড়ীখানির পাড়, বুনুনি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বিচার করে মূল্য নির্দ্দেশ করবে। পাড়ার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরাও কঠোর সমালোচনা করবে। আমাদের সমাজের মেয়েরা বড় খুঁত ধরে—কিছুই উদারতার চোখে দেখতে পারে না।

আমি বিচারিকাদের কাছে গিয়ে বল্‌লাম—তত্ত্ব দেখে কেউ কিছু নিন্দা কর্‌তে পাবে না। প্রশংসনীয় না হলেও প্রত্যাশার দাবি না মিটলেও খুব প্রশংসা করবে। পরেও কোন দিন ভুলেও প্রশংসা ছাড়া নিন্দা করবে না। অন্ততঃ বৌমার সাক্ষাতে। যদি করো তবে আমি খুবই রাগ করব, অনর্থ ঘটাব। আমি বেহাই মশায়কে লিখে দিচ্ছি আপনার প্রেরিত তত্ত্ব আশাতীত রূপই হয়েছে। এত বেশি ব্যয় না করলেই পারতেন। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা খুবই প্রশংসা করছে। বৌমাকে ডেকেও আদর করলাম বললাম কে কি বলে তা শুনো না, মা। তোমার বাবা খুব ভালো তত্ত্ব করেছেন। বৌমার ম্লান মুখে হাসি ফুট্‌ল। সে বুঝল, এবাড়ীতে একজনও অন্ততঃ তার আপনার লোক আছেন।

আমি—নীলু, তোমাকে আমি চিনি। তুমিও মহিলাদের সঙ্গে যোগ দিলে অনলের সঙ্গে অনিলের যোগ হ'ত। তোমার কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলাম তুমি তাই করেছ। শুনে আমার চোখেও জল আসছে। আহা; অপরিচয়ের কলতরঙ্গে মা আমার প্রসাদী করবী। তাত হলো; বৌমা নিজেই সিচুয়েসন সেভ করেছেন। জান-ত আমার মন চিরদিনই 'বিশেষ' থেকে 'সামান্যে' চলে যায়। একের কথা সারা সমাজের কথায় পরিণত হয়। এই তত্ত্বের বালাই নিয়ে আজো বাংলার বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের কত সদ্যোবিবাহিতা বধূরই না বুক দুড়দুড় করে। আজো এ নিয়ে কত গঞ্জনার শেল, শূল, শল্যের আঘাত তাদের অসহায় কোমল বুকে সইতে হয়। এই তত্ত্বের ব্যাপার নিয়ে কত শিক্ষিত যুবকও হয়ত তাদের নববধূকে ধিক্‌ত করে। এ-যে কত বড় কুপ্রথা এই পশ্চিমবঙ্গে চলছে তা ভালো ক'রে ভেবে দেখ। পূর্ববঙ্গে এ উপদ্রব ছিল না পূর্ববঙ্গীয় পরিবারগুলিও কুসংসর্গে পড়ে তত্ত্বান্বেষী হয়ে পড়লে দুঃখের বিষয় হবে। স্বর্গত না'ট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁর 'তালের তত্ত্ব' কবিতায় এই প্রথাকে কি চাবুকই না দিয়েছেন!

নীলু—একেবারে কুপ্রথা বলা চলে না। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী হতে তত্ত্ব গেলে—বধূ ভাবে বাপ-মা মেয়েকে ভুলে যায়নি। তত্ত্বের একটি অর্থ সংবাদ, তত্ত্ব প্রেরণের মানে সংবাদ নেওয়া। এতে শ্বশুরবাড়ীতে বধূর অনেক কশুর মাফ হয় এবং গৌরব ও আদর একটু বাড়ে।

আমি—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ঘটোৎকোচের (ক-স্থানে কো ব্যবহার করলাম দোষ ধরোনা—তত্ত্ববিচারিকাদের মতো) দেশে এ-ও এক শ্রেণীর উৎকোচ। কিন্তু, নীলু আর কেউ না জানুক বধূতো নিজেই জানে, তত্ত্বের পূজোপচারগুলি বাপ-মার চোখের গঙ্গাজলে সিক্ত। ভেবে দেখেছ আবার তত্ত্ব মনোমত না হলে বধূর ও রাগ অভিমান হতে পারে মা বাপের উপর। কারণ, অনুদার শ্বশুরবাড়ীতে বধূর অনাদর হয়। বসনালয় থেকে যে সব বস্ত্র আহৃত সেগুলি শুধু মেয়ে-জামাইএর। কিন্তু রসনালয় থেকে যে সব রসনাতোষণ দ্রব্য আহরণ করতে হয়—সেগুলি পরিজনগণের রসনার ভাবণকে মধু-রায়িত করবার জন্য। বিশেষতঃ যে বাড়ীতে তিন চারটি বৌ—ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক অবস্থার পরিবার হ'তে এসেছে, সে বাড়ীতে তত্ত্বের মূল্য, পরিমাণ ও প্রকৃতির পার্থক্য সম্বন্ধে তুলনামূলক তত্ত্ববিচার অনিবার্য। সে ক্ষেত্রের বিচার অনুমান করে নাও।

বধূদের এরূপক্ষেত্রে আদর গৌরবের তারতম্য হবেই। একই বাড়ীতে ধনিকন্যা, মধ্যবিত্তের কন্যা, দরিদ্রকন্যা, পিতৃহীন কন্যার বিবাহ হ'তে পারে, অতএব তত্ত্বের তারতম্য ঘটবেই। কাজেই তত্ত্বই বধূদের আদরেরও পার্থক্য ঘটিয়ে দেয়। অনেক কন্যার পিতা কন্যার কল্যাণের জন্য না-হোক নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সাধ্যাতীত উৎকোচদানে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে প্রতিযোগিতাও আছে। আমার একজন আত্মীয় সাধ্যাতীত ব্যয়ে তত্ত্ব করতেন। তাঁকে তিরস্কার করায় তিনি বলেছিলেন, "জানেন ত দাদা, আমার মেয়েটির রঙ ফর্সা নয়, জামাইএর তত্ত্বটা কিছু ভালোরকম না করলে

কি করে চলে? কালো রঙ তাতে ফর্সা হবে না, কিন্তু স্পৃহনীয় না না হলেও অন্ততঃ সহনীয় হবে এই ভরসা।"

নীলু—কালোরঙ বিবাহের সময়ে পুঞ্জীভূত শুভ্র রজতখণ্ডের ঔজ্জ্বল্যে ফর্সা হ'ত না তা নয়। আজো বোধ হয় তা হয়।

আমি—অনেক পরিবারে দেখেছি পূজার সময়ে সমস্ত পরিবারের নব পরিচ্ছদের জন্য যে ব্যয় হয় তার চেয়ে ঢের বেশি ব্যয় হয় একটি কন্যার তত্ত্বের জন্য।

তত্ত্বের প্রথা বিলাত থেকে আসেনি আমাদের দেশে বরাবর ছিল। কিন্তু তাতে নিন্দাপ্রশংসার কিছু ছিলনা। একখানা লালপেড়ে সাধারণ শাড়ী ও এক হাঁড়ী বাতাসা বা কদমা এই ছিল তত্ত্ব। জামাই ষষ্ঠীতে জামাইএর ধুতি চাদরের সঙ্গে এক ধামা দেশী আম, একটা কাঁটাল আর কিছু ছানা-বর্জিত মিষ্টান্ন। এই তত্ত্বের জিনিস পাড়ার লোকদের মধ্যে বিলি করা হ'ত। আমি যখন নেহাৎ বালক তখন একদিন একটুকরো তরমুজ ও তুই কোয়া কাঁঠাল পিসীমা আমাকে খেতে দিলেন। তখন পল্লীগৃহে ছিলাম। পিসীমা বললেন—দত্তবাড়ী থেকে এসেছিল, দশ কোয়া কাঁটাল ও একফালি তরমুজ। পিসীমা বলতেন—আমি বুঝি বলেছিলাম —পিসীমা আমার কবে বিয়ে হবে? গোটা কাঁঠাল গোটা তরমুজ আসবে এ বাড়ীতে॥ এতে তখনকার প্রথার সঙ্গে জড়িত জন্মগত তত্ত্বলোভ সূচিত হয়। সাধারণ গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে একই ধারা ছিল। ধনীদের কথা বলছি না, মধ্যবিত্তদের কথাই বলছি ধনী দেশে আর কজন ছিল? এখনকার গরবনেদী ধনীদের পিতামহদের সংসারের কথা বলছি। আর এখন শহরের রাজপথ দিয়ে লোকে মিছিল করে ২০।২৫ জন কিংবা আরো বেশী তত্ত্ববাহী পাঠায়। একজন হয়ত একটা শুধু তরমুজ কি কাঁঠাল কি এক হাঁড়ি দই মাথায় করে চলে। কন্যার পিতা কন্যার বাড়ীতে কি কি পাঠাচ্ছে তা রাস্তার তুধারের লোককে না দেখালে কি চলে?

তাতেও ক্ষতি হ'ত না, শহরে তাদের তত্ত্বের এই বহর এখন শহরের সকল শ্রেণীর লোকের অনুকরণীয় হচ্ছে। এতেই সমাজের ক্ষতি হচ্ছে। যাঁরা লরি বা মোটরে তত্ত্ব পাঠান তাঁরা বরং কতকটা সুবিবেচক। সকল পড়ুয়া ছেলের পিতামাতাই এইরূপ তত্ত্বই আদর্শ বলে প্রত্যাশা ক'রে বসে থাকে। অধমর্ণ বেহাইকে কোন উত্তমর্ণ বেহাই রেহাই দিতে চায় না। আর কন্যার পিতারাও সাধ্যাতীত ব্যয় ক'রে ঐ প্রত্যাশার দাবি মেটাতে চেষ্টা করে। এর ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারে কন্যাদায়ের উপসর্গের জের এই তত্ত্বদায়ের ধারায় চলতে থাকে।

আমি দেখেছি যে পরিবারের ছেলেমেয়েরা নির্দুগ্ধ, নির্মৎস্য নির্মাংস আহার করে, সে পরিবার হতেও কন্যার শ্বশুর বাড়ীতে যে তত্ত্ব যায় তার মূল্যে অন্তত তিনমাস ছেলেমেয়েরা দুধ মাছ খেতে পারে। আমার কোন কোন সহযোগী আমাকে বলেছেন পরীক্ষার খাতা দেখে তাঁরা যা পান তাতে সারা বৎসর মেয়েদের তত্ত্বটা কোনপ্রকারে চলে। পূজার আগে পরীক্ষার ফী পাওয়ার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থের আসল মালিক কে?

একজন রসিক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন সন্দেশশিল্পী "ভীম নাগ" আমাদের কাছে অন্বর্থকনামা। কারণ, তত্ত্ব ও কুটুম্ব আপ্যায়ন খাতে বহু অর্থ তাঁর বিলে যায়, কেবল নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়ে ভীম ও নাগের মধ্যে যে 'চন্দ্রটি' স্যাণ্ডউইচ্ড হয়ে আছে তার পরিচয় পাই। নাগরিক সমাজে প্রত্যেক পরিবারের নৈমিত্তিক উপলক্ষের ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। এই ব্যয়ের আদর্শের প্রবর্তক ধনী মহাজনেরা। শ্রেষ্ঠ লোকেরা বা মহাজনেরা যা যা করে, ইতরজনে সেই সেই আচরণেরই অনুসরণ করে। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। মহাজন নাগরিক সমাজে ধনীরাই। মহাজন বা শ্রেষ্ঠ লোক বলতে সমাজের লোকে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদেরও বুঝে না, দরিদ্র অধ্যাপকদের বা শিল্পী গুণীদেরও বোঝে না।

জামাই ষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জন্মতিথি, বরকন্যার আশীর্বাদ (পাকা দেখা) ইত্যাদির সমারোহ আড়ম্বর দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে, মধ্যবিত্তেরা সদ্যোবিত্ত আত্মীয়দের অনুকরণ করতে গিয়ে ত্রিশ টাকা মণ চা'লের বাজারেও অযথা ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সঙ্গে তত্ত্বের সমারোহ ও তজ্জনিত ব্যয় দিনদিনই বাড়ছে। এতে একদিকে অর্থকষ্ট ঘটছে, অবশ্য-প্রয়োজনীয় ভোজ্য হ'তে অনেক পরিবারের লোকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে অসন্তোষ ও মনের মালিন্যেরও সৃষ্টি হচ্ছে।

এই সব বাহ্য উপসর্গের আড়ম্বর যত বাড়ছে—রান্নাঘরের ব্যবস্থাটা ততই সংকীর্ণ হচ্ছে। গতানুগতিকতা ও ভ্রান্ত মর্যাদাবোধের দাবির বাইরে এই রান্নাঘর। এখানে কেউ উঁকি দিতে আসে না। যত চাপ সব পড়ে রান্নাঘরের উপরে, রান্নাঘর তাপ দেয় দেহের স্বাস্থ্যের উপর। তা আবার তাপ ও চাপ দেয় পরিবারের জীবনযাত্রার উপর। ঔষধপথ্যের দাম কমাবার উপায় নেই। ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ খাতে ধনবণ্টনের বৈষম্য না ঘুচলে জাতীয় জীবনে ধনবণ্টনের বৈষম্য ঘুচবে না।

নীলু—আমরা তো বুঝি, কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা যে বোঝে না,—সেজন্য সাধ্যাতীত ব্যয় করতে হয়।

আমি—মেয়েদের এ বিষয়ে এডুকেট করতে হয়। তারা আজকাল স্কুলকলেজে শিক্ষা পাচ্ছে, স্কুলকলেজের শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণসাধনের শিক্ষা আগে দিতে হবে। যাতে তাদের চিত্ত উদার হয়; যাতে তুচ্ছের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মে এবং সমগ্র সমাজের ইষ্টানিষ্ট বুঝতে পারে, তারা যাতে তুচ্ছ নিন্দায় কর্ণপাত না করে। যাতে সৎসাহসিনী হয় সে দিক থেকেও তাদের শিক্ষা দেওয়ার দরকার। প্রবীণাদের চিত্তেরও ঔদার্য বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। কেবল মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। তারাও শ্বশুরবাড়ী হতে এটা ওটা প্রত্যাশা না করে এবং মনে না করে শ্বশুরবাড়ী হতে প্রচুর পাওয়ার

অর্থই হচ্ছে শ্বশুরবাড়ীর দ্বারা সম্মানিত হওয়া। বিবাহিত যুবকরা যদি এই বাড়তি ব্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলেও ফল হ'তে পারে। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে হবে।

অন্যের অসহায়তা বা নিরুপায়তার সুযোগ উপভোগ মর্যাদা-হানিকর তা তাদের শিখতে হবে। এই সামাজিক উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ না হলে অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ হবে না।

Exploitation যে ক্ষেত্রেই হোক, যে ভাবেই হোক তা যে অপরাধ, এ শিক্ষা তারা না পেলে কেবল পাস-করা শিক্ষাকেই সৎশিক্ষা বলা চলে না!

নীলু—পণপ্রথামূলক বিবাহের পরিশিষ্ট এই তত্ত্ব—আপনাদের গদ্যপদ্য সকল রচনার পরিশিষ্ট যেমন একটা কোন তত্ত্ব। পণপ্রথা-মূলক বিবাহ উঠে গেলে তত্ত্বটাও থাকবে না।

আমি—না হে ভায়া, পণ উঠে গেলে পণটা পণ্যে অর্থাৎ যৌতুক ও তত্ত্বের সামগ্রীতে পরিণত হবে। তত্ত্বটাই আরো বড় হয়ে উঠবে। আজকালকার কবিতায় যা হচ্ছে। একমাত্র উপায় একে অবৈধ বলে উভয় পক্ষের বদ্ধমূল ধারণা হওয়া। কন্যার পিতার পক্ষে সৎসাহস, কন্যার শ্বশুরের পক্ষ হতে নির্লোভতা, যুবকদের পক্ষ হতে আত্ম-মর্যাদাবোধ এবং মহাজনদের পক্ষ হতে গোপনে যৌতুকতত্ত্বের সরবরাহ—এগুলির মিলন হওয়া চাই।

পরীক্ষা কার ?

শম্ভুবাবুর বড় ছেলে অম্বু এবার দ্বিতীয়বার আই-এ পরীক্ষা দেবে। শম্ভুবাবু ছাপোষা মানুষ। একটা মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। ছেলে বি-এ পাশ করতে পারলে তাঁর আফিসে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করতে পারবেন। অবসরগ্রহণের কাল ক্রমে আসন্ন হচ্ছে। তাঁর স্বাস্থ্যও দিন দিন খারাপ হচ্ছে। শম্ভুবাবুর দুটি মেয়ের পর এই ছেলে, মেয়ে দুটির বিয়ে হয়েছে। তৃতীয় মেয়ে গতবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। আর দুটি ছেলে স্কুলে পড়ে।

শম্ভুবাবু তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন—দেখ, অম্বুকে দক্ষিণের ঘরটা ছেড়ে দাও। তুমি পাশের ঘরে আর সবাইকে নিয়ে থাক। আমি বাইরের ঘরে শোব। আর দেখ, বাড়ীতে যে পাড়ার মেয়েরা বেড়াতে আসবে, তা হবে না। ব'লে দিও ছেলের পরীক্ষা, দিনকতক তাঁরা আর যেন যখন-তখন না আসেন। ছেলেদের ব'লে দিও গোল না করে, চেঁচিয়ে কথা না বলে, সিঁড়িতে শব্দ ক'রে ওঠা-নামা না করে। অম্বুকে কেউ ডাকলে জানালা দিয়ে ব'লে দিও সে বাড়ীতে নেই, কলেজে গিয়েছে। আর দেখো, ওকে ভালো ক'রে খেতে দিও, ডিম কিংবা মাংস একটা যা হয় রাত্রে খেতে দেবে, দুধও পোয়াটেক দেবে। পরীক্ষার পড়ায় সাধারণ খাওয়া চলবে না। পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া চাই।

গিন্নী বল্‌লেন—তা-ত হ'লো, মেয়ের বিয়ে যে ঠিক হয়ে আছে, সেটা ত দিতে হয়। পাত্রপক্ষ ত মাঘ মাসে দিতে চায়।

শম্ভু—পাগল ! ছেলের পরীক্ষার আগে মেয়ের বিয়ে ? তবেই হয়েছে। আমি ছেলের বাপের কাছে তিন মাস সময় চেয়েছি। কেদারবাবু বলেন—তবে আষাঢ় মাসেই হবে। আমি বলেছি—বৈশাখ মাসে। কেন জান ? আষাঢ় মাসে পরীক্ষার ফল বেরুবে।

কি হবে কে জানে? পরীক্ষা দেওয়ার আর ফল বেরুনোর মাঝেই মেয়ের বিয়ে দেব। পাত্রের পিতা জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে দেবেন না, বৈশাখে একটা বাধা আছে, তাঁর একটি কন্যার ঐ মাসে সন্তান-সম্ভাবনা আছে। অনেক বলে ক'য়ে পায়ে হাতে ধ'রে প্রথম বৈশাখেই রাজী করেছি। আশীর্বাদটা ২।১ দিনের মধ্যেই সার্‌ব—কোন ঘটা করব না। ৪।৫ জন লোক সকালের দিকে আস্‌বে। রান্নাবাড়া করতে হবে না, বুঝ্‌লে।

গিন্নী—তা-ত হ'ল, দাদা লিখেছেন, তাঁর মেয়েকে দেখানোর জন্য ২।৪ দিন এ বাসায় আসতে চান, তার কি হবে?

শম্ভু—লিখে দাও, অম্বুর পরীক্ষা এখন এ বাড়ীতে আসা চল্‌বে না। অমলার বাড়ীতে যেন ওঠেন। ভায়া লিখেছিলেন—বৌমার চিকিৎসার জন্য আমার বাসায় আস্‌বেন—আমি লিখে দিলাম—অম্বুর পরীক্ষা আসন্ন, এ সময় এসো না। তুমি বরং রমেশের বাসায় এসো, আমি ডাক্তার ওষুধের ব্যয়ভার বহন কর্‌ব। অগ্রহায়ণের আর দশ দিন আছে—মাঝে পৌষ আর মাঘ—দু মাস। পরীক্ষাটা অম্বুর হয়ে যাক, তার পর আত্মীয়তা রাখা যাবে। জান, অম্বুর পরীক্ষাই হচ্ছে আমাদের পরিবারের জীবন-মরণের সমস্যা।

গিন্নী—তুমি গোড়া থেকে সাবধান হ'লে না! ৫।৬ মাস চুপ ক'রে থেকে এখন সজাগ হয়ে উঠলে। ক'দিন বা আর বাকি আছে!

শম্ভু—আরে এখন ছেলের সুবুদ্ধি হয়েছে, দেখছ না আদা-জল খেয়ে লেগেছে। এর আগে কি ওকে বাড়ীতে পেয়েছি যে ওকে পাহারা দিয়ে রাখ্‌ব—ওর দিকে দৃষ্টি দেব? যখনই বলেছি—জবাব দিয়েছে এখনো ঢের সময় আছে। এখন থেকে মুখস্থ করলে মনে থাকবে না।

অম্বু এখন সারাদিনই পড়ে। রাতও জাগে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত। একবার আধঘণ্টার জন্য পার্কে কিংবা ছাদে বেড়ায়। সব দিন স্নান করে না—তাড়াতাড়ি খায়, মাথায় একরাশ চুল,

কাটবার সময় হয় না। তার ছোট ভাই দুটি আস্তে আস্তে চলে। ফিস ফিস ক'রে কথা বলে, শব্দ ক'রে হাসে না। তাদের আবদার, বায়না আর কিছু নেই। বাড়ীটা নিঃঝুম, যেন শোকাচ্ছন্ন পুরী। অম্বুর মা নিঃশব্দে রান্না করেন, হাতাখুন্তির শব্দ করেন না, লঙ্কার সম্বরা দেন না কোন ব্যঞ্জনে। বাড়ীতে কোন লোক এলে উত্তরের বারান্দায় বসিয়ে ২।৪টা কথা ব'লে বিদায় ক'রে দেন। যতক্ষণ অম্বু রাতে পড়ে, ততক্ষণ তিনি জেগে থাকেন। ছেলে বিছানায় ব'সে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলে চোরের মত নিঃশব্দে গিয়ে মশারিটা ফেলে গুঁজে দিয়ে আসেন। ঠাকুরদেবতার কাছে তিনি মানত করেন—অম্বু পাশ হ'লে ঠাকুরদের এটা ওটা দেবেন। অম্বু মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ে—তিনি গিয়ে উৎসাহ দেন। শম্ভুবাবুও ইদানীং ঠাকুরদেবতা মানতে শুরু করেছেন, সকালবেলায় পূজা আহ্নিক করেন। সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময়ে পাড়ার মন্দিরে গিয়ে হাতজোড় ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

ক্রমে পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এল, বাড়ীতে ভয় ও উদ্বেগের অন্ধকারও ঘনিয়ে এলো। যেন টাইফয়েড রোগীর তৃতীয় সপ্তাহ চলছে বাড়ীতে। পরীক্ষার কয়েক দিন শম্ভুবাবু আফিস থেকে ছুটি নিলেন। অম্বু বিরক্ত হ'ত, কিন্তু শম্ভুবাবু কিছুতেই শুনতেন না,—সঙ্গে ক'রে সেণ্টারে বসিয়ে আসতেন। টিফিনের সময়ে খাবারের ঠোঙ্গা আর ডাব হাতে ক'রে পরীক্ষার হলের গেটের পাশে দীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর বুক দুড়দুড় কর্‌ত। অম্বুর বুদ্ধি আছে—সে এসে বল্‌ত—ভালই হয়েছে। পাঁচটার সময়ে শম্ভুবাবু আবার অম্বুকে আনতে যেতেন। প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে বার বার প্রশ্ন করতেন, অম্বু বিরক্ত হ'য়ে বল্‌ত—'বল্‌লাম ত ভালোই লিখেছি।'

পরীক্ষা ত শেষ হ'ল। এবার দারুণ উদ্বেগে শম্ভুবাবু ও তাঁর গিন্নীর দিন কাটতে লাগ্‌ল। সপ্তাহ তিনেক পরে একদিন শম্ভুবাবুর সঙ্গে দেখা।

শম্ভুবাবু বল্‌লেন—"ভায়া, অম্বুর রোল নম্বরটা দেব? তোমারি ত ছাত্র!"

আমি বল্‌লাম—"রোল নম্বর নিয়ে কোন সুবিধা হবে না। কিছুই জানা যায় না।"

শম্ভুবাবু বল্‌লেন—"অম্বুর ইংরেজীটায় একটু সন্দেহ আছে কি না।"

আমি বল্‌লাম—"আপনি ভাববেন না। অম্বুর পাশের জন্য অনেকেই ভাব্‌ছেন, আপনার চেয়ে ঢের বেশী ভাব্‌ছেন পরীক্ষকরা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা। যার বিন্দুমাত্র উপায় থাকে—তাকে কর্তারা কিছুতেই ফেল করান না। পাশের percentage বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হয়।

তারপর শম্ভুবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল তাঁর কন্যার বিবাহের রাত্রে। একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে শম্ভুবাবু বল্‌লেন—"অম্বু বলছিল কেউ কেউ খবর জানতে পারছে।"

আমি বললাম—"সব বাজে কথা, কেউ জানতে পারছে না। জানবার উপায় নেই।"

শম্ভুবাবু বল্‌লেন—"বল না কেন গরিব মানুষের জানবার উপায় নেই।"

আমি বল্‌লাম—"না শম্ভুবাবু, বড় কড়াকড়ি ব্যাপার, কারো জানবার উপায় নেই।"

শম্ভুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একজন গণ্যমান্য নিমন্ত্রিতের দিকে ছুটলেন। দেড় মাসে শম্ভুবাবুর শরীর অনেকটা রোগা হয়ে গিয়েছে। অজ্ঞাতসারে আমারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হ'ল। অম্বু কিন্তু নিজের বোনের বিয়েতে বেশ স্ফূর্তিতেই ছুটাছুটি করছে। বিশ্রাম পেয়ে শরীরটাও তার বেশ ভালোই হয়েছে। আমার মনে হ'ল পরীক্ষাটা কার?

আমি নিরুৎসাহ কর্‌লেও শম্ভুবাবু ফলাফল জানবার জন্য নানা

স্থানে ট্যাক্সি খরচ ক'রে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। বাজারে গুজব ইংরেজিতে পনেরো পারসেণ্ট পাস হচ্ছে—কেউ বলে আরো কম। শম্ভুবাবু পার্কে, দাওয়ায়, আফিসে, বাজারে সর্বত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষতঃ অজ্ঞাত পরীক্ষকদের মুণ্ডপাত করছেন।

পরীক্ষার ফল বের হওয়ায় সময় হ'ল। শম্ভুবাবুকে দেখতাম কেমন যেন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শম্ভুবাবু প্রত্যহ সকালে ২।৩ খানা খবরের কাগজ কিন্‌তেন, কত পারসেণ্ট পাস হ'ল দেখবার জন্য। একদিন কাগজে দেখলেন শতকরা ২৫ জন পাশ হয়েছে। দেখে তিনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন।

দারুণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে একদিন সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়্‌ল অর্থাৎ ফল বা'র হ'ল। ফল ছাপার কাগজখানা শম্ভুবাবুর হাতে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল। ছেলের রোল নাম্বার কাগজে না পেয়ে শম্ভুবাবু অর্ধমূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। একটু সাম্‌লে নিয়ে বারবার কাপড়ের খুঁটে চশমা মুছে তন্নতন্ন ক'রে দেখলেন। রোল নাম্বারটা তাঁর ছ্মাস হতে জপমন্ত্র, ভুল হবার কথা নয়। বাড়ীতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

অম্বু বল্‌ল—Third paperটা দিয়েই বুঝেছিলাম পাশ হ'ব না, আমার ফল আগেই আমি ইউনিভার্সিটি থেকে জেনে এসেছিলাম। যাক Compartmental-টা বোধ হয় পেয়েছি। ইংরেজিটা খুব জোর দিয়ে এবার পড়ি। আমাদের কলেজে শতকরা ৮০ জন ফেল করেছে। একেবারে ম্যাসাকার! ভালো ভালো ছেলেরাও ফেল হয়েছে। ১৫টা Essay মুখস্থ করেছিলাম, যদি একটাও পড়ে যেত তা হলে জুতিয়ে পাস করতাম। তা একটাও পড়ল না।

এই বলে অম্বু অন্যান্য ফেলকরা ছেলেদের ডাকে হৈ-হৈ করতে করতে চলে গেল।

অম্বুর মা বল্‌লেন, "মুখপোড়া পরীক্ষকরা কোস্‌চেন করবে শক্ত। দেখবে কড়া করে, নম্বর যেন তাদের বাক্‌সর টাকা, দিতে আর মন সরে না। দয়া-মায়া নেই, কসাই সব! অম্বু এবার খুব রাত জেগে পড়েছে—এবার ওর ফেল হবার কথা নয়। ওরা জোর করে ফেল করে দিয়েছে। তুমি কর্তাদের বলো গিয়ে। এজন্য যা করতে হয় কর। নয়ত তোমার আফিসের সাহেবকে বলো গিয়ে। তিনি একটা কিছু প্রতিকার করবেন।"

শম্ভুবাবু বললেন—গিন্নী সে সব হয় না। দেখ আমার শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে। অম্বু পাশ করতে যত দেরী করছে ততই আমার ব্যয় বাড়ছে—ওকে চাকরিতে ঢোকানোতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে দেনা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড হতেও দেনা। নাবালক ছেলে দুটো ইস্কুলে পড়ছে। আমাদের মত সংসারে ছেলের পরীক্ষা পাস ছাড়া বড় আর কিছু নেই। তা কিছুতেই হচ্ছে না। এযে আমার কি শাস্তি,—তা কি বুঝবে? ভবিষ্যৎ অন্ধকার! দারুণ দারিদ্র্যের ভীষণ মূর্তি আমি দিব্য চোখে দেখছি।

গিন্নী বললেন—তাই ব'লে অম্বুকে যেন কিছু বলো না। ওরও ত মন কম খারাপ হয়নি। আজকালকার ছেলে কিছু যদি ক'রে বসে। কাজ কি, কিছু ব'লে!

পাশের বাড়ীর মেয়েটা পাস হয়েছে। শম্ভুবাবুর কানে গেল—সে বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল হচ্ছে—আত্মীয়স্বজন এসে অভিনন্দন জানাচ্ছে। পাসকরা মেয়েটি তার দাদাকে বলছে—ভারি ত Third division-এ পাস, তার আবার অভিনন্দন, শুধু লজ্জা দেওয়া! এর চেয়ে ফেল হওয়া ভালো ছিল! আসছে বার first division-এ পাস হতাম।

শম্ভুবাবু শুনতে পেলেন, তার দাদা বলছে—"রাখ, এ বাজারে

পাস হয়ে গিয়েছিস Thank your stars. Third division বলে মুখ বেঁকানো হচ্ছে! ওবাড়ীর ছেলেটা ত তাও পায়নি।”

শম্ভুবাবু বললেন—অম্বুটা যদি থার্ড ডিভিসনেও পাস হতো! আমি ত তার বেশি চাইনি, গিন্নী। আমার অদৃষ্ট! তুমি বাড়ীর ভিতরে-থাক, বুঝবে না। এযে কত বড় অপমান, এতে যে কত মাথা হেঁট, ছেলেও তা বুঝবে না। সবার কাছে চোরের মত থাকতে হবে। কাউকে মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না। মুখ তুলে কারো সঙ্গে কথা বলবার উপায় নেই। আমার কত পরিচিত লোকের মেয়েরা ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, জানো? বাঁচাও চাই, পাস করাও চাই, নইলে আমাদের মত লোকের আর কোন উপায় নেই—কোন উপায় নেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। হরিবোল! হরিবোল!!

মেরামতি

ইন্দু এসেছিল, অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার খোকাটি বড় ভুগছিল—এখন কেমন আছে ?

ইন্দু—এখন ভাল আছে, কিন্তু ভারী দুরন্ত হয়েছে, দাদা। বাড়ীর জিনিসপত্র ভেঙে-চুরে ছিঁড়ে একাকার করছে।

আমি—বোধ হয় সে সবের বেশির ভাগই তার খেলনা, আর দুই-একটা কাচের জিনিস হবে।

ইন্দু—শুধু তাই নয়, কাচের, চীনামাটির, মাটির, কাঠের জিনিস ইত্যাদি ভাঙ্গাতো বটেই, তা ছাড়া ছেঁড়া আছে। দামী কাগজপত্র, রসিদ, বইয়ের পাতা, ছবি,—যা পায় তাই ছিঁড়ে ফেলে। বাড়ী গেলেই ওর মা খোকার বিরুদ্ধে একটা কিছু ভাঙ্গার বা ছেঁড়ার নালিশ করবেই।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, খোকা যা ভাঙ্গে তা ডাষ্টবিনে ফেলে দিলেই চলে, আর তোমরা যা ভাঙ্‌ছ—ঘটী বাটি থেকে স্থুরু ক'রে গহনা পর্যন্ত—সে সবের মেরামতের জন্য নতুন ক'রে কত ব্যয় হয় বলো তো। সে সব ফেলে দিলেই তো চলে না। যত দোষ খোকার। খোকার মা জবাব দেয়, মশায়ের চশমা আর ঘড়ি মেরামতে যা খরচ পড়ে তার থেকে ঢের কম। তখন আর কিছু বলবার উপায় থাকে না।

আমার বিয়েতে দাদা জেদ ক'রে একটা খুব দামী ঘড়ি নিলেন। তারপর সেটাকে ৪।৫ বার মেরামত করতে হলো। প্রত্যেক বার ৫০ টাকা ক'রে খরচ পড়ল। এই টাকা দাদাও দেন নি—শ্বশুরও দেন নি। ঘড়িটা একটা 'লায়েবিলিটি' হয়েছে। সত্যি দাদা, মেরামতি খরচ করতে করতেই হয়রান হয়ে গেলাম—জুতো, ছাতা, ফাউন্টেন-পেন, ষ্টোভ, চশমা, টেবিল, চেয়ার, আলমারি এ সবের মেরামতির খরচ বেশি নয়! কিন্তু সেলাইএর-কল, রেডিওসেট, ঘড়ি ইত্যাদি

মেরামতির জন্য বহু খরচ করতে হচ্ছে। চারখানা চেয়ারের বেতের বুনুনি ছিঁড়ে গিয়েছিল—বেত বদলাতে ২০ টাকা পড়ে গেল। এই নিয়ে তিনবার হলো।

আমি—যা করেছ করেছ, আর ওকাজ করো না। আমার মতন চেয়ারের বেত ছিঁড়লে কাঠের তখ্‌তা আঁটিয়ে নিও। তুমিও যেমন, কার জন্যে চেয়ারে বেতের ছাউনি? বেশির ভাগ লোক তো আসে সময় নষ্ট করবার জন্য নিজের গরজে। চেয়ারে ছারপোকা পুষতে চাও ত কাঠের চেয়ারেও যথেষ্ট ছারপোকা পাবে। বাপের গুরুঠাকুর কে এমন বাড়ীতে আসছেন—বা গণ্যমান্য কে বা তোমাকে ধন্য করতে আসছেন যে, বেত্রাসনের দরকার? তবু ত তুমি কোচ সোফা দিয়ে ঘর সাজাওনি—তা হলে মেরামতির খরচা ঢের বেশি পড়ে যেত। ঘনঘন মেরামত করতেও হতো। কুশাসনের যোগ্যেরাও বসে বসে কুশনাসনকে দুর্বল করে দিয়ে যেত। আর ছোট ছেলেরা ওর উপর উঠে নাচত। চাকরবাকর দুপুর বেলায় সোফায় শুয়ে তোফা নাক ডাকাতো। এক কাজ করো—একটা চৌকিতে একটা সতরঞ্চি ফরাস পেতে বাঙ্গালী মতে গোটাতিনেক মোটা বালিস রেখে দিও,—দেখো, কোটপ্যাণ্ট-পরা লোক ছাড়া কেউ আর চেয়ারে বসবে না। আমি ত চেয়ারে বসিই না—পাঁচ বছর বয়স থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত কাঠের বেঞ্চিতে প্রতিদিন বসেছি, তারপর ৬৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেঠো চেয়ারে বসে শিক্ষকতা করেছি। এখন বৃদ্ধ বয়সে আর বিছানা ছাড়া বসি না। বাড়ীর সবাই দিনে এক পুরু বিছানাতে বসে। রাতে দুই-পুরু বিছানায় শোয়।

ইন্দু—কুড়ি টাকায় একটা পুরু গালচে কিনে তখ্‌তাপোশে পাতলেই চলে।

আমি—তবু তো তুমি ভাড়া বাড়ীতে থাক। বাড়ী মেরামতের দায় থেকে রেহাই পেয়েছ। আমি তো বাড়ী ক'রে অবধি মেরামতি করতে করতে হয়রান হয়ে গেলাম। ছাদের জল পড়া বন্ধ করতে

যে খরচা পড়ল, তাতে নতুন ছাদ তৈরি করা চল্‌ত। তা ছাড়া, এখন তো আমাদের কলবলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। জলের কলের মিস্ত্রী একজন বাঁধাই আছে—সপ্তাহে একবার আসে। জল তোলার পাম্পের মেরামতি এক একবার ১৫০ টাকা, ২০০ টাকা পড়েছে। পাম্পটা ছিল বাইরের দিকে ছোট্ট একটা ঘরে। মধ্যে এ অঞ্চলে কেবলি পাম্প চুরি যাচ্ছিল। আমার পাম্পটাও চুরি করতে এসেছিলেন অগোচর নিশাচরেরা, অনেকটা খুলেও ফেলেছিলেন—এমন সময়ে পাশের বাড়ীর বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মারা গেলেন—সে বাড়ীর লোকেরা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। বাড়ীর সমস্ত আলো জ্বলে উঠল,—আমরাও জাগলাম, পালানোর ও প্রাচীর লঙ্ঘনের দুপদাপ শব্দ শুনলাম। গিয়ে দেখি প্রায় খুলে ফেলেছিলেন তাঁরা।

ভদ্রলোক জীবনে আমার খুব উপকারী লোক ছিলেন—মরণের মুহূর্তেও শেষ উপকার ক'রে গেলেন। যাই হোক, পরদিন মিস্ত্রী এসে কলটা খুলে বল্‌লে—চোরে কলটা একেবারে খারাপ ক'রে দিয়ে গিয়েছে! ভগবান বিশ্বকর্মাই জানেন—নিশাচর অতিথিরা সত্য-সত্যই কলটা খারাপ করেছিলেন কি না। সেটাকে নিরাপদ স্থলে সরাতে বহু টাকা ব্যয় হয়ে গেল। ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী তো কথায় কথায় ডাকতে হয়। তবু তো আমার মোটর নেই। কিনবার বা রাখবার খরচ করবার ক্ষমতাও নেই। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা যখন বলেন, 'মোটর কিনুন না দাদা, বুড়ো বয়সে এত কষ্ট ক'রে যাতায়াত কেন করেন?' তখন বলি, 'মোটর তো কিনতাম ভাই, মেরামতির খরচের ভয়ে কিনি না।' তারা বলে—'হ্যাঁ দাদা, ঠিকই বলেছেন, আমরা তো হয়রান হয়ে গেলাম। এর চেয়ে ট্যাক্‌সি ডাকা ঢের ভালো।'

প্রকাশকরা বলেন—'স্যার, এত কষ্ট ক'রে ট্রামে বাসে আসেন। একটা মোটর রাখুন না, স্যার।' আমি বলি—'আসা যে বৃথা তা জানি। তবে মোটর? তোমরা বকেয়া টাকাগুলো যদি দাও—

তবে মোটর কিনে মোটর চড়েই আসতে পারি তোমাদের ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ দিতে, কিন্তু ঐ 'যদির' নদীটা যে মাঝখানে পড়ছে। তাতে তো সাঁকো নেই।'

ইন্দু—ভাড়া-বাড়ীতে থাকি বলে মেরামতি খরচ নেই, তা ভাববেন না। পুরানো ভাড়ায় থাকি, তার উপর মেরামতির খরচ চাইতে ভয় করে। বাড়ীওয়ালাকে পুরানো ভাড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেও চাই না। গোপনেই মায় ছাদের দাগরাজি পর্যন্ত নিঃশব্দে করিয়ে নিই। আলো, বাতাস, জল—এ তিনের ব্যবস্থার তো কথাই নেই। কি ক'রে এ সবের সুব্যবস্থা করা হয় তা বাড়ীওয়ালা জানতেই পারে না।

আমি—দেখো, কতকগুলো মেরামতি আমরা নিজেরাই ক'রে নিতে পারি—যেমন ধরো ফিউজ তার বদলানো, ছুঁচসুতার মেরামতি, একটু তারের সাহায্যে ছাতা সারানো, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার চালিয়ে বা একটা কাঁটি ঠুকে কাঠে-কাঠে জোড় লাগানো, মাঝে মাঝে একটু আধটু দেওয়ালে কলি ফিরানো, সামান্য সিমেণ্ট বালির সাহায্যে ফাঁক বা ফাট বুজানো, আলমারি বা জানালার কাচ বদলানো, দেওয়ালের ক্ষত-চিকিৎসা, আসবাবপত্রের বার্নিস করা, মোটামুটি ধরনের কেতাব মেরামতি—এগুলো অনায়াসে আমরাই করতে পারি। শ্রীরামপুরের শাস্ত্রী ম'শায় নিজে মিস্ত্রীও ছিলেন—তিনি চণ্ডীপাঠও করতেন, জুতো মেরামতও করতেন—এজন্য কখনো মুচি ডাকতেন না। সকলপ্রকার মেরামতিতে তাঁর কেরামতি ছিল। সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ অধ্যাপক কেবল পুঁথি পড়তেন, পড়াতেন বা লিখতেন না। নিজেই দপ্তরীদের মতো পুঁথি বাঁধতেও পারতেন। অভ্যাস করলে আমরা মেরামতি বিদ্যাটার কতকটা আয়ত্ত ক'রে মেরামতির খরচ বাঁচাতে পারি।

ইন্দু—নাগরিক জীবনেই মেরামতির উপদ্রবটা বেশি—পল্লী-জীবনে এত হাঙ্গামা নেই।

আমি—বলো কি ইন্দু? পল্লীজীবনের পরিসরটা ছোট, কিন্তু মেরামতি দরকার হয় তার সবটুকুরই। পল্লীবাসীদের মেরামতি কাজটা বাৎসরিক পর্ববিশেষ। সাধারণতঃ সেটা পূজার আগে। বর্ষায় ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মাটির প্রাচীর ভেঙ্গে যায়। ঘরের মাটির ধারি-পৈঠা ধ্বসে যায়। জলের ছাটে ঘরের দেওয়াল ক্ষয় পেয়ে যায়, প্রতি বছর চালে গোঁজা দিতে হয় কিংবা নতুন ক'রে চাল ছাওয়ার দরকার হয়। শুধু বৃষ্টির আঘাতে নয়—চালচারী লাঙ্গুলী-মশায়দের লম্ফেঝম্পে ঘরের চাল বিধ্বস্ত হয়। গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া হয় না—কিন্তু শহরে থেকেই যাতে বাড়ীঘর ভূমিসাৎ না হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। বেশ মোটা রকমের খরচের বিল আসে।

চাষের যন্ত্রপাতিরও মেরামতের প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে প্রয়োজন হয় জমি মেরামতের। জমির আল বাঁধা, নালী কাটা, আগাছা মারা, পাঁক মাটি ও সার দেওয়া ইত্যাদির দ্বারা জমি মেরামত করতে হয়। জমিতে নতুন জীবনী শক্তি সঞ্চার না করলে ফলন কমে যায়। পল্লীমুলুকের যে মেরামতি তা পল্লীবাসীরা নিজেরাই করে। সেখানে আমাদের মতো অক্ষম গৃহস্থদেরই কেবল শ্রমিকের সাহায্য নিতে হয়।

ইন্দু—আমার ও হাঙ্গামা নেই—পদ্মা মা দেশের বাড়ীঘর গ্রাস করেছেন। জলসাৎ না হলেও আজ তা ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভস্মসাৎ অথবা পরসাৎ হতো। যাক (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) আমি বলি, নাগরিক অঞ্চলে এজন্য একটা 'জীর্ণ সংস্কার-সাধন-শিল্প প্রতিষ্ঠান' খোলা উচিত। তাতে ঘড়ি সারানো, সাইকেল সারানো, বই বাঁধানো, রাংঝাল দেওয়া, ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর কাজ ইত্যাদি সর্বপ্রকার মেরামতির কাজ শেখানো হবে। প্রত্যেক ছাত্রই সবগুলি সংস্কার-বিদ্যাই শিখে আসবে।

আমি—আমাদের ছেলেরা কলেজে না গিয়ে সেখানে মেরামতি শিখতে যাবে বাড়ীর মেরামতির খরচ বাঁচাবার জন্য?

ইন্দু—না, যারা মেরামতির কাজকে জীবিকা ক'রে তুলবে, তারা যাবে।

আমি—তাতে জীবিকার সংস্থান হবে না। এটা হলো বিশেষজ্ঞের প্রতিপত্তির যুগ—এ যুগে জ্যাক-অব-অলট্রেডসের অম্‌নিবাস শিক্ষায় সুবিধা হবে না। লোকে যাকে রাংঝাল দিতে দেখবে, তাকে কখনো ঘড়ি সারাতে বা শাল মেরামত করতে দেবে না। শরীর মেরামতের কথাই ধরো—যে চোখের মেরামতি জানে, তার কাছে কেউ দাঁতের মেরামতির জন্য যায় না, যে কণ্ঠনালীর মেরামতি জানে—তার কাছে রক্তের চাপের মেরামতির জন্য কেউ যায় না। বিশেষজ্ঞতার মূল্য দিতেই হয়। সেজন্য শরীর মেরামতের খরচ সবচেয়ে বেশি। তাই একটা বড় অসুখ হলে জনপাঁচেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়। চিকিৎসাটা এখন সমবায়মূলক।

ইন্দু—হ্যাঁ তাই তো, চিকিৎসাও তো একরূপ মেরামতি। এই শরীর মেরামতির খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বাবার আসল দাঁতের মেরামতির চেয়ে তাঁর বাঁধা দাঁতের মেরামতিতেই খরচ বেশি পড়ে যাচ্ছে। পানিবসন্ত কি ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেও একশো টাকা খরচ হয়ে যায়।

আমি—এর চেয়েও ব্যয়সাধ্য এখন সন্তানের শিক্ষা মেরামতি। শরীর মেরামতির খরচ সাময়িক, শিক্ষা মেরামতির খরচ মাসিক। স্কুল কলেজে যেটুকু তাদের শিক্ষা হয়, তার মেরামতি না হলে তাদের পাস করা কঠিন। এজন্য বিবিধ বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞদের (অর্থাৎ প্রাইভেট টিউটারদের) মোটা মাইনে দিতে হয় মাসে মাসে বছর ধরে। এর জন্য পাড়ায় পাড়ায় পৃথক কারখানাও আছে। যেমন শরীরমেরামতের কারখানা হাসপাতাল, শিক্ষামেরামতের কারখানা তেমনি কোচিং ক্লাস বা টিউটোরিয়াল হোম। এখানে রাংঝাল দিয়ে বিদ্যার ঘটে ছিদ্র বোজানো হয়—তাতে কিছুকাল অর্থাৎ পরীক্ষার ঘটোৎসর্গ পর্যন্ত চলে যায়।

দেখ, আমাদের দেশে যত লেখা বেরোয়, সেগুলোর অধিকাংশেরই মেরামতের প্রয়োজন। এজন্য একটা কারখানা থাকলে ভালো হ'ত। তাতে নানা বিদ্যার ওস্তাদ মিস্ত্রীদের মাইনে দিয়ে রাখলে সুসঙ্গত হয়। তাঁরা মেরামত ক'রে দিলে তবে লেখা ছাপার যোগ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত।

ইন্দু—সাময়িকপত্রে যে সব লেখা বেরোয় সেগুলোর জন্য তো এডিটারই আছেন।

আমি—তাঁর দ্বারা মেরামতির কাজ হলে তো কথাই ছিল না। সে বিষয়ে আমার পক্ষে নীরব থাকাই নিরাপদ। লেখকদের উচিত কিছু ব্যয় ক'রে অন্যের দ্বারা লেখা মেরামত করিয়ে নেওয়া। প্রথম শ্রেণীর লেখকদের লেখারও মেরামতির প্রয়োজন হতে পারে। তবে তিনি নিজেই সে মেরামতি করতে পারেন। কিন্তু প্রকাশকের বা সম্পাদকের এমন তাগিদ থাকে যে, লেখকদের তাও করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ লেখকেরই লেখার অল্পবিস্তর মেরামতির প্রয়োজন।

প্রত্যেক লেখকের বই-এর প্রতি সংস্করণে মেরামতির কাজ করা উচিত। এইরূপ মেরামতির ফলে রচনা ক্রমে সুস্থ সবল ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর হতে পারে। বিনা ব্যয়ে যে মেরামতি হতে পারে তাই অথবা নিজে নিজেই যতটা করা যায় তাই বা ক-জন ক'রে থাকেন!

ইন্দু—বিনা ব্যয়ে কোন্ মেরামতি হতে পারে?

আমি—কেন অভ্যাসের মেরামতি, চরিত্রের মেরামতি? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—যার হাতের লেখা অস্পষ্ট বা কদর্য সে কি চেষ্টা করলে হাতের লেখার মেরামত করতে পারে না? যার উচ্চারণ জড়তাগ্রস্ত বা শ্রুতিপীড়ক, মাধুর্যহীন, সে কি তার মেরামত করতে পারে না? যে কেবলি বাজে বকে, অন্য কাউকে কথা বলতে দেয় না, যে কেবল আত্মগুণগান করে, যে অবিরত পরনিন্দা করে, যে এলোমেলো কথা বলে, যে কুতর্ক করে, সে কি নিজের রসনার মেরামত করতে পারে না? অবশ্য তার যে অভ্যাসের মেরামতির দরকার আছে, একথা

তাকে মাঝে মাঝে শোনানো উচিত, নতুবা তার খেয়ালই হয় না। একাজে তথাকথিত সৌজন্যই বাধা দেয়।

চরিত্রের দোষত্রুটি অনেকেরই আছে, চরিত্র মেরামত লোকে নিজেরাই করতে পারে।

যেমন—লোকে চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, স্বাবলম্বী, শৃঙ্খলানিষ্ঠ, সময়ানুবর্তী, সংযতবাক, মিতাচারী, প্রতিশ্রুতি-পালক, সদাচারী, জ্ঞানানুরাগী, অনুদ্ধত ইত্যাদি হয়ে কি উঠতে পারে না? দৃঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা এইভাবে আপন আপন চরিত্রের মেরামত করতে হয়।

কি ব্যক্তি, কি বস্তু, কি জাতি, কি প্রতিষ্ঠান, কি শিক্ষাপদ্ধতি, কি পাঠন-পদ্ধতি, কি পাঠ্যসূচী বা পাঠক্রম সব কিছুকেই কাল জীর্ণ করে—কাজেই মেরামতি সবেরই দরকার। কালক্রমে সমস্তেরই জীবনীশক্তি হ্রাস পায়,—নব জীবনীশক্তি-সঞ্চারের নামই মেরামতি। কোন প্রতিষ্ঠান গতানুগতিকভাবে চললে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তার সুসঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থাকে না—কাজেই তার মেরামতির প্রয়োজন। জাতির সম্বন্ধেও এই কথা।

আমাদের সবচেয়ে পরিচিত জাতি ইংরেজ জাতি। এ জাতি ফরাসী বা রুশের মতো ভেঙ্গে গড়া জাতি নয়—ঘনঘন মেরামত করা জাতি। ওস্তাদী মেরামতির গুণে এ জাতি আজও সবল সুস্থ ও পরাক্রান্ত। ইংলণ্ডের ইতিহাস আগাগোড়া মেরামতিরই ইতিহাস।

একখানি পোস্ট-কার্ড

অনেকদিন আগের কথা। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল রমানাথবাবুর সঙ্গে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল। তিনি আমার প্রবাসীতে প্রকাশিত একটা লেখার সুখ্যাতি ক'রে আমাকে একখানা পোঃ কাঃ আমার ইস্কুলের ঠিকানায় লেখেন। গণিতে এম-এ উকিল মানুষ পোস্ট-কার্ডেই বেশ যুক্তি দেখিয়েই বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, আমি কার্ডটা পেয়ে বিস্মিত হ'লাম—লেখা ভালো লেগেছে একথা জানিয়ে কই অযাচিতভাবে কেউত কখনো চিঠি দেয়নি—বিশেষতঃ প্রায় অপরিচিত গণ্যমান্য উকিলে। পরদিন প্রাতে একখানা বইয়ে উপহার লিখে নিয়ে গেলাম তাঁর বাড়ীতে, আমিও যেমন অবাক হয়েছিলাম তাঁর চিঠি পেয়ে, তিনিও তেমনি অবাক হয়ে গেলেন আমার উপহার পেয়ে এবং আমাকে বাড়ীতে পেয়ে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে শতশত ধন্যবাদ দিলেন। অপ্রত্যাশিতের আনন্দ দুজনেরই।

আমি বললাম—আমার লেখা কেউ পড়ে কিনা তা জানতেও পারি না, দেখা হলেও কেউ বড় একটা লেখার কথা তোলে না—যদি কেউ তোলে তবে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায়। সৌজন্যপ্রকাশের জন্য কেউ কেউ দু'একটা লেখার কথা স্মরণ করতে এবং তার পরিচয় দিতে যে প্রকার প্রচণ্ড প্রয়াস ও আকুলিবিকুলি করে, তা দেখলে দুঃখ হয়, করুণা হয়। এ রকম ব্যতিক্রম তো ঘটে না। রসজ্ঞ পাঠক যদি পাই, তা হলে সব বই-ই উপহার দিতে পারি, বই উপহার দিলে শতকরা নব্বইজনই পড়ে না। সেজন্য বই কাকেও উপহার দিই না। আপনি যে পড়বেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি বলেই বই উপহার দিলাম।

রমানাথবাবু বইখানাকে মাথায় ছোঁয়ায়ে বললেন—দেখুন, আমাদের কথাবার্তা বা আচরণের মূলে কোন চিন্তা থাকে না।

আমাদের স্বভাবকে আমরা ইচ্ছামত চলতে দিই—বুদ্ধির বল্‌গা দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত করি না। সেজন্য আমাদের কথায়, বাক্যালাপে ও আচরণে সতর্কতা, বুদ্ধির দীপ্তি ও আন্তরিক সৌজন্য থাকে না। আর একটা কথা, আমরা মানুষের প্রীতি ভালবাসা অর্জনকে স্পৃহণীয় মনে করি না—ইষ্ট জনের সংখ্যাও বাড়াতে চাই না। কত সামান্যে একেবারে—বিনা খরচায়, আমরা যে কতটা প্রীতি, সুনাম ও জনবল্লভতা লাভ করতে পারি, তা কখনো চিন্তা করি না। স্বভাবের অনুগামী হয়ে চললে জনাদর পাওয়া যায় না—স্বভাবকে একটু চিন্তা করে শাসন করে চালাতে হয়। দৃষ্টান্ত তো দেখছেন—একখানা পোস্ট-কার্ড আপনার মতো একজনকে হৃদয়ের কতটা নিকটে নিয়ে এলো—এটা কি আমার পরম লাভ নয়? আপনাকে চিরদিনের বন্ধুরূপে পেলাম তিনটা নয়া পয়সা খরচ করে। আমার জীবনের দুচারটা দৃষ্টান্ত আপনাকে জানাই।

শ্যামবাজার থেকে ফিরছি—ঠনঠনের কালীবাড়ীর কাছে এসে মনে হ'ল—আমাদের পণ্ডিত ম'শায়ের ছেলে জীবন, শঙ্কর ঘোষের লেনে থাকে। বাড়ীটা চিনতাম, তার বোনের বিয়েতে পাঁচ মিনিটের জন্য এসে তাকে ধন্য করেছিলাম। গাড়ীটাকে গলির মধ্যে নিয়ে গিয়ে বাড়ীর দরজায় থামাতেই বাড়ীতে হৈচৈ কাণ্ড! ছুটে এলো ছেলে-পুলে, জীবনের স্ত্রী রান্নাঘর থেকে হাতা হাতেই ছুটে এলো ঘোমটা টেনে। জীবন বাড়ীতে ছিল না। আমি বড় মেয়েটাকে বললাম, জীবন যখন বাড়ীতে নেই তখন আর নাম্‌ব না। তোমরা কেমন আছ জানতে এলাম। জীবনকে বোলো আমি এসেছিলাম। সব ভালো ত? বড় মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। পরদিন সকালে জীবন আমার বাড়ীতে এসে হাজির। সে কৃতজ্ঞতায় একেবারে বিগলিত। যেন কত বড় একটা উপকার করেছি—যেন তার চৌদ্দপুরুষকে ধন্য করেছি!

জীবন বললে, গাঁয়ের বহু লোক, বাবার বহু ছাত্র, কলকাতায়

আছেন, কেউ কোনদিন আমার খোঁজ নেন নি, কত বিপদ-আপদ গেছে। দাদা, আপনি নিজে কষ্ট করে গরিবের কুটিরে—বলেই কেঁদে ফেলল। ভাবলাম—হায়, এরা কত সামান্যে পরিতুষ্ট। কত সামান্য এদের প্রত্যাশা—তাও আমরা মিটাই না। আধ ছটাক তেলও আমার পোড়েনি—অথচ সমস্ত পরিবারের হৃদয় জয় করলাম। আমরা কি মূঢ় ? এইখানেই আমার হৃদয়চৈতন্যের প্রথম উদ্বোধন।

আর একদিনের কথা বলি—সে দিন কলেজ ষ্ট্রীট থেকে আসছি, আমাদের এক জুনিয়ার উকিলের বৃদ্ধ শিক্ষক-পিতা চলেছেন দেখলাম। গাড়ী থামিয়ে বললাম, 'স্যার, বাড়ী যাবেন ? আসুন।'

তিনি চম্‌কে উঠে বললেন—না বাবা, আমার কাজ আছে বৌবাজারে। তুমি—তুমি—আপনি—

আমি বললাম—বৃষ্টি আসছে। সত্বর কাজ শেষ হলে আমি অপেক্ষা করতে পারি। তিনি বললেন—'না বাবা দেরি হবে, আপনি যান। ধন্যবাদ—ধন্যবাদ কেন আমার আশীর্বাদ,—আর কিছু বলতে পারলেন না, কণ্ঠরোধ হয়ে গেল।

পরদিন হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরিতে হৈচৈ কাণ্ড। জুনিয়ার উকিলটি আমার সৌজন্যের কথা সগৌরবে ঘোষণা করছে। কত বড় মহানুভবতার কাজই না করেছি গাড়ীতে বসে দুটো কথা ব'লে। সাধুবাদে হল হ'ল মুখরিত। কত সামান্যে আদর্শ সজ্জন হয়ে গেলাম।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ে গৃহিণীকে বললাম, খান চার-পাঁচ পোস্ট-কার্ড আমাকে দিতে পার ? গৃহিণী কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে বললাম—হেমন্তর ছেলেটির টাইফয়েড চলছে শুনেছি, একখানা পোঃ কাঃ লিখে খোঁজ নেব। গৃহিণী বললেন—তার অসুখ তো সেরে গেছে। আমি বললাম—

—তবু একখানা আনন্দ প্রকাশ করে লিখি। অশ্বিনীর ছেলে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে—তাকে অভিনন্দন করে একখানা

আশীর্বাদী পাঠাব। অরবিন্দের মেয়ের বিয়ের চিঠি এসেছে গয়া থেকে। বর-কনেকে একটা আশীর্বাদ পাঠাব—লৌকিকতা পাঠাতে নিষেধ করেছে—তার দরকার নেই। অবনী মেয়ের একটা পাত্রের খোঁজ চেয়েছে—একটা পাত্রের খোঁজ দাও না, লিখে দিই।

গৃহিণী বললেন—তোমার হ'ল কি? আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তোমার তো কোন সম্বন্ধ নেই—মক্কেলরা তাদের চেয়ে তোমার বেশি আপন। আত্মীয়দের সঙ্গে আমিই তো আজো সম্পর্ক রেখেছি। আজ হঠাৎ এ সুমতি কেন? পাত্রের খোঁজ চেয়েছেন অবনী ঠাকুরপো—তাঁর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—কামারবাড়ী দইয়ের ফরমাস। আজো নিজের মেয়ের জন্য একটা পাত্রের সন্ধান করতে পারলে না। লিখে দাও পাড়ার রোহিণীবাবুর ছেলের কথা। বিধুর সহপাঠী সে।

যাই হোক, একখানা পোঃ কাঃ অসাধ্য সাধন করল। পত্রপাঠ অবনী চলে এলো। শেষ পর্যন্ত ঐ পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হ'ল। অবনী তো সেই থেকেই আমাকে ত্রাণকর্তা বলে পূজো করে। রোহিণীও কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ। বলে,—এমন ভালো বৌ বুঝি তপস্যা না করলে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কি সজ্জন কুটুম্ব!

অরবিন্দের মেয়ের বিয়ের তিন লাইন আশীর্বাদ অনেকের আশীর্বাদের সঙ্গে পুস্তিকায় ছাপা হয়ে ফিরে এলো। হেমন্ত ছেলের রোগের চার পাতা বর্ণনার পর লিখল—কেবলমাত্র আমার আশীর্বাদেই ছেলেটি এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। অশ্বিনীর ছেলে যে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে তাও আমার আশীর্বাদেই পেয়েছে, সে কথা জানতে পারলাম তার চিঠিতে। এরপর দেরাজে অনেকগুলি করে খাম পোস্টকার্ড রাখি—রবিবারের দিন ভেবে ভেবে অকারণে সকারণে লিখে নানাস্থানে পাঠাই। দশ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। তারি একখানা আপনি পেয়েছেন। সভাসমিতির পক্ষ থেকে ছাপা চিঠি এলেও না যেতে পারলে একখানা পোঃ কাঃ

লিখি, দূরবর্তী স্থলের নিমন্ত্রণপত্র এলে একখানা পোঃ কাঃ লিখে একটা জবাব দিই, দু এক লাইন লিখে। হাতের কাছে পোঃ কাঃ থাকলে সৌজন্য প্রকাশের কোন অসুবিধাই হয় না।

যাই হোক—আমার মতো এমন সকলেরই শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই এ সুনামটা রটেছে পোস্ট কার্ডের সাহায্যে। আমার ভায়রাভাই থাকেন পশ্চিমে—কলকাতায় এসে দেখা করতে এলেন—জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—তোমার বড় ছেলের বিয়ে দিচ্ছ কবে? বড় মেয়ের পাত্রের সন্ধান করছ? মেজো ছেলের কোন্ ইয়ার এবার? ছোটটির এবার কোন পরীক্ষা? একজনেরও নাম করলেন না। তারপর তারা যখন এসে একে একে প্রণাম করল—তখন সবাইকে নাম ধরে ডাকলেন। গৃহিণীকে বললাম—সুধীর দাদা ছেলেমেয়েদের নাম ভুলে গিয়েছিলেন—তাদের দেখে তাঁর নামগুলো মনে পড়ল। কি ভুলো মানুষ! আমি একটু ব্যথাই পেয়েছিলাম। গৃহিণী বললেন—না গো কর্তা, কাল দিদি যখন এসেছিল—তখন তুমি তার একটি ছেলেমেয়েরও নাম করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলে না—বড় ছেলে, মেজো ছেলে, ছোট মেয়ে, বড় মেয়ে বলে তাদের খোঁজ নিলে, কিন্তু মন দিয়ে শুনলে না। আমার লজ্জা করতে লাগল। দিদি গিয়ে নিশ্চয়ই জামাইবাবুকে বলেছে। জামাইবাবু তার শোধ দিয়ে গেলেন। তুমিই কারো নাম মনে রাখ না। আমার ভাইপো ভাইঝি, বোনপো বোনঝিদের নাম না হয় নাই মনে রাখলে, নিজের বংশের কটা ছেলেমেয়ের নামও মনে রাখতে পার না? আইন মনে রাখ কি করে? সেইদিনই নোটবুকে পিতৃকুল মাতৃকুলের—এমনকি গৃহিণীর পিতৃকুল মাতৃকুলের সব ছেলেমেয়ের নাম লিখে নিয়ে মুখস্থ করে ফেললাম। কি অন্যায়! সন্তানস্থানীয় ছেলেমেয়েদের নামগুলো মনে রাখা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা কোনদিন ভাবিনি।

আমি বললাম—জানেন, আমাকে উপর ক্লাসের অন্তত তিনশো

ছেলের নাম মনে রাখতে হয়। ছাত্রদের নাম ধরে না ডাকলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধটা প্রতিষ্ঠিতই হয় না। ইউরোপে নম্বর ৪৫ কি ৪৬ বলে ডাক দিলে জবাব পাওয়া যেতে পারে। নাম ধরে না ডাকলে যতই লেকচার দেওয়া যাক—তাতে শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসা পাওয়া যায় না।

রমানাথবাবু বললেন—তাই বোধ হয় আত্মীয়দের ছেলেরা কাকা, জ্যাঠা, মামা, মেসো বলে ডাকত না কখনও। আত্মীয়ারা আসে যায় ছেলেপুলে নিয়ে, একদিন গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এঁরা কারা এসেছিলেন। গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বললেন—আমার বোন বা ভ্রাতৃবধূ ওরা নয়, মশায়েরই আপনার লোক ওরা, মশায়েরই মামাতো ভায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ওরা। তারপর থেকে আত্মীয়ারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলে তাদের ডেকে নাম জিজ্ঞাসা করি, কারো মাথায় হাত দিই, কারো গালে হাত দিই। পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করি। তারাও সাহস করে জিজ্ঞাসা করে, জ্যাঠামশায়, কি মেসোমশায়, কি মামাবাবু আপনি কেমন আছেন? তাদের মুখে ঐ প্রশ্ন শুনতে আমায় খুবই ভাল লাগে এখন।

গৃহিণীকে ডেকে বলি, এদের কিছু কিছু খাবার আনিয়ে দাও। গৃহিণী বলেন—আহা ভাগ্যে তুমি শিখিয়ে দিলে!

সকলের প্রীতিলাভে একটা মধুর আনন্দ আছে—অথচ এজন্য কোন ব্যয় নেই—শুধু উপেক্ষা না করা, দুটো মুখের মিষ্টি কথা! ব্যাস! কি করে প্রীতিলাভ করা হয় সে চিন্তা দিনে দশ মিনিটও আমরা করি না। এ চিন্তা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়। স্বভাবতঃ বিদ্যা, অর্থ, আভিজাত্য, পদমর্যাদা আমাদের মনে দম্ভের সৃষ্টি করে। এ দম্ভটা আমাদের দেহের যকৃৎ ফুসফুস ইত্যাদির মতো এমনভাবে অঙ্গীভূত হয়ে আছে যে তার অস্তিত্ব আমরা অনুভবই করি না। তার বিকৃতি ঘটলেই অর্থাৎ দম্ভটা আঘাত পেলেই তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। এই অযত্নসম্ভূত দম্ভের স্তম্ভটাকে চূর্ণ করার জন্য চাই বুদ্ধির মুষল।

আমি দেখেছি—চরিত্রহীন, সুরাপায়ী, ঘুষখোর লোকের উপর লোকে সহজে বিরূপ হয় না। কিন্তু খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, গুণী ব্যক্তি, কৃতী পুরুষ ও নমস্য ব্যক্তিও যদি দাম্ভিক হয়, অথবা সকলের সম্বন্ধে উদাসীন থাকে, তা হলে সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে। নিতান্ত প্রাণের দায় না হলে তার ছায়াও মাড়ায় না। প্রচুর অর্থব্যয় করলেও আত্মাভিমানী লোক কখনও জনবল্লভ হয় না।

'অমানিনে মানদঃ' হওয়া বৈষ্ণবতার লক্ষণ। আমি কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলছি না। লৌকিক ও ব্যাবহারিক জীবনের কথাই বলছি। অমানিনে মানদঃ হওয়ার প্রয়োজন খুব বেশি, সমাজে শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবার জন্য। প্রার্থীর প্রার্থনা আমরা সব সময়ে পূরণ করতে পারি না। কিন্তু মিষ্টশিষ্ট যুক্তিপূর্ণ কথায় তাদের তুষ্ট করতে পারি। সহি-সুপারিশে কোন ব্যয় নেই। কোন প্রত্যাশা না করেও সহি-সুপারিশ অনেক ক্ষেত্রেই করা যায়—দশটার মধ্যে দুটাতেও কাজ হয়। যারা সহি-সুপারিশ চায়—তারা আমার কাছে কাজ চায় না—তারা চায় দু-চার লাইনের সহায়তা। তারা তা বলবামাত্র পায়—নিতান্ত অবুঝ না হলে তাতেই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। এভাবে কত লোকের যে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। স্বভাবতঃ আমরা সৎ, মহৎ, নিরভিমান ও উদার নই; অর্থ ও তথাকথিত বিদ্যা আমাদের উদ্ধত করে তোলে—বুদ্ধির সাহায্যে উদারতা, বিনয় ইত্যাদির অনুশীলন—এমন কি তার অভিনয় করতে করতে আমরা সজ্জন হয়ে উঠতে পারি, অবশ্য সজ্জনতার কোন মূল্য আছে তা যদি স্বীকার করা হয় তবেই।

আমি রমানাথবাবুর কথাগুলি শুনে তাঁর দিকে আরও আকৃষ্ট হলাম। একখানি পোস্টকার্ডের সেতু কত যে মজবুত হতে পারে তারই দৃষ্টান্ত দিলাম।

স্বজন-সংগতি

সংসার বিষবৃক্ষের দুটি অমৃতময় ফলের মধ্যে সজ্জন-সংগতি একটি কিন্তু সজ্জন তো দুর্লভ। শুধু সজ্জন পেলেই তো হয় না, তাঁর কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য ঘটা চাই—কাছাকাছি থাকলেও তাঁর সঙ্গ দেওয়ার অবসর থাকা চাই, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটা চাই। নানা কারণে সজ্জন-সংগতি ভাগ্যে ঘটে না।

অনেকে বলেন—সজ্জন-সংগতির অনুকল্প হ'ল স্বজনসংগতি। স্বজন বলতে আমি বুঝি—আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব ও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত লোক। কিন্তু নানা কারণে স্বজন-সংগতিও দুর্লভ হয়ে ওঠে, স্বজনদের সঙ্গও এড়িয়েও চলতে হয়। ফলে, জনারণ্যে বাস করেও অনেক ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়।

যারা ঈর্ষাপরায়ণ বা দাম্ভিক তাদের সঙ্গ সর্বাগ্রে এড়াতে হয়। অপরিচিত লোক কখনও ঈর্ষা করে না, ঈর্ষা করে স্বজনই। একদিকে বঞ্চিত ও অল্পবিত্তদের ঈর্ষা, অন্যদিকে সঞ্চিতধনের মালিকদের দম্ভ, দুই-এর মাঝে পড়ে স্বজন-সংগতি দুর্লভ হয়ে পড়ে। দম্ভ প্রকাশও অপরিচিতের মধ্যে চলে না, আত্মীয়বান্ধবদের সঙ্গে আচরণেই দাম্ভিকতার সার্থকতা। ঈর্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা।

কাজেই নিতান্ত গরজ না হলে ঐ শ্রেণীর স্বজনদের সঙ্গ কে চায়?

বহু ছোট ছোট কারণেও আমরা স্বজনসঙ্গ এড়িয়ে চলি। যে লোক প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কেবল মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা জাঁক করে, তার সঙ্গ আমরা চাই না। দেখা হলেই কেউ কেউ পরনিন্দা সুরু ক'রে দেয়, ইতর লোকের তা মুখরোচক হ'তে পারে, শিষ্ট লোকেদের তা মিষ্ট লাগে না। শিষ্ট লোকেরা তাদের সঙ্গ চায় না। স্বজন হলেও যে কথাবার্তায় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে, অথবা কুরুচিপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করে, যে ইতর রসিকতায় আনন্দ পায়,

তার সঙ্গ আমরা চাই না। তোৎলা লোকের সঙ্গ কারো ভাল লাগে না—মনে হয় কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে, তাতে শ্রোতার মনে অস্বস্তি জন্মে। বধিরের সাহচর্যে আমরা অধীর হয়ে পড়ি। তার সঙ্গে কথোপকথন বড়ই ক্লেশকর। কতক্ষণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলা যায়? পরম স্নেহময় জলধর দাদার সঙ্গও এড়িয়ে চলতে হ'ত।

এমন লোকও আছে যে, থেমে থেমে এক একটি কথা ছাড়ে—একটা বাক্য শেষ করতে এক মিনিট লাগায়—এরূপ লোকের সঙ্গ আমরা সইতে পারি না। আবার কেউ কেউ এত আস্তে কথা বলে যে, কাছে ঘেঁসে কান খাড়া করে বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা করতে হয়—এরূপ লোকের কাছে সহজে আমরা যাই না।

কেউ কেউ দেখি সব সময়ই অন্যমনস্ক, তাঁরই প্রশ্নের উত্তরে যিনি কথা বলছেন, তাঁকে এমন একটা কথা শ্রোতা শোনান, যাতে বেশ বোঝা যায়, শ্রোতা একবর্ণও শোনেনি, নিজের বিষয়কর্মের কথাই ভাবছিলেন। এরূপ লোকের সঙ্গ অসহ্য নয় কি?

যে লোকের কণ্ঠস্বর অতি কর্কশ, যে লোক না চেঁচিয়ে কথা বলতে পারে না, বাক্যে যার বিন্দুমাত্র মাধুর্য নেই, যে ব্যক্তি হাসলে অট্টহাস্য করে, তাদের সঙ্গও প্রীতিকর নয়।

স্পষ্ট বক্তার অভিনয় ক'রে যে কেবলি অপ্রিয় কথা বলে, মনে আঘাত দিয়ে কথা বলাই যার স্বভাব, তার সঙ্গ লাভে কেউই আনন্দ পায় না।

কোন সৎপ্রসঙ্গ উঠলে বা কোন চিন্তাগর্ভ বিষয়ের আলোচনা সুরু হলে যে অকিঞ্চিৎকর প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রে বাক্যালাপের মর্যাদা নষ্ট করে, রসভঙ্গ ঘটায়, আলোচনার সূত্র ছিন্ন ক'রে দেয়, তার সঙ্গ সভ্য লোকে পছন্দ করে না।

এমন স্বজনও কেউ কেউ আছে, যাদের স্বভাব প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করা এবং কথায় কথায় তর্ক বাধানো, তাদের সঙ্গও প্রীতিকর নয়।

আস্ফালন, বিকত্থন এবং স্বকীর্তিকীর্তন ছাড়া যাঁদের বক্তব্য নেই—দূর থেকে তাঁদের নমস্কার জানাতে হয়। পক্ষান্তরে যারা কারো সঙ্গে দেখা হ'লেই কেবল কাঁদুনি গায়, হা-হুতাশ করে, খেদ-আক্ষেপ শোচনা ছাড়া যাদের আলাপনের অন্য কোন সম্বল নেই—তারাও সঙ্গসুখ দিতে পারে না।

যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও অভিমানী অথবা অল্পেই যার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে এত সতর্ক হয়ে কথা বলতে হয় যে, তার সাহচর্যে অস্বস্তি অনুভব করতে হয়।

ধনে মানে পদগৌরবে যশ প্রতিষ্ঠায় যেসব স্বজন গণ্যমান্য হয়ে উঠেছেন, তাঁরা যদি নিরবচ্ছিন্ন নির্জল্য তোষামোদ চান, তবে নেহাৎ দায়ে না পড়লে তাঁদের সঙ্গ আমরা পরিহার করি।

যে রসিকতা বোঝে না, কৌতুককথায় যার হাসি পায় না, হাস্য পরিহাসে যে যোগ দেয় না, সব সময়ই খুব সিরিয়াস, এরূপ সাংঘাতিক লোকের সঙ্গ রসিক লোকে তো চায়ই না—সাধারণ লোকও এড়িয়ে চলে।

এমন অধীর প্রকৃতির স্বজন অনেক আছে যারা অন্যের বক্তব্য এমনকি বাক্যও শেষ হতে দেয় না, বাক্যের মাঝখানে বাধা দিয়ে নিজের কথা বলতে থাকে, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ চালানো কঠিন—কাজেই তাদের সঙ্গ আমরা এড়িয়ে চলি।

পাঁচজনের মজলিসে অন্য কাউকে কথা বলতে না দিয়ে সারাক্ষণ নিজের রসনার নরীনৃত্য চালিয়ে যান এমন লোকও আছেন। ঐরূপ মজলিসে বক্তার ভক্তরূপে যোগ দেওয়া যায়, বন্ধুভাবে যোগ দেওয়া চলে না।

অনেক লোকের দেখি, তাদের আফিস আদালত বা কাজ-কারবারের কথা ছাড়া কিছুই বক্তব্য থাকে না। আবার অনেকে নিজেদের পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে নিজেরা আনন্দ পান, কিন্তু অন্যের কান ঝালাপালা করে দেন।

'বাড়ীর সব কুশল তো?' জিজ্ঞাসা করলে যিনি পরিবারের প্রত্যেক পরিজনের ছয় মাসের স্বাস্থ্য রিপোর্ট পেশ না করে ছাড়েন না, তাঁকে ভয় করে সরে পড়তে হয়।

তুচ্ছ কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলা যেমন অনেকের স্বভাব তেমনি আবার অনেকে এমনি মিতভাষী যে, পাঁচ মিনিটে একটি করে বাক্য তাঁদের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়। বাচাল ও বাক্যকুণ্ঠ দুই-ই বর্জনীয়। বৃদ্ধদের সঙ্গ কেউই চায় না। তাঁদের সাহচর্যে অনেক কিছু শেখা যায় বটে, কিন্তু তাঁরা এক একটি Ancient Mariner, বক্তব্য তাঁদের শেষ হয় না, উপদেশ-ধারা বিরত হয় না। তাঁদের শীর্ণ হাতের কবজির জোর কিন্তু কম নয়—সেজন্য তাঁদের হাতে ধরা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যারা বাক্যালাপে যুক্তিপথ অনুসরণ করে না—যাদের কথাবার্তা এলোমেলো, যারা বাজারে বেগুনের দাম থেকে সুরু ক'রে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদে গিয়ে পৌঁছায়, বিতর্কে যাদের গলায় জোরটাই প্রধান যুক্তি—তাদের দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ। সিনিক, পেসিমিষ্ট, ফাজিল, ছ্যাবলা, তোষামুদে, অতিরিক্ত স্বার্থপর, রগচটা লোকের সঙ্গ কখনো প্রীতিকর হতে পারে না।

ঐহিকতায় যত বড় মানুষই হোক যার আওতায় অন্তরের ব্রহ্ম সংকুচিত হয়ে পড়ে—বিবেকানন্দ স্বামী তার কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। স্বামীজি দাসমনোভাবের কথাই বলেছেন। ভক্ত-মনোভাবের কথা বলেননি। আধ্যাত্মিকতায় যিনি বড় তাঁর সংসর্গে অন্তরের ব্রহ্ম প্রসারিতই হয়। কিন্তু সে মানুষ তো কোটিকে গোটিক।

স্বজনগণের মধ্যে পরিজন যারা, তারা তো এযুগে ছত্রভঙ্গ, একান্নবর্তিতা ভেঙে যাওয়ার জন্য কিংবা জীবিকার তাড়নায় স্থানান্তরে বাস করতে বাধ্য হওয়ার জন্য। একত্রে বাস করলেও যুগধর্মের শাসনে আচার আচরণ, মনোভাব, রুচি, প্রবৃত্তি, নীতি,

জীবনযাত্রার আদর্শ ইত্যাদির পার্থক্যের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগতি ঘটে না।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ দেওয়ারও অবসর নেই এযুগে। ঘড়িতো হাতে বাঁধাই থাকে, সেই ঘড়ির পানে চেয়ে চেয়ে যে কথা বলে—তার মিনিটগোণা সঙ্গকে সংগতি বলা যায় না। তাছাড়া, সকলে এমন পরিশ্রান্ত যে, তারা অন্যের সঙ্গলাভের জন্য ট্রাম বাসের ভিড়ে বিদলিত হয়ে গৃহের শয্যাত্যাগ করে কোথাও যেতে উৎসাহিত বা আগ্রহী হয় না। যাদের ক্লাব আছে তাদের নির্বিচারে একত্রিত একদল লোকের সঙ্গ দিনের পর দিন লাভ করতে হয় মনের মিল না থাকলেও। যাদের তা নেই তাদের স্বজন-সংগতির পিপাসা মেটে আফিসে আদালতে, কর্মক্ষেত্রে, সিনেমায়, খেলার মাঠে, সভা-সমিতিতে এবং নিমন্ত্রণবাড়ীতে।

অতএব দেখা যাচ্ছে সজ্জন-সংগতির অভাবে যে স্বজন-সংগতি আমাদের সম্বল, তারও কম্বলের লোম বাছতে গেলে কম্বলের সামান্য অংশও অবশিষ্ট থাকে না।

পাঠক, এইবার আমার উক্ত উক্তিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত তাঁর স্বজনগণের মধ্যেই পাবেন। মেস্ হোষ্টেলের এক ঘরে কিংবা এক নৌকায় যদি ঐ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে থাকতে হয়, তবে উপায় নেই, কিন্তু সাধ ক'রে কে ঐরূপ লোকদের সঙ্গলাভ করতে চায়?

তাই আমি বলছি সজ্জন-সংগতি দুর্লভ—স্বজন-সংগতিও কম দুর্লভ নয়।

তাজ্জব ব্যাপার

সেদিন কি মনে হ'ল প্রবোধবাবু আমাকে ডেকে বল্‌লেন—'ওহে মাষ্টার, এদিকে এসো।' সাম্‌নে দিয়ে প্রত্যহই যাই তাঁর মেয়েটিকে পড়িয়ে, কোন দিন তিনি কথা বলেন না। প্রবোধবাবু একজন প্রবীণ পদস্থ ব্যক্তি,—এম-এ, বি-এল।

আমি যেতেই বললেন—কাল মেয়েরা ধরেছিল, সিনেমায় গিয়েছিলাম। ছবিটার নাম রাস্তাহারা। বেড়ে বানিয়েছে ছবিখানা। গল্পটা কার বলো ত?

আমি—আপনি বিভূতিবিমল সান্যালের 'পথহারা' দেখে এলেন বুঝি? ছবিটা খুব ভালোই হয়েছে।

প্র-বাবু—বিভূতিবিমল! বিভূতিবিমল!—হাঁ—হাঁ—ওকে আমি ত চিনি। আমার বাড়ীর পাশের গলিতে দুটো ঘর নিয়ে থাক্‌ত। প্রত্যহ ঝুলি-ঝোলা হাতে ক'রে সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে বাজার ক'রে নিয়ে যেত। দুই-একটা কথাও ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে হ'ত। সে-ই নিশ্চয়! সে বই লেখে? তার বই-এর ছবি হয়েছে? বাঃ বেশ ত। তাজ্জব ব্যাপার!

আমি—আগে এই পাড়াতেই ছিল বটে। বিভূতিবিমল একজন খুব নামজাদা সাহিত্যিক—তার ৪০।৫০ খানা বই বাজারে চালু আছে। আপনি জানেন না? আপনি তার কোন বই পড়েননি?

প্র-বাবু—হুঁ! বাংলা বই আবার কিনে পড়তে হবে? কই একখানা বইও ত সে আমাকে উপহার দেয়নি! যখন এখানে থাক্‌ত, তখনও কি বই লিখত?

আমি—তখনই তার ১০।১২ খানা বই বেরিয়েছিল। উপহারের কথা বলছেন? আপনি ত সাহিত্যিক, সমালোচক বা সম্পাদক ন'ন, আপনাকে স্যার কেন বই দেবে?

প্র-বাবু—তা নই বটে, তবে পাড়ার একজন, দেশের একজন

নামজাদা সংভ্রান্ত গণ্যমান্য লোক, বড় চাকরি করি বলেও ত দিতে পারত। এই ত যোগানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর আত্মতত্ত্বকৌমুদী বই উপহার দিয়েছেন। অপূর্ব দত্ত তার বই উপহার দিয়েছে। অপূর্ব অবশ্য আমার আফিসের কেরানীর ভাই। তাছাড়া? কত অচেনা লোক কত বই পাঠায়। সব খুলে দেখারও অবসর হয় না।

আমি—কথাসাহিত্যিকদের বই প্রকাশকে বার করে—লেখককে তারা ১০।১৫ খানা বই দেয়, তা তাদের বন্ধুবান্ধবদের দিতেই ফুরিয়ে যায়। আর কবিতা লেখে বা ধর্ম্মপুস্তক লেখে যারা, তারা নিজেরা বই ছাপে, তাদের বই বিক্রী হয় না, তারা বিলি করে। পূজার সংখ্যায় বিভূতির লেখা বড় বড় মাসিকপত্রে ত বেরোয়—আপনার বাড়ীতে কোন মাসিক পত্র আসে না?

প্র-বাবু—আসে বৈকি! কি কি আসে বল্‌তে পারছি না। আমি কখনো ওসব রাবিশ পড়ি না। ওরেপুঁটী—পুঁটী (বলে ডাক দিলেন। পুঁটী এলে জিজ্ঞাসা করলেন)—কি কি মাসিকপত্র আসে রে?

পুঁটী—গল্পভারতী, মহিলা, গল্পলহরী, কথাসাহিত্য, উদ্বোধন, উজ্জীবন—

প্র-বাবু—মেয়েরা ওসব নেয়—ওরা পড়ে। উদ্বোধন ও উজ্জীবন, এ দুটোর কথা মনে আছে,—মা ও দুখানা নেন। আচ্ছা, এত বই লিখেছে বলছ, ও করে কি?

আমি—বই লেখে,—আর কিছুই করে না।

প্র-বাবু—চলে কিসে? বিদ্যে-সাধ্যি কিরূপ? কাজকর্ম কি করে? বই লিখে ত আর সংসার চলে না।

আমি—পাস-করা বিদ্যে বেশী দূর নয়। বই লিখেই সংসার বেশ চলে যায়।

প্র-বাবু—তাহলে বলো স্কুলেই বিদ্যে শেষ? অথচ ৪০খানা বই লিখেছে! কি ক'রে লেখে? বাজে কথা সব লেখে আর কি।

আমি—কি লেখে তার পরিচয় ত কাল সিনেমাতে পেয়েছেন।

প্র-বাবু—হুঁ! গল্প বানাতে পারে বেশ। তা, তাতে বেশি বিদ্যের দরকারই বা কি? আমার জ্যাঠামশায় মুখে মুখে গল্প বানাতে পারতেন।—এখন থাকে কোথায়?

আমি—বালিগঞ্জ প্লেসে নিজের বাড়ী করেছে। সেইখানেই থাকে।

প্র-বাবু—বল কি, বই লিখে বাড়ী করেছে? ছোট্ট বাড়ী, কি বল? রানীগঞ্জ টাইলের ত?

আমি—না, নেহাৎ ছোট নয়। ৬।৭খানা ঘর আছে। দোতালা বাড়ী, বড় রাস্তার ওপর। সামনে একটা ফুলের বাগানও আছে।

প্র-বাবু—বল কি! আমি এম-এ, বি-এল, বড় চাকরি করি, আজো বাড়ী করতে পারলাম না; আর একটা ম্যাট্রিক পাসকরা ছোকরা কোন চাকরি না ক'রে বাড়ী বানালে! বল কি? আবার ফুলের বাগান? সখও আছে দেখছি। ছেলেপুলে নেই বোধ হয়!

আমি—তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে। মা আছেন, ভাইবোন আছে। একটি বিধবা বড় বোনও আছেন। একটি ভাইপো আছে, একটি ভাগ্নী আছে।

প্র-বাবু—প্রতিপাল্য ত কম নয়। বাহাদুর ছোকরা ত!

আমি—ছোকরা আর সে নয়—এখন ৪২।৪৩ বছর বয়স।

প্র-বাবু—আয় কি রকম?

আমি—সাহিত্যিকের আয় কত বলা শক্ত—তবে ৫০০ টাকার কম নয়, বেশিও হতে পারে। তাছাড়া, থোক টাকা—সিনেমায় বই হ'লে, বই-এর হিন্দী, মারাঠী ইত্যাদিতে অনুবাদ হলে।

প্র-বাবু—তাজ্জব ব্যাপার! আমি এম-এ, বি-এল, বড় চাকুরে, ৪২ বছর বয়সে আমারি ৪০০ টাকার বেশি মাইনে হয়নি! বাংলা বইএর আবার নানা ভাষায় তর্জমা হচ্ছে নাকি? তাজ্জব ব্যাপার! বই যে বিক্রী হয় খুব বলছ, কেনে কে? আমার পরিচিত লোক অসংখ্য—কই কারো বাড়ীতে বাংলা নভেল-নাটক ত দেখি না। কেনে কে বল ত! পড়েই বা কে?

আমি—দেশে শত শত লাইব্রেরি হয়েছে, সেই সব লাইব্রেরিতে বই কেনে।

প্র-বাবু—ওঃ, পাড়াগাঁয়ের লাইব্রেরিগুলো কেনে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরাও আজকাল পড়তে শিখেছে। তারাই পড়ে, বুঝতে পেরেছি।

আমি—তা ছাড়া, বিয়ে, জন্মতিথি ইত্যাদিতেও উপহারের জন্য বই বিক্রী হয়।

প্র-বাবু—হাঁ তা বটে, বড় খুকী বিয়েতে এক গাদা বই উপহার পেয়েছিল। কি সব বই আমি দেখিনি। আজকাল ও এক নতুন ফ্যাশান হয়েছে। অল্প খরচেই কাজ সারা হয়। অন্য উপহারের দাম ত বেশি। বেশ একটা ফাঁকি বা'র করেছে।

আমি—নেহাৎ ফাঁকি নয় স্যার, বইএর দামও আজকাল কম নেই। একখানা ভালো বই পাঁচ টাকার কমে পাওয়া যায় না। এখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে, কাজেই তাদের বই উপহার দেওয়া হয়। আগে মেয়েরা থাক্‌ত মুক্ষু—কাজেই এই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ হয়নি।

প্র-বাবু—যারা বই লেখে তাদের কারো আর-কিছু করতে হয় না? যারা চাকরি করে বা অন্য কাজ করে তারাও কি কেউ কেউ বই লেখে? সাহিত্যিকদের সবাই কি বিভূতির মত আর কিছু কাজ না ক'রে শুধু বই লেখে?

আমি—না, দু চার জনই কেবল অন্য কাজ না ক'রে কেবল বই লেখে। বাকি সাহিত্যিকরা চাকরিও করে, বইও লেখে।

এই কথা শুনে প্র-বাবু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পরে বল্‌লেন—দেখ, আমি মনে করেছি আমিও এইবার থেকে অবসরকালে উপন্যাস লিখব। ম্যাট্রিক পাশ-করা বিভূতি এত বই লিখতে পারল আর এম-এ, বি-এল পাশ-করা আমি পার্‌ব না? আর তোমাকেও বলি, মাস্টার, তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দাও, ওসব বাজে জিনিসে কিছু হবে না। তুমিও উপন্যাস লেখ, সিনেমার বই লেখ।

আমি—উপন্যাস লিখবার, গল্প লিখবার ক্ষমতা আলাদা। সবাই

তো সব পারে না। বিভূতি কবিতা লিখতে পারে না, আমিও উপন্যাস লিখতে পারি না। ও ক্ষমতা ভগবান আমাকে দেননি। আর সিনেমার বই সিনেমার কর্তারাই নির্বাচন করে, একটা কিছু লিখে নিয়ে গেলেই সিনেমার কর্তারা নেয় না। ভগবান যাকে যা শক্তি দিয়েছেন তার বেশি কোথায় পাওয়া যাবে বলুন।

প্র-বাবু—তুমিও যেমন! ভগবান ভগবান করেই তোমরা গেলে। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। দেখ, আমি কি করি। আমি আজ থেকে শুয়ে শুয়ে গল্পের প্লট ভাবব। আর বাংলা ত আমার মাতৃভাষা। যাই হোক, মাস্টার, তুমি অবাক করলে! ভাবিয়ে তুল্‌লে। দিনকাল হল কি? ম্যাট্রিক পাস-করা ছোকরা বাংলা বই লিখে কলকাতায় বাড়ী করলে! নাঃ, আমাকে বই লিখতেই হবে। একটা অশিক্ষিত ছোকরার বই সিনেমাতে হচ্ছে, আর আমি এম-এ, বি-এল, বড় চাকুরে, বাড়ীসুদ্ধ সকলে ৩৫৷৪০ টাকা ব্যয় ক'রে সেই বইএর ছবি দেখে আসছি! কালে কালে হ'ল কি! নাঃ, আমি কাল থেকে নভেল লিখব। মিথ্যে গল্প বানানো তো, ও বই আমি মাসে ২৷৩ খানা ক'রে লিখতে পারব। তা ছাড়া শ' খানেক বাংলা নভেল পড়ে নেব। সেগুলো থেকে অনেক কিছু পাব।

এই সময় প্রবোধবাবুর স্ত্রী বাইরের ঘরের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রবোধ বাবু ডেকে বললেন—ওগো শুনছ? কাল যার বই-এর ছবি দেখে এলে তাকে তুমি জান?

প্রবোধবাবুর স্ত্রী বললেন—জান্‌ব না কেন? বাংলা দেশে যে সামান্য লেখাপড়াও জানে—সেই তাঁকে জানে। বিভূতিবাবুর বইএর ছবি বলেই তো কাল দেখতে গিয়েছিলাম।

প্র-বাবু—তুমি তার কোন বই পড়েছ নাকি?

প্র-স্ত্রী—কেন পড়ব না? ২৫৷২৬ খানা বই পড়েছি। এ পাড়ায় যখন ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বই এনে পড়তাম। এখন তিনি বালিগঞ্জ প্লেসে নিজের বাড়ী করেছেন।

একদিন তাঁর বাড়ীতে বেড়াতেও গিয়েছিলাম, খাসা বাড়ীখানি করেছেন। বেশ সাজানো-গোছানো। এখন তো পাড়ার লাইব্রেরি থেকে তাঁর বই আনিয়ে পড়ি।

প্র-বাবু—কই, কোন দিন তো এসব কথা বলোনি ?

প্র-স্ত্রী—এ আবার বলব কি ? সবাই তো এসব কথা জানে।

প্র-বাবু—আচ্ছা, তুমি যাও। মাষ্টার, বিভূতি শুধু অবস্থা ভালো করেনি—দেশময় খ্যাতি, খাতির, প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে। মেয়েদের মধ্যেই সুনামটা দেখছি বেশি।

আমি—অবাঙ্গালীদের মধ্যেও, বাংলার বাইরেও তার প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়ছে।

প্র-বাবু—হুঁ হুঁ। বুঝলাম সব। দেখি কি করা যায়। রাত হয়ে গেল, যাও মাষ্টার, বাড়ী যাও। নভেল নাটক লেখ গিয়ে, কবিতা লেখা ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। বাড়ী বাড়ী মাষ্টারি ক'রে বেড়াতে হবে না। শুধু টাকা নয়, তোমারও খুব নাম হবে। নামটার দাম খুব বেশি হে, টাকা অন্যভাবেও রোজগার করা যেতে পারে, কিন্তু খ্যাতি ও খাতির এছাড়া আর কি ক'রে হয়, বল তো। নাঃ, বই লিখতেই হবে।

আমি—বিভূতি ষোল বছর বয়স থেকে লিখছে—ষোল বছর লেগেছে তার খ্যাতিলাভ করতে। আপনার বড় দেরি হয়ে গেছে —৭২ বছর বয়সের আগে খ্যাতি হবে কি ?

প্র-বাবু—আমি এম-এ, বি-এল, আমার পাঁচ বছরও লাগবে না। বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতার কথা ভাব্‌ছ না কেন মাস্টার ?

আমি—ভাবছি বৈকি। সেই সঙ্গে বিধিদত্ত জন্মগত শক্তির কথাও ভাবছি কিনা।

প্র-বাবু—সে শক্তি আমার নেই তা জানলে কি করে ?

আমি—একেবারে পরিচয় পাইনি বলে ?

বিবাহ-সংস্কার সমিতি

ইন্দু আমাদের পাড়ার যুবকদের চাঁই অর্থাৎ নেতৃস্থানীয়। সে বছরে অন্ততঃ দুটো ক'রে সমিতি গড়ে,—কোনটাই দু'মাসের বেশি টেকে না। ইকনমিক্সে এম-এ পাস করেছে—কিন্তু তৃতীয় বিভাগে, তাই এখনও বেকার। দাদা একজন নামজাদা উকিল। ইন্দু একদিন এসে বল্‌লে—স্যার, আমরা 'হিন্দু বিবাহ সংস্কার সমিতি' খুলতে চাই।

অন্যমনস্ক ছিলাম, বল্‌লাম—সেকি? হিন্দু সৎকার সমিতি তো একটা আছে, আবার কেন?

ইন্দু—না, স্যার, বিবাহসংস্কার সমিতি। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

আমি—আমার সঙ্গে? আমি তো কিছু ভাবিনি এ বিষয়ে।

ইন্দু—না ভেবে থাকেন, ভাবুন। আপনি একজন সমাজ-হিতৈষী লেখক। ধরুন—বিবাহ যে-কোন মাসে হবে না কেন? ক'-টা মাস বাদ যাচ্ছে কেন?

আমি—শ্রাবণ-ভাদ্র বাদ দেওয়া হয় বোধহয় অতিরিক্ত বর্ষার জন্য, আশ্বিন-কার্ত্তিক পূজাপার্বণের মাস আর পৌষ-চৈত্র ফসল তোলার মাস—সেজন্য বোধহয় পল্লী-বাংলায় এই মাসগুলো বাদ দেওয়া হ'ত। তা থেকেই বোধহয় নিয়মটা চলে এসেছে।

ইন্দু—পল্লী-বাংলায় চলেচলুক, শহরে শহরে মাসের বিধি-নিষেধ চালানোর কি প্রয়োজন? পৃথিবীতে কোথাও মাসের এরূপ অনুশাসন মানা হয় না।

আমি—মানলে ক্ষতি কি? চিরাচরিত প্রথা তো।

ইন্দু—ক্ষতি আবার নেই? বিবাহ স্থির হওয়ার পর নিষিদ্ধ মাসের ব্যবধানের জন্য উভয়পক্ষের কত ক্ষেত্রে মতি স্থির থাকছে না,—বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, অন্য একটা দাঁও পেয়ে পাত্র-পক্ষ কথা দিয়েও বিয়ে দিতে চাচ্ছে না। তা ছাড়া, জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে

অন্য কারণও আছে। নিষিদ্ধ মাসগুলোতে বাজনদার, ভিয়েনদার, সাজনদার, নানা শ্রেণীর যোগানদার, দোকানদার ও স্বর্ণকাররা বেকার হয়ে পড়ছে, ছ'মাস বাদ যাওয়ায় বাকি ছ'মাসে বছরের সব বিয়েগুলো ঠাসাঠাসি ক'রে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে—পৌরজীবনে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। আবার তারিখ নির্দিষ্ট থাকায় একই দিনে হচ্ছে বহু বিবাহ। এতে যোগানদারদের লোকসান হচ্ছে। বিয়ের উপহার ছাড়া যে সব বই বিক্রী হয় না ছ'মাস সে সব বইএর দোকান বন্ধ। নিষিদ্ধ মাসে আমাদের একখানিও নভেল বিক্রী হয় না। ঐ ক'মাস পুরোহিতরাই বা খায় কি? আর্থনীতিক দিক থেকেও ভাবুন। পক্ষান্তরে বাকি মাসগুলোয় বাজারে মাছ পাওয়া যায় না। দই মিঠাই-এর দাম চড়া—কলার পাতা পর্যন্ত বাজারে দুর্লভ। আনাজ তরকারীর দাম বেড়ে যায়।

আমি—বারো মাস বিয়ে হ'লে যে বারো মাসই বাজারের জিনিস দুর্লভ ও দুর্মূল্য হবে।

ইন্দু—তা হবে না। বরং মূল্যের অস্থিরতা দূর হ'লে একটা সাম্যাবস্থাই আসবে পণ্যমূল্যে! এই ত গেল মাস,—বিয়েটা দিনের বেলায় হবে না কেন?

আমি—বিয়েটা একটা রোমান্টিক ব্যাপার। রাত্রির পরিবেশে আলোকিত ভবনে অথবা চাঁদনীর আলোকে উৎসবটা বেশ শোভন হয়—দিনের প্রখর আলোয় রোমান্স্ নষ্ট হয়ে যায়। বোধহয় সে জন্য রাতেই বিয়ে হয়। বিয়েতো একটা থিয়েটার, থিয়েটার কি দিনে জমে?

ইন্দু—কিন্তু আসল বিয়ে তো কুশণ্ডিকা। সেটা তো দিনের বেলাতেই হয়। কেবল কন্যাদানটা হয় রাতে।

আমি—কুশণ্ডিকা তো দু'একটি উচ্চ জাতির অনুষ্ঠান। বিয়ে দিনে হওয়ায় লাভ কি?

ইন্দু—লাভ নিশ্চয়ই আছে আলোর খরচটা তো বাঁচে। তা

ছাড়া বর্ষা ও শীতের রাতে তো অনেক ক্ষেত্রেই রোমান্স্ নষ্ট হয়ে যায়। ইলেকট্রিক ফিউজ হয়েও রোমান্স্ নষ্ট করে দেয়। বিয়ে দিনে হোক, বাসর হোক রাতে।

আমি—লোকের আফিস কাছারি স্কুল-কলেজ থাকে, বিয়েতে যোগ দেবে তারা কি করে?

ইন্দু—তা ভেবেছি, তা'র প্রতিকারে কি করা যেতে পারে তা বল্‌ব। যোগ দেওয়া তো ভোজ খাওয়া? যোগদানকারীদের সংখ্যা কমানোই আমাদের পরিকল্পনার একটা অঙ্গ।

আমি—তারপর লগ্ন আছে—লগ্নটা তো শুভক্ষণ। সেটাও কি বাদ দিতে চাও?

ইন্দু—লগ্নটা যে শুভক্ষণ সত্যই কি কোন শিক্ষিত লোক মনে করে? পৃথিবীতে কোথাও কি পি-এম-বাগ্‌চি বা গুপ্ত প্রেসের পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণ স্থির হয়? তা ছাড়া, দিনেও তো বহু শুভক্ষণ আছে? সারদিনটা কি বারবেলায় ভরা?

আমি—লোকে মনে মনে মানুক আর নাই মানুক, লগ্ন দেখেই তো বিয়ে দেয় সকলেই, এমন কি সাহেবি ধরনের বাঙালীরাও।

ইন্দু—ওটা তাদের গতানুগতিকতা মাত্র। লাভ ম্যারেজগুলো ও অনিবার্য বিবাহগুলো কোন লগ্নে হচ্ছে? তা তো রোধ করতে পারছেন না। কো-এডুকেশন চালাবেন, পর্দা ওঠাবেন; অবাধ মেলামেশায় বাধা রাখবেন না, এক আফিসে যুবকযুবতীরা চাকরি করবে, সংঘ, সমিতি, ক্লাব ইত্যাদি সর্বত্রই তাদের সহযোগিতা-সাহচর্য ঘটছে অথচ বিবাহটা হবে সর্বসম্মতিক্রমে তথা-কথিত শুভদিনে শুভলগ্নে—তা হয় না, স্যার। লগ্নের কথাই বলি—একে তো রাতে বিয়ে—তাতে লগ্ন হয়ত দুপুর রাতে কিংবা শেষ রাতে, কি অসুবিধা বলুন ত? তখন ক'জন সাক্ষী থাকবে?

তারপর কোষ্ঠী মেলানো। দেশের শতকরা নব্বইটা পরিবারে ছেলেমেয়ের কোষ্ঠী থাকে না—কোষ্ঠী মেলানোর বাড়াবাড়িটা

নিম্নজাতির মধ্যে নেই; অথচ তারাই শতকরা ৮০জন। শহরে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কোষ্ঠী মেলানোর বাড়াবাড়িটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ তাঁরাই বলেন, বহুদিন থেকে ভুল পঞ্জিকা চলছে; পঞ্জিকাসংস্কারের প্রয়োজন। কত বিয়ে জাল কোষ্ঠীতেই হয়ে যাচ্ছে। কোষ্ঠী মিলিয়ে যুবক-যুবতীরা প্রেম করে না, বিয়ের প্রস্তাব করে দৃষ্টি মিলিয়ে। মেয়ের যদি রাক্ষসগণ হয়—তাহলে সে রাক্ষসী হয়ে স্বামীকে খেয়ে ফেলবে—তাই যদি হয়, তবে যে কোষ্ঠীতে রাক্ষসগণ আছে সে কোষ্ঠী আদৌ থাকবে কেন? এই উপদ্রবের জন্য কত পরমবাঞ্ছিত সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে। কোষ্ঠী পঞ্জিকাই আসল রাজযোটকতার অন্তরায়।

আমি—কোষ্ঠী না হোক গোষ্ঠীতো মেলাতে হবে।

ইন্দু—বেশ তো, আচারে আচরণে, ধর্মমতে, জাতিবর্ণে, রীতিনীতি ইত্যাদিতে পরিবারে পরিবারে মিল হচ্ছে কিনা দেখলেই তো হয়। তবে যদি গোষ্ঠীর অর্থ ধরেন গোত্র, তা হলে জিজ্ঞাসা কর্‌ব গোত্র বস্তুটি কি? যাকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ তা বলতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন—আদি পুরুষ। এই আদি পুরুষটির আবির্ভাব হয়েছিল ৫।৬ হাজার বছর আগে। তারপর ঐ গোত্রের একটি পরিবার বহু শত বৎসর ধরে বাস করছে চট্টগ্রামে; আর একটি ঐ গোত্রের পরিবার বহু শতবর্ষ ধরে বংশ বিস্তার করছে মালদহে কি মানভূমে। সগোত্রতার জন্য দুই পরিবারে বৈবাহিক আদান-প্রদান চলবে না, কেন না তারা সরক্ত। এর চেয়ে রক্ত সম্বন্ধ ঢের বেশি গাঢ় অন্য গোত্রের নিকটবর্তী পরিবারগুলির সঙ্গে, অথচ তাদের মধ্যে অবিরত বৈবাহিক আদান প্রদান চলছে। সব চেয়ে মজার কথা—একই গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকও রয়েছে। গোত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা চাই। গোত্রভেদ থাকায় বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধনে খুবই অসুবিধা চলছে। আমাদের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার সামাজিক সমস্যাকে অযথা জটিল করেছে। মানুষে

মানুষে সহজ আত্মীয়তার মিলন আমাদের লক্ষ্য নয়। যত রকমে সম্ভব পরত্বের বৈষম্য সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য।

আমি—অসবর্ণ বিবাহই যখন চালু হতে চল্‌ল, তখন আর গোত্রের কথা তুলছ কেন? বল না জাতি বর্ণভেদও তোমরা তুলে দিতে চাও।

ইন্দু—প্রথমেই বর্ণভেদ ওঠানোর কথা তুল্‌ব না আমরা,—তাতে সমিতির সভ্যসংখ্যা বেশি হবে না। এখনো অনেকে কিছুই মানে না, কিন্তু জাত্যভিমানটি পুরাদস্তুর বজায় রেখে চলছে কিনা। জাতে হাতে দেওয়া হবে না।

বিবাহের ব্যয়সংক্ষেপের একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে; হিন্দুসমাজের অধিকাংশ পরিবারের কথা ভাবা হয়েছে এতে।

আমি—বলো, তাতে আমার খুব সমর্থন আছে। অধিকাংশ পরিবার হয় গরিব, নয়ত নিম্ন মধ্যবিত্ত।

ইন্দু—বরযাত্রীরা এখন আর উপদ্রব করে না বটে, কিন্তু দল বেঁধে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্তকে বিব্রত করে। বরের নিতান্ত আত্মীয় ছাড়া বরযাত্রী যাবে না। কন্যাপক্ষের বেলায় যাত্রী বলা যায় না— সাক্ষী বলতে হয়। সে সাক্ষীদের সংখ্যা খুব বেশি হবে না। আজকাল নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হয়। এই ছাপা চিঠিই সর্বনাশ করেছে। বাড়ীর লোকেদের প্রত্যেকের পরিচিতমাত্রই তাই নিমন্ত্রিত হয়। শুধু নাম লিখে কোনরূপে পাঠিয়ে দিলেই হ'ল। বাড়ীর কর্তা জানেন নিমন্ত্রিত ২৫০। নিমন্ত্রণভোজীর সংখ্যা গুণে দেখা যায় ৪০০।৪৫০, কিংবা আরো বেশি। বাড়ীর কর্তা তাদের অনেককে চেনেন না। কোনকালে আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্যে নিমন্ত্রিত হ'ত না পারিবারিক অনুষ্ঠানে। একালে দেখা যায় আত্মীয়স্বজনের চেয়ে ঢের বেশি প্রতিবেশী ও পরিচিত, কিংবা মুখ-চেনা লোক। নিয়ম করতে হবে প্রত্যেক চিঠিখানা হাতে আগাগোড়া লিখতে হবে অথবা নিজে গিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে আসতে হবে। হাতে লিখতে

হলেই নিমন্ত্রিত-সংখ্যা কমে যাবে। কাগজে কলম ছোঁয়ানো অনেকেরই ধাতে সয় না। এই যে নির্বিচারে নিমন্ত্রণ এতে নিমন্ত্রিতদেরও আসা যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হয় এবং বেশ কিছু খরচ করতে হয়। অতএব নিমন্ত্রণ না করলে অনেকেই খুশী হবে।

নিমন্ত্রিতেরা যে উপহারাদি দেয় তাতো প্রাপ্তি নয়—তাতো অযাচিত ঋণ গ্রহণ। কাজেই নিমন্ত্রণ-সংকোচ করলে উভয়পক্ষেরই লাভ। ভিয়েনদাররা বলে এখন পাতা পিছু চার টাকা পড়ে—জানি না তার কতটা পরিশোধ হয়। অনেকে মিলে মোটরে ঠাসাঠাসি ক'রে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এলে নিমন্ত্রিতদের খরচটা হয়ত উশুল হয়। কিন্তু তাও ভুল। অর্ধেক ভোজ-ভোজীদের অসুখ হয়। ঘি, বনস্পতি, তেলের মিশ্রণে গুরুপাক ও মশলাযোগে মুখ-রোচক ক'রে রান্না, বস্তাঝাড়া আলুর সঙ্গে বরফের শবাধারে রক্ষিত আধপচা মাছের কালিয়া, চপ; টোমেন বিষে ভরা চিংড়িমাছের কাটলেট ইত্যাদি রাত্রি দশটায় ভোজন ক'রে সকলেরই অল্পবিস্তর শরীর খারাপ হয়। নিমন্ত্রণগুলিই থ্রম্বসিসের উদ্যোগ পর্ব।

নিমন্ত্রণের ভোজ্যাবলীকে অতিরিক্ত লোভনীয় করা কখনও সঙ্গত নয়। নিমন্ত্রণবাড়ীতে যে আয়োজনের প্রথা চল্‌ছে তা লঙ্কাবাসীদের যক্কতেরই উপযোগী! কাজেই অপচয়ও খুব বেশি হয়—পক্ষান্তরে ভোজনরসিকদেরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিমন্ত্রণভোজনের ফলে অনেকের মৃত্যু হয়েছে তা সকলেরই জানা আছে। নিমন্ত্রণ-ভোজনে যে মৃত্যুরোগের আক্রমণ তার সংবাদটা লজ্জাকর বলে অনেক ক্ষেত্রে চেপে যাওয়া হয়।

অতএব আমরা একটা মেনু ঠিক করে দেব। বিয়ে দিনেই হোক আর রাতেই হোক নিমন্ত্রণ থাকবে বৈকালী ভোজনে, সভ্যেরা যাকে বলে চায়ের পার্টি। আয়োজন হবে ভদ্রলোকে যা খেয়ে হজম করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। অথচ রাতে বাড়ী গিয়ে আর কিছু খেতে না হয়। এ ব্যবস্থায় নিমন্ত্রণবাড়ীতে

হৈচৈ, হট্টগোল, ছুটাছুটি হবে না, বাড়ীঘর নোংরা হবে না। অস্বাস্থ্যকর হবে না। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত ভোজন পর্ব চলবে না, ছাদের সিঁড়িতে গুঁতোগুঁতি হবে না। জুতো হারাবে না, ৫০জন ঘর্মাক্ত দায়িত্বহীন পরিবেশকের প্রয়োজন হবে না।

প্রত্যেককে দিতে হবে একটি ক'রে মাটির ডিশ—তিনি টেবিলে রেখেও খেতে পারেন—বেড়াতে বেড়াতেও খেতে পারেন। ডিশে থাকবে চারখানি রাধাবল্লভী বা ডালপুরী, আলুর দম, আধখানা পাঁপর, বরবটীর ঘুগনি, দুখানি চপ (মাছ, মাংস কিংবা ভেজিটেবল), এক কটোরা দই, দুইরকমের মিষ্টান্ন মাঝারি আকারের। এই মেনু সঙ্গতি অনুসারে বাড়বে কমবে। অপচয় নিবারণের জন্য একটা টেবিলে একটি বড় থালা থাকবে—তাতে অতিথিগণ আগেই অপ্রয়োজনীয় খাদ্য রেখে দেবেন। যাঁর প্রয়োজন হবে তিনি রাধাবল্লভী ও আলুর দম চেয়ে নেবেন—পেট ভরাবার জন্য। যেচে এর বেশি পরিবেশিত হবে না। লুচি না, পোলাও না, ছ্যাঁচড়া, মুড়িঘণ্ট, ডাল, চাটনি ইত্যাদির আয়োজন থাকবে না। কেটলিভরা চা নিয়ে একজন অতিথিদের মধ্যে ঘুরবেন। মেয়ের বিয়ে ছেলের বিয়ে জন্মতিথি অন্নপ্রাশন সব ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা। শ্রাদ্ধে চিরাচরিত ব্যবস্থাই চলে, চলুক। আমাদের আলোচ্য বৈবাহিক অনুষ্ঠান। এই বৈকালী চায়ের অনুষ্ঠান কনট্রাক্ট দেওয়াও চলতে পারে।

আমি—লঙ্কা থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের এতে পেট ভরবে ?

ইন্দু—তিনি আরো চারখানা রাধাবল্লভী, আলুর দম কিংবা ঘুগনি আরো চেয়ে নেবেন।

মোটকথা নিশীথভোজনকে নিশাচরদের ভোজনে পরিণত না ক'রে বৈকালিক চা-পার্টিতে দাঁড় করাতে হবে।

আমি—তারপর আসল ব্যয়ের কি হবে ? পণ যৌতুকাদি ?

ইন্দু—পণতো আইনবিরুদ্ধ। গোপনে নিলে—আমাদের আর কি করবার আছে ?

তবে অধিবাসের তত্ত্বে বা ফুলশয্যার তত্ত্বে কোনরূপ বিলাসদ্রব্য দিতে পাবেন না কোনপক্ষ। যদি কেউ দিতে চান—তবে তিনি গোপনেই যেন দেন—যৌতুকের বা তত্ত্বের বিলাসদ্রব্যাদির প্রদর্শনী কেউ সাজাতে পাবেন না নিমন্ত্রিতদের সমক্ষে—বা পথ দিয়ে মিছিল ক'রে পাঠাতে পাবেন না।

আমি—এ প্রথা তোমরা বন্ধ করবে কি করে? ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তো চলে না।

ইন্দু—প্রচারকার্যের দ্বারা, আবেদন নিবেদন ইত্যাদির দ্বারা বন্ধ করবার চেষ্টা করতে হবে। জীবনে যারা কখনো বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করেনি বিবাহের পরই তারা সহসা বিলাসী বা বিলাসিনী হয়ে পড়লে, তাদের বর্তমান পারিবারিক জীবন, অতীত জীবন, দেশের দুর্গত অবস্থা, পরিজনগণের চাল-চলন, নিজেদের আর্থনীতিক অবস্থা ইত্যাদির সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকে না—এটা অনূঢ়দের এবং সদ্যোবিবাহিতদের বোঝাতে হবে—তাদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে হবে। তা ছাড়া যারা বিবাহে অর্জিত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নির্লজ্জভাবে চলবে তাদের বিদূষণ ও তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে আমাদের সমিতি থেকে।

এই ব্যাপারে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলি যাতে ধনীদের অনুকরণ না করে সেজন্য আমরা প্রচার কার্য চালাব—সভা সমিতি করব। আমাদের কাজ সুরু হবে আমাদের সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে। তারাই এ বিষয়ে আদর্শ দেখাবে।

হিন্দুসমাজের আর্থিক দুর্গতির কারণ, আমাদের এই হিন্দুয়ানিটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। দরিদ্রের পক্ষে হিন্দু হয়ে জন্মানোই দুর্ভাগ্য। আপনি দেখুন খতিয়ে,—জাতকর্ম থেকে—জাতকর্ম কেন গর্ভ থেকে অর্থাৎ প্রসূতির সাধভক্ষণ থেকে জাতকের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হিন্দুত্বের জন্য একজনের যে ব্যয় হয় তা থেকে রেহাই পেলে সমাজের আর্থিক দশা এত হীন হত না। অতিরিক্ত ব্যয় ও অপব্যয়ের ভয়ে কত লোক যে

হিন্দুসমাজ ত্যাগ ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেদিকে আপনারা ভেবেছেন ? বৈদিক সংস্কার, পর্বপার্বণ, পূজার্চনা, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, ব্রত, মানসিক, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, গ্রহশান্তি, মৃতদোষ খণ্ডন, একোদ্দিষ্ট, সপিণ্ডীকরণ, পাণ্ডাপূজন ইত্যাদি সমস্তই বহু অর্থব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়! এত অর্থ দরিদ্র হিন্দুজাতি কোথায় পাবে ? জীবনের নানাবিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অবশ্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য—এমন কি ক্ষুধার অন্ন থেকে আত্মবঞ্চিত হয়ে হিন্দুত্বের দাবি মিটাতে হয় হিন্দুকে। আমাদের শেষ পর্যন্ত ব্রত হবে হিন্দুত্বকে ব্যয়নিরপেক্ষ ক'রে তোলা। বিনা ব্যয়ের যে হিন্দুত্ব, আমরা শুধু তা-ই মানব।

আমি—ইন্দু, তুমি একখানা নতুন ইউটোপিয়া লেখ। আচ্ছা, বিবাহের আসল অনুষ্ঠানের কি সংস্কার করতে চাও ?

ইন্দু—বিবাহের স্ত্রীআচার অংশটা বর্জনীয়, ওটা বিবাহের অনার্য অঙ্গ ; আর বাদ দিতে হবে মুখে বিশ্রী একটা শব্দ ক'রে নারীদের উলু দেওয়ার 'নার্য'-অঙ্গটাকে। বিবাহের মন্ত্র বাংলায় পড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ববিদ্যা বাংলায় পড়ানো হবে—আর বিবাহের মন্ত্র পড়ানো হবে সংস্কৃতে ? কেন ?

আমি—বৈবাহিক অনুষ্ঠানের অনার্য অঙ্গ বাদ দেবে, আর্য অঙ্গও বাদ দেবে ?

ইন্দু—সংস্কৃত যারা জানে তারা সংস্কৃতে মন্ত্র পড়ুক। হাজার-করা একজনও সংস্কৃত বোঝে না, জানে না—তারা কেন তোতা পাখীর নকল করবে ? বাংলায় মন্ত্র পড়লে বর্তমান বঙ্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে বিবাহ মণ্ডপে।

আমি—মন্ত্রটা সংস্কৃতে পড়ানো হলে প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে। বর্তমান ভারতীয় পরিবেশের সৃষ্টি করতে হলে রাষ্ট্র-ভাষায় পড়াতে হয়। তার চেয়ে এক কাজ কর—ইংরেজিতে পড়ানোর ব্যবস্থা কর—বিশ্বজনীন পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারবে।

পরিহাস নয়—আমাদের হিন্দুবিবাহের বিবিধ অনুষ্ঠানগুলি অবাধ স্বৈরাচারকে নিয়মিত করবার জন্য—বিবাহ যে জীবনের যুগসন্ধি, দশজনকে নিয়ে যে আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন, এই উপলক্ষটা যে কঠোর দায়িত্বপূর্ণ ও শুচি-সুন্দর—এই সত্যকে কয়েকদিন ধরে উপলব্ধি করানোর জন্য এর অনুষ্ঠানপরম্পরা। একটা সাত্বিক পরিবেশের সৃষ্টি ক'রে তাতে নবদম্পতীকে গার্হস্থ্য আশ্রমে দীক্ষাদানই হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য।

ইন্দু—কী চমৎকার সাত্বিক পরিবেশেরই সৃষ্টি হয়! এর চেয়ে তামসিক পরিবেশ আর কি হতে পারে, স্যার? তবে এর কতকটা রাজসিক বটে,—বিলাস-দ্রব্যের ঘটায় ও আড়ম্বরে, আর ভূরি-ভোজ্যের আয়োজনে।

আমি—এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে এই অনুষ্ঠানে আর সাত্বিকতা নেই—অনুষ্ঠানটি আগে সাত্বিকই ছিল হে!

ইন্দু—আর একটা কথা। বর একটা শোলার মুকুট মাথায় পরে বিবাহের রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করে—এটা যাত্রাদলের রাজার অভিনয়মাত্র—প্রহসনের এ অঙ্গটাকে বাদ দিতে হবে।

আমি—সর্বনাশ! তাহলে বরের বাপ সোনার মুকুট চাইবে কন্যার বাপের কাছে।

আচ্ছা, তোমাদের সমিতির সভ্য কারা?

ইন্দু—প্রধানতঃ অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা। ইতিমধ্যে যাটজন নাম সই করেছে। আমাদের কৃত্যসূচি তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যেই—এখনও ছাপা হয়নি।

আমি—তাহলে বিবাহসমস্যার মীমাংসার সঙ্গে বিবাহসংস্কার স্থরু হয়ে যাবে। সমিতিটা সত্বর গড়ে ফেল। তবে তোমার সমিতির আয়ু তো দুই মাস।

ইন্দু—না স্যার, এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন না। আপনার মতামত ঠিক কি ধরতে পারলাম না কিন্তু।

আমি—দেখ, আমার তিনকাল অতীত হয়েছে—আমার সামনে ভবিষ্যৎ নেই—ভবিষ্যৎ তোমরাই গড়বে। আমার মতামতের কোন মূল্য নেই; আমি শাস্ত্রজ্ঞ চিন্তাশীল মনীষী নই; কোন প্রথার মূলে কি সত্য ও কি সার্থকতা আছে জানি না। আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি—প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারগুলিকে মনে প্রাণে মানি আর নাই মানি—পারিবারিক সংহতি ও শান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, স্বদেশের সংস্কৃতির আনুগত্য-রক্ষা ইত্যাদির জন্য প্রচলিত রীতিপ্রথাগুলিকে চিরদিন পালন করে এসেছি, তাই বলে তোমাদের সে সব মেনে চলতে বলতে পারি না। আমাদের মনে যে সত্য 'ভাবে' এসেছে—তা 'রূপে' আসেনি, তোমাদের মনে যা 'ভাবে' এসেছে—তা 'রূপে'ও আসবে। আমাদের ধর্ম ছিল নির্বিচারে সমস্তের প্রতি আনুগত্য—তোমাদের ধর্ম বিচার বিশ্লেষণ ক'রে সব কিছুর আসল মূল্য নির্ণয় এবং তদনুসারে গ্রহণবর্জন। কাজেই প্রবীণের মতামত না গ্রহণ করাই ভালো। এই পর্যন্ত বলতে পারি তোমার উক্তিতে যুক্তি আছে—তোমার বক্তব্য চিন্তার উদ্বোধক—মাঝে মাঝে পরিহাস করেছি বটে—সে তোমার অব্যবস্থিত-চিত্ততাকে লক্ষ্য করে—কিন্তু যুক্তিকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না।

হিন্দুয়ানিকে ব্যয়ভারমুক্ত করার সংকল্পটি আমার খুব ভালো লাগল—সেই আদর্শে তোমাদের কৃত্যসূচি রচনা করলেই ভালো হয়। সেই সঙ্গে ফাইন্যাল ল-টা পাশ ক'রে আদালতে যাতায়াত সুরু ক'রে দাও।

বরকর্তা

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে একবার বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলাম হুগলী জেলার একটি স্থান থেকে কিছু দূরে। বর আমার বন্ধু জয়ন্ত, তখন থার্ড ইয়ার ক্লাসে ইংলিশে অনার্স নিয়ে পড়ছিল। কনে গ্রামের মাইনার স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীধর বিদ্যাভূষণের পরম সুন্দরী গুণবতী কন্যা। সে কাব্যতীর্থ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। শ্রীধর পণ্ডিতের কিছু জোতজমি ছিল এবং কয়েক ঘর যজমান ছিল। কন্যাটি মাতৃহীনা। পণ্ডিতের একমাত্র পুত্র বি-এ ফেল ক'রে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করত। পণ্ডিতের দ্বিতীয়া পত্নীর কোন সন্তান হয় নি। সুলক্ষণা কন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীমন্তবাবু তাকে পুত্রবধূ ক'রে আনতে চেয়েছিলেন। সেকালে অর্জনক্ষম হওয়ার আগেই ছাত্রাবস্থাতেই ছেলেদের বিয়ে হ'ত এবং কোষ্ঠীর রাজযোটকতার খুবই মূল্য ছিল।

বরযাত্রী মাত্র ষোল জন, তার মধ্যে আমরা তিনজন ছিলাম বরের বন্ধু।

স্টেশনে গিয়ে শ্রীমন্তবাবু বললেন, আমরা পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দিতে চললাম, অসুবিধা অনেক হবে। তোমরা মনে ক'রো আমরা পল্লীগ্রামে পিকনিক করতে চললাম। কন্যার পিতা দরিদ্র, আমিও প্রায় দরিদ্র, সামান্য পেনসন পাই। তাছাড়া, এটা বিনা পণের বিবাহ।

ব্যঙ্গার্থ বুঝে আমি বললাম—থার্ড ক্ল্যাসের টিকিটই করুন সবার—কেবল বরের ও আপনার ইণ্টার ক্ল্যাসের টিকিট কাটুন।

শ্রীমন্তবাবু বললেন—তোমরা অনুমতি দিলে সকলেই এক সঙ্গেই যেতে পারি। সর্বসম্মতিক্রমে সকলেই থার্ড ক্ল্যাসেই গেলাম। বরও আমাদের গাড়ীতেই চলল। গাড়ীতে ভিড় ছিল না। শ্রীমন্তবাবুর বয়স যেন চল্লিশ বৎসর কমে গেল। সারা পথ হাস্যকৌতুক করতে করতে চললেন।

কালনা স্টেশনে শ্রীমন্তবাবু বাক্স থেকে কয়েকটি কাচের গেলাস ও ১৮টি পেয়ালা বা'র করলেন এবং তিন কেটলিভরা চা এবং এক চ্যাঙাড়ি গরম সিঙাড়া আনালেন। সঙ্গে ঘরে তৈরি গজা ও কিছু চানাচুরও ছিল। পিকনিক সুরু হ'ল।

বেলা সাড়ে দশটার সময় স্টেশনে পৌঁছানো গেল। বর চলে গেল পালকিতে। তত্ত্বাহীরা ও নাপিত অধিবাসের তত্ত্ব নিয়ে পাল্‌কির সঙ্গে চলে গেল। চারখানি গোরুর গাড়ী মোতায়েন ছিল —কিন্তু বরের বাবা শ্রীমন্তবাবু বললেন, আসুন, আমরা হেঁটেই গল্প করতে করতে চলি। কিন্তু প্রায় মাইল খানেক হাঁটার পর ক্লান্ত হয়ে গোরুর গাড়ীতে উঠতে বাধ্য হলেন। ৫৬ বৎসর বয়সের বরকর্তা গাড়োয়ানকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজেই গাড়ী হাঁকিয়ে চললেন। কী স্ফূর্তি বৃদ্ধের!

১১টার মধ্যে পৌঁছানো গেল গ্রামে। শ্রীধর পণ্ডিতের এক যজমানের জীর্ণ শূন্য কোটাবাড়ীতে আশ্রয় পেলাম। বসবার আসন জাজিম-ঢাকা শতরঞ্চ। যাবামাত্র পণ্ডিতের পুত্র চায়ের ব্যবস্থা করছিলেন। শ্রীমন্তবাবু বললেন, ভূধর, চা হবে বৈকালে—তোমাদের ঐ নিমকি পানতুয়া দিও বৈকালে। এখন আনো নেবুর রস ও পাতকুয়োর ঠাণ্ডা জলে তৈরি শরবত। আর পথের ওধারে দেখলাম একটি মেয়ে ফুলুরি বেগুনি ভাজছে—খাসা গন্ধ বেরুচ্ছে—তাই নিয়ে এসো এক ঝুড়ি, আর একধামা মুড়ি। পল্লীগ্রামে এসে পল্লীর খাবার কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

বলা বাহুল্য, এতে সবাই সায় দিল। মধ্যাহ্নভোজনের আগে এই ব্যবস্থাই ভালো। শ্রীমন্তবাবু শুধু শরবত খেলেন।

তারপর স্নানপর্ব, তোলা জলের ব্যবস্থা ছিল। শ্রীমন্তবাবু বললেন—চল সবাই, দীঘির জলে স্নান ক'রে আসা যাক। দীঘির জলে প্রায় একঘণ্টা ধরে সাঁতার কেটে স্নান করা হ'ল। আমাদের যারা সাঁতার জানে না—তারা শ্রীমন্তবাবুর সাঁতার দেখে শান্তি

পালের কথা স্মরণ করতে লাগল। বৃদ্ধের কি স্ফুর্তি! তিনি স্নান ক'রে ফিরবার সময়ে একরাশি পদ্মফুল তুলে আনলেন।

স্নানের পর আহারপর্ব। শ্রীমন্তবাবু আগেই পণ্ডিতকে বলে রেখেছেন, শুধু মাছের ঝোল ভাত। কারণ, রাত্রে গুরু ভোজন আছে। ঠিক ঝোলভাত না হ'লেও লঘু আহারেরই ব্যবস্থা ছিল। শেষে ছিল গাঁয়ের গোয়ালার দই আর এক মুঠো ক'রে বুঁদে। এদুটি পরিবেশন করলেন শ্রীমন্তবাবু নিজে। তিনি নিজে খেলেন না, পথে চা ছাড়া কিছু খান নি—গ্রামে পৌঁছে শরবত ছাড়া কিছু খাননি। কারণ, শুধু বললেন—'পুত্র ও পুত্রবধূ দুজনেই উপবাসী আছে যে।'

আহারের পরে বিশ্রাম—এখনো কন্যাকর্তার দেখা নেই। শ্রীমন্তবাবু বললেন, তোমরা মনে কিছু কোরোনা, তাঁর শিক্ষক-পুত্র ভূধর মোতায়েন আছে। ধর্মপ্রাণ, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নান্দীমুখে খুব বিলম্ব হয়, এখনও তিনি পিতৃপুরুষদের খাওয়াচ্ছেন।

বৈকালে বরের পিতা চাইলেন—গরম জল ও একপাত্র দুধ—বাক্স থেকে বা'র করলেন চিনি, একটিন চা, একটিন বিস্কুট এবং পেয়ালাগুলি। কন্যার বাড়ী থেকে এলো নিমকি ও পানতুয়া।

চায়ের পর গ্রামপরিক্রমা। শ্রীমন্তবাবু দু'ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ ক'রে ফেললেন—একজনের মুখে শুনে এলেন—পণ্ডিত বিয়ের জন্য সাতশো টাকা ধার করেছেন। যজমান ও প্রাক্তন ছাত্রেরাও ৪।৫ শত টাকা সাহায্য দিয়েছে। এরপর থেকে শ্রীমন্তবাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন, কিন্তু তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়।

দেখা গেল, বিবাহবাড়িতে বরের পিতা কনের পিতার চেয়ে বেশি সক্রিয়। বরযাত্রীদের জন্য কন্যাপক্ষের লোকেরা চা আনছিল—সিগারেট আনছিল, পান আনছিল। শ্রীমন্তবাবু বললেন—চা খেলে ক্ষুধা মরে যাবে—আমার সাক্ষাতে কেউ সিগারেট খায় না—

পাশের ঘরে তামাক বা সিগারেটের ব্যবস্থা রেখ, খাওয়ার পর যত পারো পান দিও। বরযাত্রীদের জন্য তোমাদের উদ্বেগের প্রয়োজন নেই—তোমরা কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতদের পরিচর্যা করগে।

বরযাত্রীরা বিবাহের আগে ভোজনে রাজী হ'ল না; বললে—কন্যার পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ না হলে খাওয়া চলে না। শ্রীমন্তবাবু বললেন,—পণ্ডিত মশায়, চলুন কন্যাযাত্রীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিগে। শ্রীমন্তবাবু নিজের বাড়ীতে যেমন নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করেন—তার ঢের বেশি আপ্যায়ন ক'রে সকলকে পরিতৃপ্ত করলেন এবং নিজে দধি পরিবেশন করলেন।

বিবাহের লগ্ন এসে পড়ল—অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেল—কন্যাদান করতে গেলেন পণ্ডিতের ভ্রাতা। এদিকে বরযাত্রীদের ভোজনে আহ্বান করা হ'ল। বরযাত্রীরা বললেন—আমাদের নিমন্ত্রণ হয়নি, আমরা কি ক'রে খাই। পণ্ডিত হতবুদ্ধি।

(পাঠকও হয়ত হতবুদ্ধি হবেন, কিন্তু সে কালে ফর্ম্যাল নিমন্ত্রণের প্রথা ছিল।)

শ্রীমন্তবাবু বললেন—কি সর্বনাশ! আপনি এঁদের ফর্ম্যালি নিমন্ত্রণ করেননি,—ওবেলায় এঁরা ছিলেন অতিথি—এ-বেলায় এঁরা বরযাত্রী। এ বেলায় ওঁদের পোশাক দেখছেন না? এঁদের নিমন্ত্রণ করতে হবে—গলায় কাপড় দিয়ে বলুন—

শ্রীমন্ত—মহাশয়গণ, করুণা করিয়া আপনারা আমার কুটীরে—
শ্রীধর—মহাশয়গণ, করুণা করিয়া আপনারা আমার কুটীরে—
শ্রীমন্ত—যখন পদধূলি দিয়াছেন—
শ্রীধর—যখন পদধূলি দিয়াছেন—
শ্রীমন্ত—তখন বিদুরের ক্ষুদকুঁড়া গ্রহণ করিয়া—
শ্রীধর—তখন বিদুরের ক্ষুদকুঁড়া গ্রহণ করিয়া—
শ্রীমন্ত—আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করুন।
শ্রীধর—আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করুন।

বরযাত্রীরা বললেন—নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করলাম—কিন্তু কন্যা-কর্তার দণ্ড হওয়া চাই।

শ্রীমন্তবাবু বললেন—বেশ দশটাকা জরিমানা করা হ'ল।

বরযাত্রীরা বললেন—না, ষোলো টাকা।

শ্রীমন্তবাবু বললেন—বেশ, পণ্ডিতমশায় রাজী আছেন ত?

শ্রীধর—নিশ্চয়, নিশ্চয়!

শ্রীমন্ত—তবে একটা কথা আছে। নিমন্ত্রিতদেরও একটা কর্তব্য আছে—তাঁদের কিছু কিছু লৌকিকতা দিতে হয়—আপনাদের প্রত্যেককে অন্ততঃ একটাকা ক'রে দিতে হবে। অতএব জরিমানা ও লৌকিকতায় কাটাকাটি হয়ে গেল। এখন চলুন।

বরযাত্রীদের একজন বললেন—এঁদের মধ্যে আমরা পাঁচজন কুলীন সন্তান আছি। কৌলীন্য মর্যাদা অন্ততঃ দশটাকা দিতে হবে।

(এ যুগের পাঠক হয়ত বিস্মিত হবেন। এই বিবাহের অল্পদিন আগেই কলকাতার এক ধনীর বাড়ীতে আমরা বেশ কিছু আদায় করেছিলাম—মহাকুলীনের সন্তান নই বলে আমি মাত্র পাঁচ টাকা পেয়েছিলাম।)

শ্রীমন্তবাবু—দু-টাকা ক'রে নয়, মর্যাদা পাঁচসিকে ক'রে। আমাদের ঐতিহ্য আছে। রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য কিংবা দেবতার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে হলে পাঁচসিকে মানত করতে হয় —আপনারা যখন কুলীন, তখন দেবতাদের যা দাবি তা পাবেন। তার বেশি নয়। পণ্ডিত, রাজী তো!

শ্রীধর—নিশ্চয় নিশ্চয়! (কৃতাঞ্জলি হয়ে) চলুন এবার।

শ্রীমন্ত—উদরস্থ অগ্নিদেবও নিশ্চয় আদেশ দিচ্ছেন।

বরযাত্রীদের বসানো হ'ল।

শ্রীধর বললেন—বেহাই মশায়, আপনিও বসুন।

শ্রীমন্ত—সে কি কথা? এখনো আমার মা-লক্ষ্মীর আহার হয়নি—বেহাইরাও সারাদিন উপবাসী। আপনার ও কন্যাসম্প্রদাতা

বেহাই-এরও আহার হয়নি, আমি খাব কি করে? আমি দাঁড়িয়ে না খাওয়ালে এঁদের খাওয়া ঠিকমত হবে কি করে? আমাকে তো পরিবেশন করতে হবে।

(পাঠক হয়ত জানেন না পরিবেশনেও বোধহয় আভিজাত্য ও একটা আনন্দ আছে। কাশিমবাজারের মহারাজ, লালগোলার মহারাজও আমাদের স্বহস্তে পরিবেশন ক'রে খাইয়েছিলেন)

শ্রীধর—সে জন্যে তো আমি রয়েছি, ছেলে রয়েছে। আমার ভাইপোরা রয়েছে।

শ্রীমন্ত—আপনি কি জানেন কে নিরামিষ খায়, কে চিংড়ে মাছ খায়না—কে ক'টা ক'রে পানতুয়া খায়? কে ক'বার দই নেয়, কে মাছের চপ ভালবাসে? কাকে আর চাই না বললেও দিতে হয় তা কি জানেন? আপনার ছেলে এযুগের গ্রাজুয়েট, হয়তো 'চাই না' বললেই দিতে নিষেধ করবেন—কিন্তু ব্যাঘ্রঝম্পন ছাড়া যে নিরস্ত হওয়া চলে না—তা কি তিনি জানেন? যাক, এত আয়োজন করেছেন কেন? ব্যয়তো আছে? সাত্ত্বিক পণ্ডিতের এত রাজসিক আয়োজন কেন?

শ্রীধর—এ কি আমি করেছি, বেহাই মশায়? কোন শুভ অনুষ্ঠানে আমার বাড়ীতে মাছের ব্যবস্থা থাকে না। আপনি অধিবাসের তত্ত্বে ১৮ সের মাছ পাঠালেন তাতেই মাছের তিনটা পদ হলো। সন্দেশ, পক্কান্ন নানাবিধ তো আপনিই পাঠিয়েছেন—আর উৎকৃষ্ট দই পাঠিয়েছেন চার হাঁড়ি। আপনিই তো আপনার লোকদের, এমন কি কন্যাযাত্রীদেরও খাওয়াচ্ছেন, দাদা। আমি তো উপলক্ষ মাত্র।

শ্রীমন্ত—চুপ, চুপ। আস্তে। সবই মা লক্ষ্মীর পয়ে ভাই। নইলে যে পুকুরে কখনো এত বড় বড় মাছ জন্মায় না বা ধরা পড়ে না, জাল ফেলবামাত্র সেখানে একজোড়া ধরা পড়ে গেল। কোথায় এরা ছিল ভেবে পাই না। নিশ্চয় বর্ষার বানে গঙ্গা থেকে ভেসে এসে

মা-লক্ষ্মীর বিয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। আমাদের অঞ্চলে সন্দেশ ভালো আর সস্তা—কলকাতার বড় বড় লোকেরাও নিয়ে যায়। তাও তো দশ সেরের বেশি দিই নি। দইও কলকাতা থেকে আনাই নি—খামারগাছির দই। সব আপনার সুলক্ষণা কন্যার দৌলতে। রাবড়ি তো পাঠাই নি—পেলেন কোথা এই অজগাঁয়ে?

শ্রীধর—আমার এক যজমান পাঠিয়েছেন।

শ্রীমন্ত—ঐ দেখুন মা-লক্ষ্মীর পয়ে কিনা।

আহারপর্ব শেষ হ'লে বিবাহস্থলে ডাক পড়ল শ্রীমন্তবাবুর। দুই পুরোহিতে ঝগড়া। পাত্রপক্ষের পুরোহিত বলে—কন্যাপক্ষের পুরোহিতের দ্বিগুণ দক্ষিণা পাব। কারণ, পাত্রপক্ষ মান্যতর।

আমরা সেখানে গিয়ে শুনি—শ্রীমন্তবাবু নিজের পুরোহিতকে বলছেন—ওহে চক্রবর্তী, কার কাছে দ্বিগুণ দক্ষিণা চাচ্ছ? উনি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে বসেন—অনডুহ্ শব্দের প্রথমার বহুবচন কিংবা শাস্ ধাতুর লোট্ হি বলুন তো, তখন কি হবে? পণ্ডিত যা দিচ্ছেন তাই নিয়ে নাও। কুশণ্ডিকার পরে তোমাকে তুষ্ট করা যাবে।

আহারান্তে আমরা আমাদের সাময়িক আশ্রয়ে ফিরে এলাম। এখন শোওয়ার ব্যবস্থা। একজন বললে—শুয়ে আর কি হবে? যে মশা, ঘুমোতে হবে না। বাপরে, গর্দানমারী মশা!

শ্রীমন্তবাবু কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর সুটকেস খুলে আটটি মশারি, দড়ি ও কাঁটি গজাল বা'র করলেন—বললেন, দুই দুইজন এক মশারিতে। বুঝলে—এখন টাঙাও।

পরদিন প্রাতে দেনা-পাওনা মেটামিটির ছোট সভা বসল। শ্রীমন্তবাবু, তাঁর শ্যালক, জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্ত, শ্রীধর পণ্ডিত, তাঁর ভ্রাতা, তাঁর ছেলে উপস্থিত। বরযাত্রীদের মধ্যে একা আমি। বাকি সবাই প্রাতঃকৃত্যে ব্যস্ত।

গ্রামের স্কুল ও গ্রাম্যদেবতার দাবি মিটিয়ে শ্রীমন্তবাবু শয্যা-

তোলানী বলে ৩০ টাকা ও ঝি-চাকরদের প্রাপ্য বলে ১০ টাকা দিলেন।

শ্রীধর পণ্ডিত বললেন—আমার ঝি-ও নেই, চাকরও নেই, বেহাই মশায়।

শ্রীমন্তবাবু হেসে বললেন—অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক তো কাজকর্ম করেছে—তাদের বকশিস দেবেন। নয়ত, গোরুর গাড়ী চারখানার ভাড়া দেবেন।

তারপর পণ্ডিতমশায় পাঁচশত টাকার নোট বা'র ক'রে শ্রীমন্তবাবুকে দিতে গেলেন, বললেন, বারো শ' টাকার বাকিটা এই নিন।

শ্রীমন্তবাবু বললেন—আপনার কাছে আমি কিছুই পাব না—আমার কাছেই আপনি সাতশো টাকা পাবেন—এই বলে কোটের বুকপকেট থেকে সাতশো টাকার নোট বা'র ক'রে দিতে গেলেন। সবাই অবাক।

শ্রীমন্ত—আপনার কাছ থেকে সাতশো টাকা নিয়ে সাত রাত্রি আমি ঘুমুতে পারিনি, সাতদিন মুখে অন্ন রোচেনি। আপনার পীড়াপীড়িতে, প্রস্তুত না হয়েই ছেলের বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম —তাই টাকাগুলো নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। হাতে কোন টাকাই ছিল না—মালক্ষ্মীই নিজের বিয়ের টাকা যোগাড় ক'রে দিলেন। গৃহিণী বললেন—টাকার জন্য ভাবছ? জয়ন্তের বৃত্তির একটি টাকাও খরচ করিনি, আড়াই বছরে ৫০০ টাকা জমেছে,—আমার কাছেই আছে। তার সোনার মেডেলগুলো দিয়ে মালক্ষ্মীর আশীর্বাদের একগাছা হার অনায়াসে হবে। অনন্তকে লিখেছি কিছু টাকা যোগাড় ক'রে আনবে। আমার বড় ছেলে অনন্ত সওদাগরী অফিসে কাজ ক'রে—তার বোনাসের টাকাটা জমা ছিল—সে ৪৫০ টাকা নিয়ে এলো। পাণ্ডুয়ার কাছে আমার কিছু জমি আছে—সেই জমির ধান দু'বছর থেকে জমছিল, চা'ল তৈরি ক'রে আনাব ভেবেছিলাম—তা আর হয়নি। সেই ধানটা ছেড়ে দেওয়ায় ৮০০ টাকা পেলাম। এসব—

মা-লক্ষ্মীর দৌলতে। বাস! তখন ভাবলাম গরিব পণ্ডিতের সাতশো টাকা কেন নিই। আপনি আপনার সাতশো টাকা ফেরত নিন—জামার বুকপকেটে থেকে তা বুকে অবিরত বিঁধছে। মা-লক্ষ্মীর দৌলতে আমার অর্থের অভাব হবে না। আমার মা বলে গিয়েছিলেন—তোর ছেলে হাকিম হবে—মার আশীর্বাদ ফলবেই। তাঁর আশীর্বাদ, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে মা-লক্ষ্মীর সৌভাগ্য। আমার বাড়বাড়ন্ত অনিবার্য।

শ্রীধর—সত্যই আমার কন্যা সৌভাগ্যবতী, নইলে এমন সোনার চাঁদ স্বামী পায়—না—এমন শিবতুল্য শ্বশুর পায়!

এই ব'লে পণ্ডিত শ্রীমন্তবাবুর দুটি হাত চেপে ধরে কোলে মাথা রেখে হাউ-মাউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন। সবারই চোখে জল। একেই দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন 'মহতের মহত্ত্ব দেখে কাঁদা।'

শ্রীমন্ত—বেহাই মশায়, আজই গদাধর পালের দেনাটা শোধ দিয়ে আসুন।

শ্রীধর—সে খোঁজও আপনি রাখেন দেখছি। একেই বলে আত্মীয়। আপনার মতো আত্মীয় এ যুগে দুর্লভ। কিন্তু আমি যে গহনাও বিশেষ কিছু দিতে পারিনি দাদা।

শ্রীমন্ত—গহনা অর্থাৎ স্বর্ণ, স্বর্ণ অর্থাৎ সুবর্ণ—সু-বর্ণ তো মার সারা অঙ্গে। তার কি গহনার দরকার আছে? 'স্বাঙ্গৈরেব বিভূষিতা' সে। আপনার চেয়ে কে ভাল জানে—'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।' আমি যে রত্ন পেলাম তার মূল্য কিছুই দিই নি। মহত্ত্ব আমার কিছুই নেই—আমি কাল কুৎসিত মেয়েকে বিনাপণে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না। এই মেয়ের ভাগ্যেই জয়ন্তের জয়জয়কার হবে। জয়ন্ত নাম তার সার্থক হবে। মেয়ের নাম দাও জয়ন্তী।

পরমাত্মীয়ের দেনা করা টাকা কি ক'রে লোকে গলাধঃকরণ ক'রে তা ভেবে পাই না। যারা পণ নেয় তারা সে টাকা ঘটাসমারোহ ক'রে

ব্যয় করে—পণের টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধার-করা কিংবা রক্ত-জল-করা। আমি কিছু নিলাম না—কোন ঘটাসমারোহও করব না। আমি যদি এই টাকা নি তা হলে আমার এই পাপে হয়ত ছেলের পরীক্ষার ফল খারাপ হয়ে যাবে, আর আমিও পুত্র ও পুত্রবধূর শেষ পর্যন্ত অশ্রদ্ধেয় হয়ে থাকব। ছেলে বোকাও নয়, মামুলী ধরনের ছেলেও সে নয়।

এতক্ষণে বুঝলাম—সারাদিন ধরে শ্রীমন্তবাবুর এত স্ফূর্তি কেন। পণের টাকা ফেরত এনেছেন সঙ্গে আর বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পেয়েছেন বলে তাঁর এত আনন্দ!

শ্রীধর বললেন—কৌলীন্য মর্যাদাটা দিয়ে দিই, দাদা!

শ্রীমন্ত—(হেসে) না না ও দিতে হবে না। ওটা ওদের মামুলী বরযাত্রার অভিনয় মাত্র—নিছক রসিকতা। যারা এসেছে তারা সবাই কৃতবিদ্য, উদার, নিরভিমান।

শ্রীমন্তবাবুর ছেলে অনন্ত বললে—তা হলে দেনাপাওনা সব মিটে গেল, বাবা।

শ্রীমন্ত—কই আর মিটল রে? আমার বৈবাহিক বরণের কাপড়খানা কই? তা তো আমি ছাড়ব না।

শ্রীধরের পুত্র ধুতিখানা আনতে ছুটে গেল।

শ্রীমন্ত—আরো একটা দাবি আছে—সকালে উঠে দেখলাম আমার জুতো চুরি গিয়েছে—কি পায়ে দিয়ে আমি যাই?

শ্রীধর—সে কি? তাত জানিনা। পায়ের মাপ নিয়ে আমি লোক পাঠিয়ে জুতো আনিয়ে দিই।

শ্রীমন্ত—তা আর করতে হবে না। ছেলের জুতো আমার পায়ে ঠিক হয়—তাকে যে জুতো দিয়েছেন—তাই নিয়ে আসুন। সে জরির জুতোই আজ পরে থাকুক। আচ্ছা জুতোচোরদের পাল্লায় পড়েছি যা হোক! এখন তাড়াতাড়ি পালাতে পারলেই বাঁচি।

ভালো কথা, বেহাই মশায়, আপনার গোয়ালের চালের উপর

যে বিরাট কুমড়াটি বিরাজ করছে, আমি কিন্তু জুতার বদলে তা নিয়ে যাব। বৌভাতে লাগবে।

তক্ষনি সে কুমড়া চাল থেকে নেমে এলো, সঙ্গে আরো দুটি।

এরূপ চরিত্রের বরের পিতা সেকালে দুর্লভ ছিল না। একালে এমন আদর্শ বরকর্তা দেখিনি।

বরযাত্রীদের মুখে কন্যাপক্ষের যে নিন্দা রটে—তার প্রধান কারণ বরকর্তা কন্যার পিতার সঙ্গে বিবাহরাত্রিতে সহযোগিতা করেন না ব'লে।

জয়ন্তকে সব কথা যখন বললাম তখন সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বললে, কোন ডিগ্রীগৌরব আমায় পিতৃগৌরবকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

জয়ন্ত অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিল। ইংরেজির এম-এ তে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্ষ্ট হয়। তারপর ইতিহাসে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে সত্য সত্যই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রিটায়ার ক'রে দুই তিন বছর আগে সে মারা গেছে। ছেলেরা সকলেই কৃতী। তার স্ত্রী জয়ন্তী (নতুন নাম) কাব্যতীর্থ পাশ ক'রে শেষ পর্যন্ত প্রাইভেটে বি-এ পর্যন্ত পাস করে। বি-এতে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পায়। এম-এ পরীক্ষা দেয়নি।

কন্যাদায়

মেয়ের বিয়ের পর নিখিল সেদিন এসেছিল। তাকে বললাম "কি হে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল? এখন হাল্‌কা অনুভব কর্‌ছ ত?"

নিখিল—হ্যাঁ দাদা। শরীর, মন, ব্যাঙ্কব্যালান্স, ক্যাশ-বাক্স সবই হালকা লাগছে। এখন আশীর্বাদ করুন—মেয়ে জামাই সুখী হোক। এখন আমি বৈবাহিকের প্রজা ও খাতক।

ও-হ্যাঁ, আপনি সেদিন কিছুই খেলেন না—সেজন্য—

আমি—কেন? তুমি তো মিষ্টান্ন পাঠিয়েছিলে—ইতরজনের প্রাপ্য আর কি আছে? অনেক দিনের কৃচ্ছ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'ল, কি বল?

নিখিল—মেয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকে পাত্র খুঁজেছি আর আজ সে এম-এ দিতে চলল। পড়ানো তো বিয়ে দিতে না পারার জন্য মেয়েকে ব্যাপৃত রাখা।

আমি—শুধু তা' বলছ কেন? মেয়ে গ্রাজুয়েট তো হাজার হাজার, কাজেই বিয়ের জন্য কোয়ালিফায়েড করতেও পড়াতে হবে। মেয়েদের বিয়ে তো কমপিটিটিভ পরীক্ষা। তাছাড়া, বিয়ে যদি না-ই হয়, তা হলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ ক'রে আত্মভরণ, আত্মীয়ভরণ ও আত্মমর্যাদা রক্ষা ক'রে চলতে পারবে। শ্বশুরালয়ে শাসিতা না হয়ে বিদ্যালয়ে শাসিকা হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

তাছাড়া, আরও একটা দিক থেকে ভেবে দেখ, শিক্ষিতা মেয়ে চাকরি করলে বিয়ে সহজ হয়ে পড়ে। যদি বিবাহার্থীর আয় অল্প হয়—পত্নীর আয় তার পরিপূরক হয়ে আর্থিকসমস্যার সমাধান করতে পারে। কাজেই নানা কারণে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। আর কিছু না হোক বৌদিদিদের ঝি ও রাঁধুনী হয়ে তাকে থাকতে হবে না। আজ কাল অনেক মেয়ে ভর্তারও ভর্ত্রী হচ্ছে।

যাক—পাত্র এখন বড়ই দুর্লভ হে ভায়া, 'হাঁটু ঢাকি বস্ত্র আর পেটভরি ভাত দিয়ে'ও ভর্তা নামের সার্থকতা সম্পাদন করতে পারে কম যুবকই। পাত্র অন্য দেশেও দুর্লভ। দেখনা—বিলাত থেকে দলে দলে ভারতীয় যুবকরা মেম বিয়ে ক'রে আসছে। তাতে বুঝছ না—ইউরোপেও পাত্র কত দুর্লভ। এখন তো মেমেরা শিক্ষিত কাফরি যুবকদেরও বিয়ে করছে। আমাদের দেশের বহু সুশিক্ষিত সুপাত্রকে অবাঙ্গালী মেয়েরাও দখল ক'রে নিচ্ছে।

নিখিল—শুধু কি তাই, দাদা? দেশের আর্থনীতিক দুর্দিনে বহু শিক্ষিত যুবকই বিয়ে করতে চায় না। উচ্চশিক্ষিত যুবকরা যতটা দূরদর্শী, অল্পশিক্ষিত যুবকরা ততটা দূরদর্শী নয়। তারা কোনরূপে চলে গেলেই বিবাহ করতে রাজী হয়। আমরা শিক্ষিতা মেয়েদের তাদের হাতে সমর্পণ করতে তো চাই না। আমি উচ্চ-শিক্ষিত উপার্জনক্ষম যুবকদের কথাই বলছি। আমি এই কয় বছর পাত্র খুঁজতে গিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাই বলছি।

বিয়ে করতে না চাওয়ার কারণ অনেক।

আয় অল্প বলে, কেউ কেউ চাকরিতে প্রসপেক্ট নেই বলে, বিয়ে করতে চায় না।

কেউ কেউ চায় না পরিবারে প্রতিপাল্য অনেক বলে। কেউ কেউ ভগিনীদের বিবাহ হয়নি বলে চায় না, কেউ কেউ বাড়ীতে রাত্রি-বাসের পৃথক একটা ঘর নেই বলে। অনেকে চায় না সন্তান-সন্ততি হ'লে চিরদরিদ্র জীবন যাপন করতে হবে এই ভয়ে। জীবনে সংসারধর্মের চেয়ে মহত্তর ব্রত পালন করার উদ্দেশ্য থাকলেও কেউ কেউ চিরকুমার থাকতে চায়।

যৌবনে স্ত্রী বিয়োগ হ'লে কেউ আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চায় না। স্বাস্থ্য সন্তোষজনক না হ'লেও বিবেচক ছেলেরা বিয়ে করে না।

আমি এক শিক্ষককে জানি, সে তার প্রত্যেক ভাইটিকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে বোনদের বিয়ে দিয়ে প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে নিজে

বিবাহ করেছে। তবুতো বিয়ে করেছে সে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হয়ে গেলে অনেকে আর বিয়েই করে না।

এই সব কারণে—বাপ-মাও ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য আদৌ আগ্রহশীল নয়, যেমন—

১। ছেলে পর হয়ে যাবে ভয়ে ও তাতে সংসারের আর্থিক ক্ষতি হবে বলে।

২। কন্যাদের বিয়ে হয়নি বলে।

৩। পরিবারের আয় অল্প থাকলে।

৪। বড় একটা দাঁও-এর প্রত্যাশায় থাকলে—বাপ-মা ছেলের বিয়ের জন্য উৎসুক হয় না। এমন লোককে জানি—যিনি নিজের কৃতী সন্তানের বিবাহে বড় দাঁও পাবার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে শেষে পুত্রবধূ পেলেন একটি দরিদ্রঘরের অসবর্ণা মহিলা। শ্বশুর পরিবারই ছেলের প্রতিপাল্য হয়ে উঠল। ছেলে নিজে আর প্রতীক্ষা করতে পারল না।

একস্থলে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে জবাব পেলাম—'খোকার কথা বলছেন? ও-ত সেদিনের ছেলে। কতই আর বয়স, মাত্র ত্রিশ বত্রিশ বৎসর, বিয়ের বয়স হোক।'

আর একস্থলে জবাব পেলাম—'এই ত সাবডেপুটি হয়েছে, ডেপুটি হোক, তারপর বিয়ে করবে।' আমি বলেছিলাম—"বলুন না, রিটায়ার করুক, তারপর বিয়ে করবে।"

আর একস্থলে জবাব পেলাম—'এম-এ ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে একটা কলেজে ঢুকেছে বটে, কিন্তু ও এখন থিসিস লিখবে, বিলেত যাবে। ওকে ডিস্টার্ব করতে চাই না।'

আর এক স্থলের কথা বলি—বাপ বললে—'ও বিলাত যাবে এখন—আরো উঁচু ডাক্তারী ডিগ্রী নিয়ে আসবে, তারপর প্র্যাকটিস্ জমলে বিয়ে করবে।' আমি বললাম—'বিয়ে ক'রে বিলাত যাওয়াই তো ভালো, নইলে বিয়ে করে আসতেও তো পারে।'

বাপ রেগে বললেন—আমার ছেলে তেমন নয় মশাই, আমাদের পরিবার শ্রীপাট কানাই হাটের বৈষ্ণব বংশ—গোঁড়া হিন্দু—এতবড় স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু এ অঞ্চলে নেই। এমন সুবোধ শান্ত সংযমী ছেলে আর হয় না।' বলা বাহুল্য, বিলেত গিয়ে সে সত্যসত্যই মেম বিয়ে করে ফিরেছে।

আর এক বাপ বলেছিল—'ওর আইবুড়ো বোনের বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে, ও কোন লজ্জায় নিজে বিয়ে করবে?' খোঁজ নিয়ে জেনেছি সে প্রতীক্ষা করতে না পেরে এক সন্তানবতী বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেছে।

মুশ্‌কিল হয়েছে কোথায় জানেন? পাত্রসন্ধানের গণ্ডীটা আমাদের ছোট। প্রথমতঃ জাতিভেদ আছে,—তারপর সমাজ-ভেদ আছে, পূর্ব-পশ্চিম ভেদ আছে। তারপর গোত্রভেদ আছে,—তারপর কোষ্ঠীর মিল আছে। ক্ষেত্রপরিসর সীমাবদ্ধ। এরই মধ্যে ইন্দ্রত্ব করছেন—যত সমরেন্দ্র, অমরেন্দ্র, নরেন্দ্র, রবীন্দ্র, অহীন্দ্রদের দল। তাদেরই একজনকে যে চাই। এই সব বাধা-নিষেধ না থাকলে পাত্র সন্ধান অনেক সহজ হ'ত। আমিও অসবর্ণ বা অসামাজিক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলাম না। কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে আমার এখন অভিমত—জাতিভেদ উঠে যাওয়াই ভালো। আর লাভ ম্যারেজ ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আপনারা যদ্দিন আছেন ততদিন কন্যাদায়ের প্রতিকার হবে না।

আমি—আমরা এখনো গতানুগতিক প্রথা মেনেই চলছি সত্য কিন্তু যারা মানছে না,—তাদের ত্যাগও তো করি না, সমাজচ্যুত তো করছি না, স্বৈরাচার স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে কাউকে আমরা বাদ দিই না—সকল প্রকার বিবাহের নিমন্ত্রণে আমরা যোগও দিয়ে থাকি।

সমাজ এখন ব্রাহ্মণ্যশাসনে নেই। কোন প্রকার সামাজিক অনুশাসনও আর সক্রিয় নেই। তোমাদেরই সাহসের অভাব আছে।

দশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের পাত্রপাত্রীর পিতারা নবপ্রচলিত সর্ব সংস্কারমুক্ত পদ্ধতিতে পুত্র-কন্যার বিবাহ স্থির করতে বাধ্য হবে। আমরা আর কি করতে পারি?

নিখিল—গতানুগতিক প্রথায় বিরুদ্ধে আপনারা লেখেন না ত?

আমি—নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মত যে ভাঙন ধারার গতি—তা তো অনিবার্য—তার পক্ষে কিছু কি লেখার বা বলবার প্রয়োজন হয়? বরং সামাজিক জীবনে যে ভাঙন চলছে—অথচ গড়ন হচ্ছে না, তারমধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বৈরাচার, অসংযম, উদ্দামতা দেখা যাচ্ছে—তার বিরুদ্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। যেমন, তথাকথিত রূপমোহকে প্রেম আখ্যা দিয়ে কোন-একটা বিজাতীয়া নারীর জন্য নিজের পরিবার, সমাজ, ধর্ম, সর্বপ্রকার স্নেহ-প্রীতির বন্ধনছেদনের হঠকারিতার জয়গান আমরা করতে পারছি না। সাহিত্যিক হিসাবে বৈবাহিক ব্যাপারে যা কিছু সুন্দর শোভন, সুষ্ঠু সুসঙ্গত তা গতানুগতিক না হলেও আমাদের অভিনন্দন পাবে। প্রগতির নামে যা কিছু অসঙ্গত, কদর্য, অশোভন, সর্বদেশে সর্বযুগে নিন্দনীয়, তা আমাদের অভিনন্দনীয় হতে পারে না।

নিখিল—গতানুগতিক প্রথায় কন্যার বিবাহ দেওয়া কঠিন বলেই আমার মনে হয়, এর চেয়ে পাত্রানুসন্ধানে বৃহত্তর সমাজ পাওয়ার দরকার। ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝাবে না কি দারুণ অপমান ও হীনতার দুঃখ যে পেয়েছি। তা কন্যাহীনরা একেবারে উপলব্ধি করতে পারবে না। আপনি জানেন ছাত্রজীবন থেকে বীরদর্পে সগৌরবে বরাবর অগ্রসর হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ছাত্রজীবনে, কর্মজীবনে, সামাজিক জীবনে কখনও কোথাও মাথা নত করিনি। সামাজিক অনুশাসনে শেষে প্রৌঢ় বয়সে কন্যার জন্য কত যে পুত্রমূলধনীর পায়ে অবনত হতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কত যে অবরেণ্য ঘরের বরকে বরণ করবার জন্য সাধাসাধি করেছি—তাই

ভেবে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছি। বহুক্ষেত্রে পত্রের উত্তর পাইনি টিকিট পাঠিয়েও। কেউ কেউ দোতালার বারান্দা হতেই বিদায় দিয়েছে। কেউ বলেছে তিন বছর পরে আসবেন দেখা যাবে। মেয়ের ফোটো দিয়েছি ৪০।৫০ জায়গার, আর কোষ্ঠীর নকল দিয়েছি প্রায় সর্বত্র—অনাচারী ম্লেচ্ছ ভাবাপন্নের তাগিদেও। আচ্ছা এ দেশ ছাড়া জগতে শতাধিক দেশ আছে, সে সব দেশেও বিবাহ হয়, সে সব লোকে কি কোষ্ঠী মিলিয়ে বিবাহ দেয়? এত যে লাভম্যারেজ হয়—যুবক-যুবতী কি কোষ্ঠী দেখে প্রেম করে?

আমি—কোষ্ঠীটা নিয়ে রাখে কিন্তু মেলায় না সবাই। যেখানে চক্ষুলজ্জার বালাই আছে সেখানে অপ্রিয় কথা না বলে প্রত্যাখ্যানের অজুহাতটা কোষ্ঠীর নামে চালায়।

নিখিল—কোথাও কোষ্ঠীতে যদি বা মিল হল,—গোষ্ঠীতে মিলল না। কোথাও শিক্ষার উচ্চতায় হয়ত মিল্‌ল, কিন্তু চেহারার উচ্চতা ২।৪ ইঞ্চি কম হ'ল। মাথার চুলের ঘনতা মঞ্জুর হ'ল তো চুলের দীর্ঘতা মঞ্জুর হ'ল না। গায়ের সু-বর্ণ মঞ্জুর হ'ল তো গায়ের স্ুবর্ণের প্রস্তাবিত ওজন মঞ্জুর হ'ল না। এই সকল পাত্রের পিতাদের কেউ কেউ বলেন, অমুক চৌধুরী গ্রে ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী দিতে চেয়েছিল, অমুক মল্লিক একখানা গাড়ী দিতে চেয়েছিল, অমুক মজুমদার ২৫ হাজার টাকা খরচ করতে চেয়েছিল, অমুক রায় এটর্নীর একটি মাত্র কন্যা—আর কোন সন্তান নেই, সন্তান হওয়ার আশঙ্কাও নেই—তার সর্বস্বই পাওয়া যেতে পারত। সকলেই বলেছেন, ছেলে পর হয়ে যাবে বলে বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিতে চান না। বিয়ে দিতে চান যে ঘর বড়-লোকের ঘর নয় অথচ বড়লোকের মত পণ যৌতুক দেবে? তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছি—আপনারা কি চান—যথা-সর্বস্ব দিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত হয়ে থাকুক কন্যার পরিবার। নেহাৎ গরীব হয়ে পড়লে আবার অন্য অসুবিধা আছে ত। তার উত্তরে তাঁরা বললেন—'আমরা পণযৌতুক চাই না।'

অবশ্য কেউ কেউ অর্থলোভী ন'ন তবে গরীব ঘরের খুব সুন্দরী সুশিক্ষিতা কন্যাও নিতে চান না,—তাতে সে ঘর পাত্রেরই শেষ পর্যন্ত প্রতিপাল্য হয়ে পড়বে এই আশঙ্কায়। শিক্ষিতা মেয়েকে সেজে-গুজে বসতে হয়েছে কত-বার। সে বারবারই কেঁদে বলেছে আমার বিয়েতে কাজ নেই বাবা। দু মুঠো অন্ন—তুমি আমাকে দিতে পারবে না মা, আমি দাসীর মতো খাটব তোমাদের সংসারে। কি করুণ, দাদা, চোখ ফেটে জল পড়েছে। আপনি কবি, আপনি বুঝবেন। বিধাতা নারীকে অসহায়া অবলা করে গড়েছেন। আমরা যতই তাদের ভাগ্য ফেরাতে চাই। খোদার উপর খোদকারি চলে না। সে আজ আর একভাবে অবলা অসহায়া।

কোন কোন স্থলে অনেক হাঁটাহাঁটির পর কন্যা দেখায় সম্মত করেছি। একদল ইয়ারদোস্ত নিয়ে দেখতে এসেছেন হয়ত পাত্র নিজে। তাদের কেউ শুধিয়েছে অভিনয় করতে জানো? কেউ প্রশ্ন করেছে, ভারতীয় নৃত্য-কলা জানা আছে? ডিশ-ডিশ খাবার খেয়ে চলে গেছে। পরে জানিয়েছে—ভোটের মেজরিটিতে না-মঞ্জুর। সুখাদ্যের দুর্মূল্যতার দিনে এইরূপ অনেক গ্যাং ঘুরে বেড়াচ্ছে। একপাল বেঁটে মোটা মেয়েমানুষ এসেছে, তারা দেখে বলে গেছে চেহারাটা ঢেঙা-ঢেঙা লাগছে। আর একপাল ঢেঙা রোগা মেয়েমানুষ এসে বলেছে, বেঁটে বেঁটে লাগছে, একটু মোটাও মনে হচ্ছে। প্রবীণেরা সঙ্গে এনেছেন জ্যোতিষী, করকোষ্ঠী দেখে তিনি বলেছেন, সুলক্ষণা বটে কিন্তু সন্তানভাগ্য ভালো নয়। কোন যুবক বলেছে—এম-এ পড়ছে তো, বি-এর মার্কশীট দেখি। মার্কশীট দেখে বলেছে—সব সাবজেক্টেই উইক দেখছি—তাই বাংলায় এম-এ পড়ছে বুঝি? আচ্ছা, এম-এর রেজাল্ট বেরুনোর পর যেন আবেদন করা হয়, তখন বিবেচনা করা যাবে? অনেক সুপাত্রই বেঁটে, তাদের অভিভাবকরা বলেছেন—সাজন্ত হবে না। হাইট কয়েক ইঞ্চি কম হলে হ'ত। কেউ কেউ বলেছেন—ছেলে বেঁটে, কনে আরো ঢেঙা না হলে ছেলেপুলে বেঁটে

হবে। আবার কেউ বলেছে ছেলে কালো, মেয়ে আরো গৌরাঙ্গী হওয়া চাই—নতুবা ছেলেপুলে কালো হতে পারে।

তিন চারশো টাকা আয়ের ৩৪।৩৫ বৎসর বয়সের পাত্র কয়েকটি সন্ধানে এসেছিল, কিন্তু বয়সের অনেক তফাৎ হয় এবং তাদের অনেক প্রতিপাল্য বলে চেষ্টা করা হয়নি। তাদের মাতাপিতারও বিবাহ দিতে আগ্রহ দেখা গেল না। এরা বেশির ভাগ শিক্ষা বিভাগের লোক।

আমি—দেখ, দেশে সুপাত্র বলতে এখন ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, উচ্চপদের সরকারী কর্মচারী। উকিলরাও পশার না হলে বিয়ে করতে চায় না। চাকরি পেয়ে অনেক ডাক্তার বিয়ে করে। ইঞ্জিনীয়ারদের এখন খুব কদর। পাস ক'রে বেরিয়েই কাজ পেয়ে যায়। প্রসপেক্টও আছে, তারাই তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়। ফলে, তাদের দরজায় শিক্ষিতা কন্যার বাপেদের ছুটাছুটি চলে। বিবাহের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ধনী ঘরের ও উচ্চ মধ্যবিত্ত রের সুশ্রী মেয়েরা উত্তীর্ণ হয়। এখন ওরাই মহাকুলীনের সন্তান।

তাদের জন্য কন্যার বাপ-মার বকাণ্ড-প্রত্যাশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। বৃথা তাদের পিছে পিছে ঘুরে সময় ও মান নষ্ট না করাই উচিত। অধ্যাপকদের আয় এখন নিতান্ত মন্দ নয়—তাদের চেয়েও ভালো বি-টি-পাশ করা ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকদের। তারা প্রাইভেট টিউসনী ক'রে অনেক টাকা রোজগার করে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার প্রবর্তনের পর ছেলেরা বিজ্ঞান শাখায় ভিড় করছে—তাদের কোচিঙের জন্য গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকদের খুবই কদর। আর ইংরেজি শিক্ষকদের দরকার বাকি সব শাখাতেই। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রানুসন্ধান করাই উচিত। এখনো মাষ্টার বলে একটা অবজ্ঞার ভাব চালু আছে, সেই ভ্রান্ত সংস্কারটা ভুলতে হবে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও সন্ধান করতে হয়। আজকাল বাঙালীর ব্যবসা মাত্রই ফেল করে না। ভালো আয়

করতে না পারলে, যুবকদের বিবাহ করবার যোগ্যতা হবে না। অনেকের বিবাহের উপযুক্ত হতে যৌবন বিগত হবে, অনেকেরই বিবাহ করা আর সম্ভব হবে না।

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বার বার শুনিয়ে দেওয়া ভালো যে, মন দিয়ে পড়াশুনা করে ভাল করে পাস না করলে মা-বোনকেও খেতে দিতে পারবে না—বিবাহের যোগ্যতা লাভ তো দূরের কথা! বাপ-জ্যাঠার সময় আর নেই—দিনকাল বদলে গেছে—দাদাদের দিকে চেয়ে দেখে শেখ। দেখছ না দাদাদের ত্রিশ পার হয়েছে—কিন্তু আজো তাদের বিয়ে হয়নি, কেন? বারবারই বলতে হবে আর কোন কারণে না হোক বিয়ে করার যোগ্যতালাভের জন্য অন্ততঃ প্রাণপাত ক'রে পরিশ্রম কর, বাছারা। শুনে ছেলেরা হয়ত হাসবে। কিন্তু মেয়েরা হাসবে না। ছেলেরা বলবে, আমরা তো বিয়েই কর্‌ব না। অর্থাৎ বরং বিয়ে কর্‌ব না, পরিবার প্রতিপালনের ভার নেব না, কিন্তু মন দিয়ে পড়াশুনা করতে পার্‌ব না, স্যার। কোন প্রকারে পাস করলেই চলবে। কেউ কেউ হয়ত বলবে—জীবনটা ক' দিনের স্যার—এর জন্য প্রাণপাত করে খেটে ভালো করে পাস করে কি হবে?

যুগের সঙ্গে সন্ধি

বন্ধু সুরপতি খুব উত্তেজিত হয়ে এসে বলল—শুনেছ, মিণ্টু-বাবুর মেয়েটা কি করেছে ?

আমি—কি করেছে ?

সুর—সে তার স্বামি-সংসার ত্যাগ ক'রে সিনেমায় যোগ দিয়েছে। নবাগতা তারকা ব'লে তার ছবি বেরিয়েছে কাগজে।

আমি—তাতে আর হ'লো কি ? এতো আকছারই হচ্ছে, হবে। ডাইভোর্স আইন পাস হয়েছে, স্বামী ত্যাগ করে কত জন অন্য স্বামীই গ্রহণ করছে। এদেশে নতুন বটে, অন্য দেশে এ-তো স্বাভাবিক। এখন সারা দুনিয়ার পানে চেয়ে বিচার করতে হবে। যারা এইসব দুঃসাহসের কাজ করে, তারা সারা দুনিয়ার সমর্থনের পানে চেয়েই করে।

সুর—তাইত বলছি—চারদিকে কি কাণ্ডই না হচ্ছে। এ সমাজে থাকলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও ঐসব দেখে কোন্ দিন কি করে তার ঠিকঠিকানা কি ? বড় ভাবিয়ে তুলেছে হে যুগের হাওয়া।

আমি—দেখ সুরপতি, ভেবে আর কি হবে ? যা অনিবার্য তা ঘটবেই। যুগধর্মকে এড়াবার ক্ষমতা কারো নেই।

সুরপতি—ইংরেজ এ-দেশে রাজত্ব করছিল। আমাদের যৌবনকালে ইংরেজরা তো দোর্দণ্ড প্রতাপেই শাসন করছিল। তবু তখন তো এইসব অনাসৃষ্টি হয় নি বললেই হয়। এখন ইংরেজ চলে গেল—কোথা ভারতীয় ভাব-ভাবনা ফিরে আসবে—তা না হয়ে বিজাতীয় স্বেচ্ছাচারের ভাব দিনদিন সারা সমাজটাকে গ্রাস করছে।

আমি—ইংরেজ আমাদের মধ্যেই ছিল কিন্তু ইউরোপ ছিল বহু দূরেই। এখন ইংরেজ গেছে, কিন্তু ইউরোপ ঘরের কাছে

এসেছে। রেডিও ও বিমানের প্রসাদে এখন ইউরোপের দেশগুলো এপাড়া-ওপাড়া হ'য়ে গেছে। দেখছ না এখন কত লোক দলে দলে ইউরোপ যাচ্ছে। ইউরোপ তো এখন আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র, তীর্থ, কাশী-গয়া-বৃন্দাবন! তা ছাড়া, আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্তু এদিকে দেশে ইউরোপের সংস্কৃতিগত দিগ্‌বিজয় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। ইউরোপীয় ভাবধারা নানা পথ দিয়ে আমাদের সমাজে ওতপ্রোত হয়ে যাচ্ছে! তা ছাড়া, এটমস্‌ফিয়ারের পথে কোন বাঁধ-প্রাচীর তো নেই, কোন বেরিয়ার নেই, সমগ্র পৃথিবীর এটমস্‌ফিয়ার যে-সব ভাব-ভাবনার লীলাক্ষেত্র, সে সব ভাব-ভাবনাকে রোধ করবে কি দিয়ে?

সুরপতি—বুঝলাম, কিন্তু আমাদেরও তো একটা সভ্যতা আছে—যে সভ্যতার আমরা গৌরব করি। সে সভ্যতা কি এ-সব রুখতে পারবে না?

আমি—আমাদের সভ্যতা আমাদেরি মত জরাজীর্ণ দুর্বল। তরুণ সভ্যতার সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি তার নেই।

সুরপতি—সবগুলোকে না হোক কতকগুলো অনাচারকে আমরা তো রুখতে পারি।

আমি—কি ক'রে পারবে? যে-গুলোকে অনাচার বলছ সেগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। কান টানলে মাথা আসে—একটা ধ'রে টান দিলে একে একে সবগুলিই আসে। কার্য কারণ পরম্পরায় শৃঙ্খলিত। কাজ করব, ফল নেব না তা গীতাতেই চলে—সমাজে চলে না। ধর নারী-শিক্ষা। তোমার মেয়েরা কলেজে পড়ছে তো?

সুর—হাঁ, তা পড়ছে। পড়াশুনা তো খারাপ নয়। পড়াশুনা তো অনাচার নয়।

আমি—খারাপ আমি বলছি না, সদাচারই বলছি। তুমি যে-সবকে অনাচার বলছ সেগুলো ঐ সদাচারেরই ফল কি না ভেবে

দেখেছ? নারীশিক্ষা ধ'রে টান দিলেই তুমি প্রায় সবগুলিকেই পাবে। আমাদের মেয়েরা কি শিক্ষা পাচ্ছে?

সুর—স্কুলে কলেজে ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছে, ইতিহাস, ইকনমিকস্, বিজ্ঞান শিখছে। তাতে আর দোষ কি?

আমি—দোষের কথা আমি বলছি না। শিক্ষা পাচ্ছে—কাজেই তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা ভাবছি না, পাত্রও সুলভ নয়। তারা সকালে উঠে কলেজের পড়া করছে—দুপুরে কলেজ যাচ্ছে—বৈকালে তারা পার্কে একটু বেড়াতে যাচ্ছে—সন্ধ্যায় এসে বই নিয়ে কিংবা গীটার-হারমনিয়াম নিয়ে বসছে।

সুরপতি—তা'ত করতেই হবে। পাস করা চাইত। পাস না করলে তো ভালো পাত্র মিলবে না। গানবাজনাও শেখা চাই।

আমি—কিন্তু তারা হিন্দু-সংসারের কাজ কারবার বা মা-কে কাজে সাহায্য করবার সময় পাচ্ছে না। ঘর-সংসারের কাজকর্ম কিছু শিখছে না। একে তুমি অনাচার বলবে নিশ্চয়?

সুরপতি—তা কেন? ঘর-সংসারের কাজ, রান্নাবাড়া সব শেখালেই তো হ'ল—ছুটি তো আছে—মাঝে মাঝে।

আমি—তাদের পড়ার ক্ষতি হবে বলে তাদের আমরা ঘরের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে থাকি, দেহের শ্রী নষ্ট হবে বলে রান্নাঘরে ঢুকতে দিই না, সত্যি কি না? আর কাজ শেখা এক জিনিস, আর কাজ করার অভ্যাস থাকা আলাদা জিনিস। ঘরের কাজকে ভালবাসা বা কাজ করার অভ্যাস না জন্মালে পরবর্তী জীবনে ঘরের কাজ এড়াবার আগ্রহই থেকে যাবে। ঘরের কাজকর্মকে নীচ কাজ মনে হবেই। কাজেই পরবর্তী জীবনে এজন্য ভৃত্যাদির উপর নির্ভর করবার প্রবৃত্তিই হবে এবং মেয়েরা কার্যান্তর খুঁজবেই।

সুরপতি—ঠেলায় পড়লে ঘরের কাজ সবই করবে।

আমি—ঠেলায় যাতে না পড়ে সেজন্যই তো উচ্চশিক্ষা দিচ্ছ। এমন পাত্রের কথা ভেবে রেখেছ—যার সঙ্গে বিয়ে হলে ঝি-চাকরের

উপর সব ছেড়ে দিতে পারবে। যাক—এটা তুচ্ছ কথা। এই নারীশিক্ষার ফলে আমরা মেয়েদের বহুদিন ধরে পুষতে বাধ্য হচ্ছি—এমন কি ছেলেদের চেয়ে বেশি ব্যয় ও তাদের যত্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। অথচ ভাইবোনদের সঙ্গে তাদের সেই হৃদ্য মধুর সম্বন্ধ ঘটছে না আগেকার মতো।

স্বরপতি—কেন, তা ঘটবে না? একসঙ্গেই তো মানুষ হচ্ছে!

আমি—তুমি তো জানো—আগে আমাদের মেয়েরা বেশিদিন বাপের ঘরে থাকত না, কিন্তু ওরই মধ্যে ছোট ভাইবোনদের কোলে-পিঠে করে মানুষ ক'রে মার সহায়তা করত। তাতে যতটা অন্তরের মধুর সম্পর্ক ঘটত, এক মেসে থাকার মত বাপের ঘরে থেকেও ভাই-বোনদের মধ্যে সে মধুর সম্বন্ধ আর ঘটছে না! এও তো অনিবার্য। ভাই-বোনদের মধ্যে ঈর্ষার সম্বন্ধ ঘটবার অবসরও দেওয়া হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া, বেশ-ভূষা, পরীক্ষায় পাশ-ফেল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তারতম্য ইত্যাদি ঈর্ষার উদ্দীপক অনেক কিছু ভাববার আছে। যাক্‌গে, এ-সব মাইনর কথা। নারীশিক্ষার সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে তো নিতেই হয়েছে।

স্বরপতি—কেন তাদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রয়োজন কি?

আমি—কলেজে যাবে, ক'টা কলেজের মেয়ের নিজেদের গাড়ি আছে? হয় হেঁটে, নয় ট্রামে-বাসে তাদের যেতে হয়। এই তো স্বাধীনতা। সঙ্গে তো কেউ থাকছে না—১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তার গতিবিধি কে লক্ষ্য করছে?

স্বরপতি—কো-এডুকেশন-এর ছাত্রী না হলে তো ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারবে না। কো-এডুকেশন বন্ধ করলেই তো চলে।

আমি—উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বন্ধ করা একেবারেই সম্ভব নয়। নারী-পুরুষ একসঙ্গে পথে হাঁটবে, বিবিধ যানে একসঙ্গে চলাফেরা করবে, সভাসমিতি, সিনেমা, নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে একসঙ্গে মিলিত হবে, আর একসঙ্গে শিক্ষালাভ করতে পাবে

না,—এও কি ভাবা যায়? তা ছাড়া, সহপাঠিনীদের বাড়িতে তো যাবে—সেখানে তাদের ভাইদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে তো? না, সহপাঠিনীদের দাদা-কাকাকে দেখে ঘোমটা দিয়ে স'রে যাবে? তারপর মেয়ের দাদাদের বন্ধুরাও বাড়িতে আসবে —বাড়িতে আত্মীয়-প্রতিবেশীদের ছেলেরাও তো আসবে। বাড়ির বাইরে প্রতিবেশী ছেলেদের সঙ্গেও তো দেখা-সাক্ষাৎ হবে। কলেজে-পড়া অবিবাহিতা মেয়েকে কেউ কি পাহারা দিয়ে ছেলেদের কাছ থেকে দূরে দূরে রাখে? বিদেশী উচ্চশিক্ষার সঙ্গে এরূপ সতর্কতা বা অবিশ্বাস খাপ খায় না, বয়ঃপ্রাপ্তা ছাত্রীদের মর্যাদাও এতে ক্ষুণ্ণ হয়।

সুর—বেশ—তা না-হয় হ'লো। তাতে অনাচারের ভয়টা কি?

আমি—তাতে বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়ের সঙ্গে কোন-না-কোন যুবকের প্রণয় ঘটতে পারে, সে প্রণয় শেষ পর্যন্ত বিবাহে পরিণত হ'তে পারে। এ বিবাহ আর্থনীতিক দিক থেকে বাঞ্ছনীয় না হ'তে পারে। পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও তা না হ'তে পারে। প্রণয়টা একটা অপদার্থ ছেলের সঙ্গে ঘটতে পারে, ভিন্ন জাতের ছেলের সঙ্গেও হ'তে পারে। কত সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে তরুণ দরিদ্র প্রাইভেট টিউটারকে বিয়ে করেছে। আবার কোন কোন মেয়ে নিজের আত্মীয় পুত্রকেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলেও বিয়ে করেছে—আর অসবর্ণ বিয়ে তো এখন ঘরে ঘরেই। এ-সবকে তো অনাচার বলবে। উচ্চশিক্ষার ফলে যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার ফলে এরূপ বিয়ে হরদমই হচ্ছে, হবে—অবাঙালীর সঙ্গেও বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে, হবে। অতএব দেখ, শিক্ষারূপ সদাচারের ফলেই এ-সব অনাচার কি না!

মেয়ে কলেজে গিয়ে কোন রাজনীতিক দলে যোগ দিতে পারে—তখন সেই পার্টির কোন উপার্জনে অক্ষম কিংবা অসবর্ণ বা বিজাতীয় বন্ধুকে বিয়ে করতে পারে। মূর্খ চরিত্রহীন যুবককেও বিয়ে করতে পারে। উচ্চশিক্ষার পথে এ-সব যুগধর্মের অনিবার্য পরিণতি।

তুমি খুব জোর কো-এডুকেশনটা এড়াতে পারো—কিংবা মেয়েকে পাড়ার ক্লাব-সমিতিতে মিশতে দিতে না পার—তার বেশি সাবধান হ'তে পার না। এইরূপ তথাকথিত বৈবাহিক অনাচার বন্ধ করতে হ'লে উচ্চশিক্ষাই বন্ধ করতে হয়। প্রচলিত সামাজিক সংস্কার জয় করার জন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়। প্রধানত উচ্চশিক্ষাই মেয়েদের সাহসিনী করে। এ-সবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে—অনাচার ব'লে যা মনে কর তার সঙ্গে সন্ধি করতেও হবে। আমরা বর্ষীয়ানরা না পারি—কনীয়ানরা তা পারছে। অনেক সদাচারী পিতা ভাবেন, তাঁদের ছেলে উচ্চশিক্ষা পাবে, বিলেত যাবে—উন্নতপদে অধিষ্ঠিত হবে—অথচ অনাচারী হবে না। এ প্রত্যাশা ভুল।

সিনেমার কথা বলছিলে—সিনেমার ট্রেনিংও স্কুল-কলেজেই হয়। স্কুল-কলেজে নাচগান, আবৃত্তি, থিয়েটার ইত্যাদিতে যে-সব মেয়েরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখায় তাদেরই তো কেউ কেউ সিনেমায় যায়।

মেয়েদের বেশভূষা প্রসাধন-প্রীতি ইত্যাদিরও সম্পর্ক আছে স্কুল-কলেজে পড়ার সঙ্গে।

সুরপতি—তবে কি তুমি বলতে চাও—মেয়েদের কলেজে পড়ানো ঠিক নয়—প্রাইভেট পড়ানোই ভালো।

আমি—আমি ভালোমন্দ কিছুই বলছি না। আমি কেবল বলতে চাই—তুমি যে-সবকে অনাচার বলছ সেগুলোর অধিকাংশ নারীশিক্ষার সঙ্গেই হাড়েমাসে জড়িত। আমি তো তথাকথিত অনাচারগুলোর সঙ্গে সন্ধি করতে বলছি—নয়ত অনিবার্য ব'লে এগুলোর জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করতে বলছি।

সুর—মেয়ের বিয়ে দেওয়া যেরূপ শক্ত হয়েছে—তাতে লাভ-ম্যারেজ কন্যাদায়-সমস্যার সমাধান করবে বলতে চাও।

আমি—নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার ফলেই দেশে লাভ-ম্যারেজের প্রতিপত্তি বেড়েছে। এতে একদিকের সমস্যার

সমাধান হচ্ছে, অন্যদিকে নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ছেলে প্রণয়মূলক বিবাহ করলে মেয়ের বাপের কন্যাদায়ের সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়, কিন্তু ছেলের বাপের সমস্যা সঙিন হয়ে ওঠে। এরূপ বিবাহের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক বিচ্ছেদ ঘটে। পিতার অমতে বিবাহ করলে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ ঘটবারই সম্ভাবনা বেশি। বিবাহে পণযৌতুকাদি কিছু পায় না বলে একটা ক্ষোভও হ'তে পারে, সেটা বড় কথা নয়। যদি অসবর্ণ বিবাহ নাও হয়—তা হলেও এরূপ বিবাহ একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। যারা প্রেমাত্মক বিবাহ করে,তারা পুরাপুরি প্রেমাত্মক দাম্পত্যজীবনও যাপন করতে চায় অর্থাৎ দেবদারু চূড়ায় কপোত-কপোতীর জীবনই তাদের লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই পরিবার থেকে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে পনেরো আনা।

মেয়েরা পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর—অনেকে আরো বেশি বৎসর বাপের বাড়িতেই প্রতিপালিত হচ্ছে—উচ্চশিক্ষা লাভ করছে—বাপের বাড়িকেই নিজের বাড়ি বলে মনে করে আসছে। বিয়ের পর তারা সহজে শ্বশুরবাড়িকে নিজের বাড়ি বলে মনে করতে পারে না—সম্পর্কটা তাদের বাপের বাড়ির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ থেকে যায়। কেবল তাই নয়, স্বামীরাও অনেকেই শ্বশুরবাড়িরই ভক্ত হয়ে পড়ে। বাপ যদি বহু ব্যয় ক'রে উচ্চশিক্ষা দিয়ে বহু ব্যয়ে সুপাত্রে কন্যা দান করে, তবে কন্যার পক্ষে পিতৃগৃহের প্রতি অতিরিক্ত কৃতজ্ঞ থাকা কি স্বাভাবিক নয়? এই কৃতজ্ঞতার কি নিন্দা করবে?

বিয়ের জন্য মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়—কিন্তু উচ্চশিক্ষা পেয়ে অনেক মেয়ে বিয়ে করতেই চায় না—স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বিনী হয়ে জীবন কাটাতে চায়। নয়ত পুত্রের মতো পিতৃসংসারই পালন করে। তাকে কি অনাচার বলবে?

শিক্ষাই মেয়েদের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলছে, কাজেই তারা নির্বিচারে বিনা বাক্যব্যয়ে সব কিছু মেনে

নিতে পারে না। এতে মেয়েদের নির্লজ্জ উদ্ধত বলে কি গাল দেবে? অন্যায়, অসত্য, অবিচারের প্রতিবাদ তারা করবেই।

উপার্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা যুবকদের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হ'তে বাধ্য হয়েছে—তাদের যোগ্যতারও অভাব নেই, স্ত্রীলোক বলে কর্মক্ষেত্রে তাদের বর্জন করা চলে না। আর্থনীতিক সংকটের দিনে উপার্জন করাকে একটা অনাচার মনে করা চলে না, যদিও তাদের পুরুষের মতোই জীবনযাপন করতে হয়। শিক্ষিতা মেয়েরা যদি সেকালের বধূ-জীবন যাপন করতে না পারে এবং শ্বশুরসংসারে ক্রীতদাসী হয়ে না থাকতে পারে—তবে তাদের নিন্দা করা চলে কি?

এ-যুগে পুরুষদের কর্মজীবনে অবসর নেই বল্‌লেই হয়—সংসার-জীবনে কখন কি প্রয়োজন মেয়েদেরই তা ভাবতে হয়। সংসারের প্রয়োজনে মেয়েদের যদি হাটবাজারে বা প্রয়োজনের তাগিদে নানা কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়—তবে তাকে অনাচার বলতে পার না।

ইউরোপ সুসভ্য দেশ—পুরুষরা নির্বিচারে সে-দেশের অনুকরণ করতে থাকবে আর মেয়েরা শিক্ষিতা হয়েও এ-দেশের মামুলী প্রথায় জীবনযাপন করবে এ প্রত্যাশা তুমি করতে পার না। তারা ইউরোপীয় মেয়েদের জীবনযাত্রার খবর রাখে—তাদের সমাজে যা দূষণীয় নয়,—তা এ-দেশের মেয়েরা অনুসরণ করবেই।

নানা কারণে একান্নবর্তিতা ভেঙে গেছে —নারীশিক্ষা তার একটা কারণ। স্বামীর বিয়োগ হ'লে বা স্বামী অক্ষম হয়ে পড়লে কি দুর্দশা হয় তা তারা ভালো করেই বোঝে। তাই শিক্ষিতা হলেই তাদের ভবিষ্যৎ-চিন্তাটা খুবই প্রবল হয়—তারা সেজন্য ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। তার ফলে, স্বামীর উপার্জনের অংশ অন্য কাউকে দিতে তারা ইতস্তত করবেই। স্বামীর আয় যদি প্রচুর না হয় ভবিষ্যৎ-চিন্তা ক'রেই শিক্ষিতা মহিলারা উপার্জন করবার চেষ্টা করে—একে তো তুমি অনাচার বলতে পার না।

স্ত্রী-শিক্ষার সঙ্গে একান্নবর্তিতার সামঞ্জস্য হয় না। আজকাল

যে সকল পরিবারে একান্নবর্তিতা আছে সেগুলিতে তা আছে কেবল আর্থনীতিক সংকটের তাড়নায়।

স্ত্রীশিক্ষা, তজ্জনিত নারীজীবনের মূল্য মর্যাদাবোধ, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, বিলম্বিত বিবাহ, বর্তমান যুগের আর্থনীতিক সংকট, দূরদর্শিতা এই সমস্তের সমবায় শিক্ষিতা মহিলার অঙ্কে সন্তান-সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। শিক্ষিতা মহিলারা আর বহুপ্রসবিনী হয় না। তারা জানে—মনের মত ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে না পারলে সন্তানের জননী হওয়া মহা-অপরাধ।

দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট, শোকতাপ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এড়িয়ে নিরুপদ্রবে সাংসারিক জীবনযাপন করতে হ'লে বহুসন্তান কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। এই মনোভাবও তো চিরাচরিত ধারার প্রতিকূলতা।

আমি যে সকল আচার-আচরণের কথা বললাম—তোমার মতে অনাচার হলেও বর্তমান যুগধর্মের পক্ষে স্বাভাবিক ও অনিবার্য—এ সবের সঙ্গে সন্ধি ক'রে চলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অপ্রত্যাশিত এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত যে কিছুই ঘটছে না—তা নয়, তবে তাতে চমকে উঠবার কারণ নেই, ঘরে ঘরে তা ঘটছে না। আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটত—তথাকথিত সভ্যতার পটভূমিকায় তার রকমফের হয়েছে মাত্র। সংবাদপত্রের প্রচার খুব কম থাকায় এখনকার মতো তা এতটা প্রচারিত হ'ত না।

সুরপতি, পঞ্চাশ বৎসর আগেকার মতি-বুদ্ধি নিয়ে এ-যুগের আচরণের বিচার কোরো না। বাংলাদেশ এখন একটা বিচ্ছিন্ন দেশ নয়। তার চিরাচরিত মামুলি ধারাকে ধরে থাকবে সে প্রত্যাশা কোরো না! শেষজীবন যদি শান্তিতে কাটাতে চাও তবে চোখকান বুজে যুগধর্মের সঙ্গে সন্ধি করো।

বর্তমান সভ্যতার যে-কোন অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে দেখবে—তথাকথিত অনাচারগুলি একই বৃক্ষের ফল। এই বৃক্ষের কলম ভাস্কো-দা-গামা জাহাজে ক'রে একদিন নিয়ে এসেছিলেন।

আদর্শ পাঠক

যাচ্ছিলাম কাশী—গাড়ীতে ভিড় ছিল না। হাওড়া ষ্টেশন পার হতে না হতে খবরের কাগজ পড়া শেষ হয়ে গেল। পাশে কোটপ্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক একমনে বাংলা নভেল পড়ছেন। বইখানা নতুন কেনা। তার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু সহযাত্রী একেবারে পুষ্পে মধুকর সম তদ্‌গত।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি বই পড়ছেন ?

আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন—নীলাঙ্গুরী।

আমি লেখকের নাম জানলেও শুধালাম—কার লেখা ?

সহযাত্রীটি একবার টাইটেল পেজটা দেখে নিয়ে জবাব দিলেন—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তারপর বল্লেন—এই সেদিন ঘাটশিলায় যিনি হঠাৎ থ্রম্বোসিসে মারা গেলেন—জানেন না ? নাম শোনেন নি ?

আমি—বিভূতি মুখুয্যে মারা যান নি, বিভূতি—

সহযাত্রী—আমার ভাই তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে চাকরি করেন, আর আমি জানি না ?

দেখলাম—এর বুদ্ধিভেদ না করাই ভালো—একে নিয়ে পথটা বেশ আমোদেই কাটবে। বললাম—ওঃ, তাহলে আপনার খবরই ঠিক (বিভূতি মুখুয্যে ভায়ার পরমায়ু বৃদ্ধি হোক)। আপনি বুঝি খুব বই পড়েন ?

সহযাত্রী—পড়ি বলে পড়ি ? জেগে থাকতে একদণ্ডও বই ছাড়া থাকিনা—পথ চলতে, বাথরুমে, খাওয়ার সময়ও বই পড়ি। আফিসের ড্রয়ারে বই থাকে। কাজ করি এক চোখে, আর বই পড়ি আর চোখে। বই না নিয়ে ট্রেনে উঠি না।

আমি—এত বই পান কোথা ?

সহযাত্রী—কেন ? তিন চারটা লাইব্রেরীর আমি মেম্বর, একটার

সেক্রেটারী। তা ছাড়া, মাসে পঁচিশ টাকার বই কিনি; সঙ্গের সুটকেসটি সম্পূর্ণ ভর্তি ক'রে কলকাতা থেকে আসছি। ডি-এম লাইব্রেরীর দোকানের ভাউচার দেখবেন?

আমি—কি বই, সব বাংলা নভেল ত?

সহযাত্রী—তা ছাড়া আর কি? আপনি মনে করেছেন কবিতা, নাটক, ইতিহাস, ধর্মপুস্তক? ইংরেজি নভেল পড়বার চেষ্টা করেছি—তাতে আনন্দ পাইনা। শেষ হতে চায় না। মনে হয় পরীক্ষার পড়া পড়ছি। বাংলা নভেল মাসে মাসে এত বেরোচ্ছে যে তাই পড়ে শেষ করতে পারি না—তার ওপর আবার ইংরেজি!

আমি—কবিতার বই পড়েন না?

সহযাত্রী—দূর দূর—কবিতার কি অর্থ হয়? ওসব গান করা চলে, কবিতা তো পরীক্ষার পাঠ্য। পাঠ্যপুস্তকে যা পড়েছি তাই যথেষ্ট।

আমি—আপনার বাড়ী কোথা?

সহযাত্রী—আসানসোলের কাছে একটা গ্রামে। চাকরি করি কলিয়ারীতে। তারাশঙ্করের 'কবি' বই-এর ঝুমুরওয়ালীর বাড়ী ছিল আমাদের গাঁয়ে। তাকে আমি চিনতাম।

আমি—আপনার জেলায় কোন ঔপন্যাসিক আছেন?

সহযাত্রী—আছেন বই কি—শৈলজানন্দ মুখুয্যে।

আমি—তার বাড়ীতো বীরভূম?

সহযাত্রী—আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ, আমি জানিনা? তারাশঙ্করের বাড়ী বীরভূম—তার সঙ্গে গোল করেছেন।

আমি—তা হবে। আপনার জেলায় বড় কবি কেউ আছেন?

সহযাত্রী—আছেন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আমি—কাজী নজরুলের নামতো করলেন না?

সহযাত্রী—তাঁর বাড়ী তো পুরুলিয়া?

আমি—পুরুলিয়া নয়, চুরুলিয়া।

সহযাত্রী—আপনি নতুন কথা শোনালেন। আমার জেলার

কবি হলে আমি গৌরবে ফেটে পড়তাম। আচ্ছা, কুমুদবাবু কি আর বিয়ে করেছিলেন ?

আমি বুঝলাম—কেন এ প্রশ্ন। সহযাত্রী নিজেই বল্‌লেন—'তরী হেথা বেঁধনাক আজকে সাঁঝে' লেখার পর আর বিয়ে করা চলে না। কী হৃদয়ভেদী গান !

আমি—আপনি তো গল্প উপন্যাস লেখকদের সব বইই পড়েছেন। কার বই কেমন লাগে একটু বলুন না।

সহযাত্রী—তারাশঙ্কর ব্যানার্জি, প্রবোধচন্দ্র সান্যাল, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীণ বাবু ইত্যাদির বই আমার ভাল লাগে। লেখকের নামের দিকে তো ঠিক লক্ষ্য থাকে না। সত্য কথা বলতে কি—এত তাড়াতাড়ি পড়ি—যে বইএর নামও মনে থাকে না। কোনটায় কি গল্প আছে তা বলতে পারব না। লেখকদের নামও অনেক সময় পড়ে দেখি না। মনে হয়—সবই তো বাংলা দেশের ঘর সংসারের কথা, বেশীর ভাগ পল্লীগ্রামের কথা, কারখানা কলিয়ারির কথাও থাকে। একই লেখকের সব বই লেখা বলে মনে হয়। কোন লেখক ধরে বা বই ধরে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি কিছু বলতে পারবো না।

আমি—ষ্টাইল বা বিষয়বস্তুর তফাতে কার লেখা কোনটা ধরতে পারেন না ?

সহযাত্রী—ষ্টাইল তো একই, বিষয়বস্তু তো সব বই-এরই একটা, অবৈধ প্রণয়।

আমি—তাহলে যা পড়েছেন—তার কিছুই মনে নেই ? মাথাটা সব সময়েই clean slate থাকে। আপনি আসল গ্রন্থকীট। বোধ হয় ডিকেটটিভ গল্প, ডাকাতির গল্প, ভূতের গল্প ইত্যাদি আপনার খুব ভাল লাগে—এবং সেই গল্পই কিছু কিছু মনে থাকে।

সহযাত্রী—ঠিক ধরেছেন। দীনু বাবু ও শশধর দত্তের লেখা কিছু কিছু মনে আছে।

আমি—রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস কিছু পড়েছেন ?

সহযাত্রী—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো মন্দ নয়। কিন্তু উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে না। ইস্কুলে পড়বার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিছু কিছু পড়েছিলাম—যেমন—নৃপতি বিম্বিসার, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, দুর্ভাগা দেশ, বিঘে দুই জমি।

আমি—আর কারো কবিতার কথা মনে পড়ে ?

সহযাত্রী—কবিতার নাম ভুলে গিয়েছি—২।৪ জন কবির নাম করতে পারি—যেমন—বিজয়রত্ন মজুমদার, প্রিয়দম্বা দেবী, কামিনী-কুমার রায়, অক্ষয় বড়ুয়া, কালিদাস নাগ এইসব। সেসব বহুকাল আগের ব্যাপার।

মনে হচ্ছে, আপনিও বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু খোঁজ রাখেন—আপনাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করি। আজকালকার লেখা নভেলগুলোর কিছুই মনে থাকে না—কিন্তু আগেকার লেখা নভেলের গল্পগুলো সব মনে আছে :—

আচ্ছা, আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর নিশ্চয় পড়েছেন। আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনার কাছে হয়ত ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে ; আচ্ছা, বঙ্কিমবাবু প্রতাপকে মেরে ফেললেন কেন খামকা ? শৈবালিনী বলেছিল, 'এ জীবনে যেন আর দেখা না হয়'—তার জন্যে মেরে ফেলবার কি দরকার ছিল ?

আমি—দেখুন প্রতাপ একটু দূরে দূরে থেকে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু শৈবালিনী পাছে খোঁজ পেয়ে আবার পালিয়ে গিয়ে ধ'রে ফেলে, সেই ভয়ে বঙ্কিম প্রতাপকে একেবারে সাবাড় করেই ফেললেন। শৈবালিনীর অসাধ্য কাজ ত নেই। যে একজন সাহেবের সঙ্গে পালাতে পারে—সে যে প্রতাপের খোঁজ রাখবে না—তা ত' হতে পারে না। শৈবালিনীর পালানোর পথ একেবারে বন্ধ করে দিলেন। শৈবালিনীর সাহস বেড়ে গিয়েছিল কিনা।

সহযাত্রী—বুঝলাম, আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণকান্তের উইলে অমন সুন্দর

ছেলে গোবিন্দলাল, ধনী লোকের আদুরে দুলাল, বঙ্কিম তার সঙ্গে একটা কালো মেয়ের বিয়ে দিলেন কি বলে? তা হতেই ত যত হ'ল গোলযোগ। তার জন্য কি আর সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল?

আমি—ভ্রমরের বাপও ছিলেন জমিদার। তাঁর জমিদারীটা গাফ করার জন্যে কৃষ্ণকান্ত ঐ বিয়ে দিয়েছিলেন—ভ্রমরের ভাই বোন ছিল না। জমিদারীটা গোবিন্দলালই পেত। তা ছাড়া, একটা দুঁদে জমিদারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে সেকালে অন্য সুবিধেও ছিল।

সহযাত্রী—তা না হয় হ'ল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিয়ে করলেই ত গোল চুকে যেত। বঙ্কিম তো বিধবা-বিয়ে বিষবৃক্ষে দিয়েছিলেন—সেখানেও নগেন্দ্রলালের আর একটা বৌ ছিল। এখানেও তাই হ'ত। কৃষ্ণকান্ত বেঁচে থাকতে না হয় গোবিন্দলালের বিয়ে করার সুবিধা হয়নি। তার মরার পর দিব্যি বিয়ে করতে পারত। আমি তো বলি প্রণয় যেমনি হোক একধার থেকে বিয়ে দিয়ে দাও।

আমি—তা পারত। কিন্তু ভ্রমর ছিল দজ্জাল মেয়ে। সে ঝাঁটা হাতে ক'রে দুয়োরে দাঁড়িয়ে থাকত। একবারে ঝাঁটা-পিটে করে বাড়ী হতে তাকে তাড়িয়ে দিত। সে ত শুধু জমিদারের ঘরের বৌ ছিল না—সে ছিল দুঁদে জমিদারের মেয়ে। ভ্রমর আর ভ্রমরের বাবার ভয়ে গোবিন্দলাল সাহস করেনি।

সহযাত্রী—রোহিণীকে মেরে ফেলেই বঙ্কিমবাবু গোল বাধালেন —ওকে কয়েক ঘা চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে গঙ্গা নেয়ে ঘরে ফিরে গেলেই সব লেঠা চুকে যেত। খুন করেই ত যত গোল বাধল। আমি হলে গোবিন্দলালকে জেলে পাঠাতাম।

আমি—বঙ্কিম ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁর একটা কোর্ট কেস-এর দরকার ছিল। আদালতের দৃশ্য ছাড়া হাকিমের কি ক'রে বই লেখা হয়? তিনি গোবিন্দলালকে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারতেন—কিন্তু বই তাতেই শেষ হয়ে যেত।

সহযাত্রী—বঙ্কিমের মেয়েগুলো সব ভারি বোকা। ভ্রমরটা ত খুবই বোকা। সূর্যমুখীটাও কি কম আহাম্মক! নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে গেল—আরে বাপু। কুন্দ ত একটা দাসী তোর! সব চেয়ে বোকা কপালকুণ্ডলা—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। ছিলি ত বাপু একটা কলিয়ারিতে, না, না, বালিয়াড়ীতে—না পেতিস খেতে, না পেতিস পরতে। মতিবিবিটাও কম বোকা নয়, দিল্লীর ঐশ্বর্য ছেড়ে চলে এলো। তারপর সীতারামের শ্রীও কি কম বোকা? পারলি বাঁচাতে সীতারামকে? আচ্ছা, কুন্দকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলবার কি দরকার ছিল? সব ত মিটেমুটে গিয়েছিল।

আমি—কৈ আর মিটেমুটে গেল? তারপর বিধবা বিয়ের জন্য গ্রামে ঘোঁট বাধল। আত্মীয়স্বজন সব ত্যাগ করল, ঠাকুরসেবা বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্কিম তাই তাড়াতাড়ি কুন্দকে মেরে ফেললেন। বিধবা বিয়ে দিয়ে তিনি যে ভুল করেছিলেন, কুন্দকে মেরে তা শুধরে নিলেন। যাক—বঙ্কিমবাবুর বই আপনার ভালো করেই পড়া আছে দেখছি। রবিবাবুর নভেল কি কি পড়েছেন?

সহযাত্রী—রবিবাবুর নভেল আমার ভালো লাগে না—কেমন যেন একঘেয়ে। তার চেয়ে প্রভাতবাবুর বই ভালো। সিঁদূরকৌটায় কেমন খৃষ্টান মেয়েকে হিন্দু করে বিয়ে দিলেন—আগেকার বৌ বিষও খেল না—রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলেও গেল না। সতীন আসে আসুক না, নিজের ঘর সংসার তো থাকল। বই-এর ভিতরে যা হয় হোকগে, শেষে মিলন না হলে কি ভালো লাগে, স্যার?

আমি—রবিবাবুর বই আপনার ভালো লাগবার কথা নয় বটে। তবে শরৎবাবুর?

সহযাত্রী—শরৎবাবুর অনেক বই পড়তে বেশ লাগে। আচ্ছা, শ্রীকান্তের সেই বাঈজীর খবর কি? সে কি আজো বেঁচে আছে?

আমি—শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বও শেষ হলো, সেও মারা গেল।

সহযাত্রী—তার ত অনেক ধনসম্পত্তি ছিল—সে সব কি হলো বলুন ত ?

আমি—কি আর হবে ? সে সব পাবলিশারের কাছে জমা ছিল হয়ত, সেই টাকাতেই শরৎবাবু বাড়ী করলেন, গাড়ী করলেন।

সহযাত্রী—শরৎবাবুর চরিত্রহীনে শরৎবাবু শেষটা ওকি করলেন বলুন ত ?

আমি—কি করলেন ?

সহযাত্রী—নিষ্পাপ নিরীহ উপেন আর সুরধনীর হ'ল যক্ষ্মা—তাঁদের ফেললেন মেরে। যক্ষ্মা রোগ ত সোজা নয়, তিল তিল করে মরা। এ কি ভয়ানক শাস্তি ধর্মের বলুন ত। আর বেঁচে থাকল যত চরিত্রহীন আর চরিত্রহীনারা !

আমি—চরিত্রহীন শুধু বেঁচে থাকল না, অমর হয়েই থাকল। সত্যি—যা বলেছেন। শরৎবাবুর রাগ ছিল চরিত্রবানদের উপর। তাঁর যত সহানুভূতি ছিল চরিত্রহীনদেরই উপর।

সহযাত্রী—কিরণমণিকে পাগল করলেন। তারপর সেও বেশ সেরে উঠল। ওর ত কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল, সব চেয়ে পাজি ঐ মেয়েটা। তারপর দেখুন, সাবিত্রীর তিনকুলে কেউ ছিল না, মেসের ঝি। সতীশ তাকে নিয়েই থাকতে পারত। কোথা থেকে এক কমলিনীর আমদানী ক'রে সতীশের সঙ্গে দিলেন বেঁধে। চরিত্রহীনের সঙ্গে চরিত্রহীনার মিলন বেশ কায়েম করে দিলেই হ'ত। যত সব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ! বই শেষ ক'রে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

আমি—ঠিকই বলেছেন—সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর, দিবাকরের সঙ্গে কিরণমণির, আর উপেনকে বাঁচিয়ে তুলে সরোজিনীর সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে দিলে চমৎকার হ'ত।

আর কোন বই সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে ?

সহযাত্রী—আচ্ছা, পণ্ডিতমশাই-এ নবদ্বীপ—না—বৃন্দাবন বড়

সাধু সজ্জন নিরীহ নিষ্পাপ লোক, তাঁর ছেলেটিকে শরৎচন্দ্র মেরে ফেললেন কি বলে?

আমি—তারিণী মুখুয্যের ব্রহ্মশাপটার কথা মনে করুন। শরৎ-চন্দ্রের সাধ্য কি খণ্ডাবার?

সহযাত্রী—তা বটে। আর একটা বই পল্লীসমাজে মেয়েটার নাম দিলেন রমা, আর ছেলেটার নাম দিলেন রমেশ। ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত বিয়ে দেবেন। দুজনার মধ্যে ভালবাসাও জন্মেছিল।

আমি—বিয়ে কি ক'রে দেবেন বলুন? রমা যে বিধবা!

সহযাত্রী—হাঁ—তা বটে। তবে বিয়েই যদি দিতে পারবেন না, তখন ভালবাসা জন্মানোর দরকার কি ছিল? বিধবা-বিয়ে ত চলে—ওরা জমিদার, অনায়াসে দুজনের বিয়ে হ'তে পারত। আমার মনে হয় স্যার, রমেশের উচিত ছিল রমাকে বিয়ে ক'রে প্রত্যহ চাবকানো! মেয়েটা ভারি বজ্জাত। বিয়ে হলে জব্দ হ'ত।

আমি—শরৎবাবু ভয় করেছিলেন বিয়ে দিলে রমাই রমেশকে ঝাঁটাপেটা করত প্রতিদিন। বেটী বড় ঝগড়াটে।

সহযাত্রী—দত্তা বইখানা আমার খুব ভালো লাগে।

আমি—কেন বলুন ত!

সহযাত্রী—বেহ্মদের কি ঠোকানটিই না ঠুকেছেন এতে! রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের ঠুকতেন মাঝে মাঝে, তার চরম জবাব হয়েছে।

আমি—তাইত, এটা আমাদের খেয়াল হয়নি। এটা দেখছি আপনার আবিষ্কার!

সহযাত্রী—আচ্ছা প্রবোধবাবুর মহাপ্রস্থানের পথের রাণীটি কোথাকার বলুন ত?

আমি—অলীকগঞ্জের রাণী। আচ্ছা, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন বই পড়েছেন?

সহযাত্রী—সবই পড়েছি। আহা, গরীবের ছেলে অপুর জন্য বড় কষ্ট হয়। তার দিদিটার জন্যও বড় দুঃখ হয়। আহা, অচিকিৎসায়

মারা গেল। কি গরীব ওরা! একটা কুইনাইন ইনজেকশন দিলেই —আচ্ছা বইখানায় একটাও পাঁচালীর গান নেই তবু ঐ নাম কেন দিলেন।

আমি—বুঝতে পারেননি? বিভূতি অপুকে নিয়ে কেবল পাঁচাল পেড়েছে—সেইজন্য ঐ নাম দিয়েছে।

সহযাত্রী—ও বইটা আমার তেমন ভালো লাগেনি, সত্যিই কেবল পাঁচাল পাড়া, ওর চেয়ে ঐ দেবযান ঢের ভালো।

আমি ভাবতে লাগলাম গল্পখোর পাঠকের ত এই এক নমুনা। গল্পের জন্য গল্প পড়া আর সাহিত্য পড়া এক জিনিস নয়। যারা গল্পখোর তারাই গল্প-নভেলের বই গোগ্রাসে গেলে এবং উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায়। অবিরত নির্বিচারে যারা গল্প নভেল পড়ে তাদের বই-এর বিষয়বস্তু তো দূরের কথা লেখকের নামও মনে রাখা সম্ভব নয়। তাদের কাছে সমস্ত লেখক মিলিয়ে গল্পকথক মাত্র একজন,—সকল বই তাঁরই।

সহযাত্রী—আপনি তো কলকাতায় থাকেন, আপনি তো আজকালকার গল্পনভেল পড়েন, কারো কারো সঙ্গে আপনার আলাপ আছে হয়ত—

আমি—তা আলাপ আছে বৈকি অনেকের সঙ্গে।

সহযাত্রী—আপনি তাদের বলবেন—আগেকার বইগুলো খুব বড় হ'ত না, পকেটে করে নেওয়া চলত, আফিসে ট্রেনে যেখানে খুসী বা'র করে পড়া চলত। আজকালকার বইগুলোকে লেখকরা ফেনিয়ে ফেনিয়ে এত বড় করছেন কেন? দামও বেড়ে যাচ্ছে—ছদিনে ছিঁড়েও যাচ্ছে। এইগুলোকে কাপড় দিয়ে বাঁধালেই তো হয়—না হয় আরো চার আনা দাম বেশিই নেবেন। আমি তো পাঠাগারের সেক্রেটারি—বলবেন আমার কথা—

আর একটা কথা—আগেকার বইগুলোর ভাষা ছিল বেশ ঝরঝরে সহজ সরল। এখনকার বইগুলোর ভাষা বড়—পেঁচালো—

হচ্ছে। আসল গল্পটাকে পেঁচালো ভাষা যেন আগাতে দেয় না। পাঠকের সময় নষ্ট হয় ঢের। আর একটা দোষ—নভেলগুলোয় কেবল মানুষের দুঃখকষ্টের কথা থাকে। পড়ি বটে কিন্তু মন খারাপ হয়ে যায়—বেশির ভাগ বই-ই ট্রাজেডি। বলবেন—পাঠকরা ট্রাজেডি চায় না। দুদণ্ড আমোদ পাওয়ার জন্য পড়া, আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্টের কি অবধি আছে? তা ভুলবার জন্য বই পড়া। কতলোক দুঃখকষ্ট ভুলবার জন্য নেশা করে—নভেল পড়া আমাদের ঐরকম একটা নেশা, স্যার। নভেল পড়াই আমাদের দুঃখ-জীবনের Recreation. যে বইখানা শেষ করি, রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবি কেমন চমৎকার করে সে বইখানাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়ায় শেষ করা যেত। আমার মনের মতো করে তাই নভেল লিখতে ইচ্ছে হয়। দুই একবার লিখতে শুরু করেছিলাম—দু'চার জনকে শুনিয়েছিলাম—তারা খুব তারিফ করেছিল। কিন্তু ভাবলাম কি হবে লিখে? কেবা কলিয়ারির একজন সুভারভাইজারের বই ছাপবে।

আমি—বেশত লিখুন না—শৈলজানন্দের মতো কলিয়ারির শ্রমিকজীবন নিয়ে লিখুন। বই লেখা শেষ করে কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। প্রকাশের চেষ্টা করা যাবে। 'অরণ্য কুহেলির' মতো সে বইএরও আদর হবে।

সহযাত্রী—শৈলজাবাবুই তো আমার গুরু। তাঁরই অনুকরণে লিখতে শুরু করেছিলাম। আপনি সত্যই উৎসাহ দিচ্ছেন?

আমি—হাঁ আপনি লিখুন। ৫০ খানা নভেল পড়লেই একখানা নভেল লেখা যায়—facts এর permutation combination করে। আপনি তো ৫০০ খানা পড়েছেন। তা ছাড়া নভেল লেখার আসল রহস্য—অভিজ্ঞতা। আপনার অভিজ্ঞতার অভাব নেই। আর ভাষা? পাঁচজনের মুখের যে ভাষা—তাই দিয়েই নভেল গড়ে উঠবে। নিজের জবানী কিছুই লিখতে হবে না। অনেকে এই ভাবে চাঁদা করে দিব্যি নভেল লিখছে।

গাড়ী আসানসোলে এলো, উৎসাহিত সহযাত্রী তাঁর কল্পিত উপন্যাসের প্লট বলতে লাগলেন। গাড়ী যখন ছাড়ে ছাড়ে তখন জিনিসপত্র নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে তিনি নেমে গেলেন। রীতিমত ঠেলে নামাতে হ'ল। জানালায় মুখ রেখে বল্‌লেন—আমি তবে বইখানা লিখি। কথাসাহিত্যের লেখকদের কারো সঙ্গে আলাপ থাকলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন তো? একবার তাঁকে শোনাব।

আমি—১৫ জন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক আমাকে বই উৎসর্গ করেছেন—কাজেই বুঝতে পারছেন তাঁদের সঙ্গে আমার কিরূপ আলাপ?

ভদ্রলোক ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—আপনার নাম ঠিকানা, স্যার—আপনার নাম?

কথার জবাব আর দেবার সময় ছিল না, জানলায় মুখ দিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম সহযাত্রী বিস্ফারিত চোখে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মে।

তোষামোদ

তোষামোদ সাধারণতঃ উৎকোচের অনুকল্প। যেখানে প্রার্থীর অর্থব্যয়ের ক্ষমতা নেই অথবা অর্থব্যয় চলে না, ভেট উপহারও চলে না, সহি সুপারিশও চলে না, সেখানে তোষামোদ ছাড়া উপায় কি?

বাচনিক তোষামোদে কোন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বশীভূত করা যায় কি ক'রে—তা চিন্তার বিষয়। তোষামোদের অর্থ কতকগুলি মিথ্যা কথা ব'লে স্তাবকতা বা অতিরঞ্জিত করে গুণাদির ব্যাখ্যান। কোন চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই মিথ্যাচার কি করে সহ্য করতে পারে? তোষামোদের মত অবমাননা আর কি হতে পারে? একজন কুৎসিত কুদর্শন ব্যক্তিকে মদনমোহন বলা কিংবা কোন কানাকে পদ্ম-পলাশ-লোচন বলা কি ব্যঙ্গ নয়? যে ব্যক্তি সারা জীবন অসদুপায়ে ও দুর্নীতির আশ্রয়ে অর্থ, মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছে, তাকে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বললে কি তাকে আঘাত করা হয় না? অসাধু ব্যক্তি নিজেও জানে সে সাধু নয়, ঐরূপ স্তবে কি তার অপমান বোধ হয় না? একজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি নিজে ভালোরূপেই জানেন, তাঁর বিদ্যার দৌড় কতটা, তাঁকে অদ্বিতীয় জ্ঞানী, দিগ্‌গজ পণ্ডিত ইত্যাদি বললে তাঁর তুষ্ট না হয়ে রুষ্ট হবারই কথা, অন্ততঃ প্রতিবাদ করবারই কথা।

স্তাবকেরা মিথ্যা ভাষণ ও অত্যুক্তির দ্বারা অনেক সময়ে পরিস্তুত ব্যক্তির চরিত্রে আরোপিত গুণাদির অনস্তিত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—তাতে অস্বস্তি অনুভব ও লজ্জা বোধ করার কথা। অন্যান্য ভদ্রসভ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকলে তাদের সম্মুখে পরিস্তুত ব্যক্তি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন না কি?

স্তাবকরা যদি সারাক্ষণ প্রভুদের বেষ্টন ক'রে থাকে, তা হলে

তাঁদের জীবনের কোন ব্যাপারই গোপনীয় থাকে না। নিজের পরিজনগণের মত স্তাবকদের অনুগত মনে করে অনেক সময়ে তাঁরা গোপনীয় কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করেও ফেলেন। স্তাবকেরা অন্যত্র প্রভুর গুণগান করতে গিয়ে অনেক সময়ে গোপন কথা ফাঁস করে দিয়ে প্রভুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় বিজ্ঞাপিত করে।

স্তাবকগণ সাধারণত প্রভুর নিন্দা করে না—কারণ, তারা জানে —দেওয়ালেরও কান আছে। কিন্তু অনেক সময়ে যে বস্তুকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিচারে গুণ বলে কীর্তন করে—তাই যে জাতিগত স্বার্থের দিক থেকে প্রভুর কলঙ্ক সে বিষয়ে খেয়াল রাখে না। যোগ্যতর ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে স্তাবক নিজে যে সুবিধা বা উপকার পেয়েছে তাই জন-সমাজে প্রভুর মহানুভবতা ও সুবিচারের দৃষ্টান্ত বলে প্রচার করে। ফলে, স্তাবকগণের দ্বারা প্রভুর অনিষ্ট কম হয় না।

শিষ্য ও ভক্তগণ যেমন গুরুকে জন-সমাজে অশ্রদ্ধেয় করে তোলে, চাটুকারগণও তেমনি প্রভুকে লোকচক্ষে হীন করে তোলে। বহুগুণান্বিত ব্যক্তিও স্তাবকগণ-পরিবৃত হলে জনসমাজের শ্রদ্ধা হারায়।

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাটুকারদের কার্যসিদ্ধি হয় বাচনিক তোষামোদের কথা ছেড়ে দিলেও ভৃত্যবৎ আনুগত্যের একটা প্রাপ্য আছেই—তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা অবিচার বা অসৌজন্য। তা ছাড়া তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যও তাদের ইষ্টসাধন করতে হয়—যদিও অপ্রসন্ন চিত্তে।

কি ইংরেজি কি বাংলায় অপরের অধীনে স্থায়ী ভাবে কাজ করার নাম—চাকরের (servant) কাজ অর্থাৎ চাকরি (service) অতএব এর সঙ্গে ভৃত্যবৎ আচরণ জড়িত আছে। চাকরি যোগাড়, চাকরি বজায় রাখা, চাকরির দোষত্রুটি মার্জনা, চাকরিতে উন্নতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই ভৃত্যবৎ আচরণের প্রয়োজন—তা আমরা

'চাকরি' কথাটাতেই স্বীকার করে নিয়েছি—কাজেই তোষামোদ অপরিহার্য বলেই স্বীকার করা হয়েছে।

কেবল আপন কর্তব্যনিষ্ঠতা ও যোগ্যতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে চলা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

ব্যক্তিবিশেষের হাতে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা অনেকটা থাকলে চাকরির জন্য উমেদারকে তিনি একটি কথায় বিদায় করতে পারেন—"তুমি অবিরত তোষামোদের দ্বারা প্রমাণ করছ নিশ্চয় তুমি অযোগ্য, তোমার আত্মমর্যাদাবোধ নেই—অতএব তুমি তোমার পদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না।"

প্রতিষ্ঠানবিশেষের অধিনায়ক অনায়াসে বলতে পারেন—"প্রতিষ্ঠানটি আমার পৈতৃক জমিদারি নয়, তোমার উপাসনার জন্য তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারি, পকেট থেকে কিছু দিতে পারি—কিন্তু জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে তোমাকে ঠাঁই দিতে পারি না—স্তাবকতা বা উপাসনা তো যোগ্যতা নয়।"

এরূপ কঠোর উত্তর দেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। শরণাগতকে আশ্রয় দান ক্ষাত্র ধর্ম—ভারতের চিরাচরিত পরমধর্ম,—একথা ভারতবাসীর পক্ষে ভুলে যাওয়া বড়ই শক্ত।

তোষামোদ একটা আর্ট—সকল আর্টের মতো এ আর্টও অনুশীলনসাপেক্ষ। এজন্য শাণিত বুদ্ধির প্রয়োজন। বুদ্ধিমান চাটুকার যখনই প্রবলের তোষামোদ করে তখনই যুক্তি পরম্পরার সাহায্যে ফ্যাক্টস ও ফিগারস পেশ করে প্রভুর প্রশস্তিকে কৌশলে উপস্থাপিত করে, যদিও তার বাগ্‌জাল বিস্তারের অনিবার্য উপসংহার ও সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়—প্রভুর মতো কৃতী পুরুষ ভূভারতে দুর্লভ। দূর থেকে পত্রপুটে পুষ্পাঞ্জলি দানেরও একটা মর্যাদা আছে।

বুদ্ধিমান চাটুকার সামনে এসে নির্জলা তোষামোদ না ক'রে এমন লোকের কাছে অবিরত প্রভুর গুণগান করে যে নিশ্চয়ই সে তা প্রভুর কানে তুলবে

আর একটি কৌশল—স্তবস্তুতি নিজের নামে না চালিয়ে অন্যের নামে চালানো। যেমন—লোকে বলে, অমুক বলছিল, আমার ভাই বলে, সর্বত্রই শোনা যায়—ইত্যাদি ইত্যাদি ভূমিকা।

তোষামোদের মতো শোনাবে বলে বলতে চাই না—সত্য কথা বলতে কি—আপনার মতো—এইরূপ ভূমিকাও করা যেতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বীর নিন্দা, প্রিয়জনের সুখ্যাতি, যার উপর প্রভু বিরক্ত—প্রভুর সামনেই তাকে শাসন বা তিরস্কার করা ইত্যাদির জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না।

তোষামোদ একেবারে বর্জন করার উপায় নেই। পেটের দায়ে, স্বার্থের দায়ে যেখানে তোষামোদে কাজ হয়, সেখানে তোষামোদ করতেই হয়।

তোষামোদ করতে হয় প্রত্যাশায়—নয়ত কৃতজ্ঞতায়। যে জন উপকৃত, সে সামান্য লোক। সম্ভ্রান্ত উপকারককে অন্য কোনও ভাবে উপকারের প্রতিদান দিতে না পেরে বেচারী তোষামোদ করে। তা ছাড়া, সে আর কি করতে পারে ?

দীর্ঘজীবনে কারো কারো কাছে কিছু কিছু উপকার পেয়েছি। জানি, কবিতার মারফত গুণগানের কোন মূল্য নেই—তবু কবিতা লিখে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। জানি এদেশে গ্রন্থ উৎসর্গ করে কোন ফল হয় না, তবু গ্রন্থ উৎসর্গ করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

একে তোষামোদ বলতে চান, বলুন।

কৃতজ্ঞতা ছাড়া প্রত্যাশায় গ্রন্থ উৎসর্গ কেউ কেউ করেন—এভাবে তোষামোদ আদৌ মঞ্জুর হয় না। কারণ, এটা বিলাত নয়, বাংলা দেশ। এর চেয়ে দুই সের সন্দেশের মূল্যমর্যাদা বেশি।

সে কৃতজ্ঞতার সুরা অধরস্পৃষ্টই হয়েছে—গলাধঃকৃত হয় নি দায়ে পড়ে মুখেও কারো কারো তোষামোদ করবার চেষ্টা যে করিনি—তা নয়। কিন্তু দেখেছি ফল হয় না—হয় তোষামোদের নিজস্ব আর্টটা জানা নেই, সাহিত্যের আর্টই স্তাবকতায় লাগিয়ে ফেলি—

নয়ত গলার সুরে স্তুতির কাকুটা ঠিক আসে না,—লজ্জায় স্বরভঙ্গ হয়ে যায়—এজন্য উপাসনায় অঙ্গহানি বা সেবাপরাধ ঘটে যায়। কোন ফল ফলে না। এক একজনের দেখি কেমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে—সকলকেই প্রসন্ন করতে পারে, দুই চারিটি কাকু-ভরা কাকুতিতে। মজ্জাগত বিকর্ষণী দুর্বলতার জন্য বহু তোষামোদেও বিরূপ আত্মীয়জনকে প্রসন্ন করতে পারি নি। জীবন-সংগ্রামে সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রটাই আমার ভোঁতা ও মরচেপড়া।

তোষামোদ করার প্রয়োজন অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। বিশেষতঃ আমার মতো ছা-পোষা লোকের ও কন্যার পিতার। কিন্তু তোষামোদের আর্টটা সবার জানা নেই। সেজন্য সবাই তোষামোদে সিদ্ধকাম হয় না।

নিঃস্বার্থ তোষামোদও আছে। যেমন দেশের বড় বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাহিত্যিকদের আমরা তোষামোদ করি, তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে কোন প্রত্যাশা করি না। এর মূলে আছে গুণমুগ্ধতা। তবে ছোট লেখক যে বড় লেখকের তোষামোদ করে তা একেবারে নিঃস্বার্থ নয়।

কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছোটবড় অনেকের দ্দেশে অভিনন্দনপত্র লিখে দিয়েছি, তাতে বহু কল্পিত গুণের একত্র সমাবেশ করে অভিনন্দিতের চরিত্রে আরোপ করেছি—প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তা নির্জলা তোষামোদ। আমার শুধু অনুরোধরক্ষার জন্য বাণীকে বানরী বানানোই সার হয়েছে। এই পরোক্ষ প্রশস্তি হলো আমার নিঃস্বার্থ তোষামোদ। কোন অভিনন্দিতই জানতে চান নি লেখকটি কে? আমার লাভ তোষামোদকে আর্টে পরিণত করার আনন্দটুকু।

অভিনন্দনপত্র সাধারণতঃ স্তাবকতার ভাষাতেই রচিত হয়। এটা হলো মামুলী প্রথা। অভিনন্দনপত্রে প্রকারান্তরে বলা হয়, তোমার সম্বন্ধে যে প্রশংসা এতে অতিরঞ্জিত ভাষায় উপনিবদ্ধ, তার কিয়দংশ

মাত্র তোমার প্রাপ্য। প্রত্যাশা করা হয়েছে এ প্রশংসা যেন ভবিষ্যতে তোমার সত্যসত্যই পুরাপুরি প্রাপ্য হয়।

তোমার সামনে একটা আদর্শ ধরা হল—সেই আদর্শের নিকটবর্তী হও, 'পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ,' এতে যা মিথ্যা ভাষণ তা যেন তোমার জীবনে সত্য হয়,—এতে যা অত্যুক্তি তা যেন স্বভাবোক্তি হয়। কিন্তু কোন অভিনন্দিতকে বলতে শুনিনি "আপনাদের বক্তব্যের যৎসামান্য আমার সম্বন্ধে সত্য, বাকি অংশ আমার সম্বন্ধে আপনাদের বাঞ্ছনীয়। আশীর্বাদে যেমন সম্ভাব্য অসম্ভাব্য বহু শুভবাসনার কথা থাকে, এও তাই। আপনাদের অভিনন্দন সেইরূপ আশীর্বাদের মতো গ্রহণ করলাম। আদ্যন্ত স্বীকার করে নিতে পারলাম না, যেভাবে আমাকে সজ্জিত করেছেন তাতে লজ্জিতই হলাম।"

অভিনন্দনের উত্তর কেউ লিখে দিতে বললে—এই সব কথাই লিখতাম।

অভিনন্দন শুধু জ্ঞানী, গুণী, দেশনেতা, সাহিত্যিক ইত্যাদির প্রাপ্য নয়। চাকরির রাজ্যে উপরওয়ালাদেরও প্রাপ্য। ইংরেজ আমলে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে রাজপুরুষদের উদ্দেশে এরূপ অভিনন্দনও কিছু কিছু লিখে দিতে হয়েছে। আমার সঙ্গে তাঁদের আলাপও হয়নি—আমারও তাঁদের সঙ্গে আলাপ করার প্রবৃত্তিও হয়নি।

তোষামোদের যতই নিন্দা করা যাক বা তা নিয়ে যতই ব্যঙ্গ করা যাক—কচুরিপানার মতো তোষামোদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে—সমগ্র সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

দেনদার পাওনাদারের তোষামোদ না করে অবশ্য পালিয়ে বেড়ায়, পাওনাদারই দেনদারের দেখা পেলে হাতজোড় করে তোষামোদ চালিয়ে কিছু আদায় করার চেষ্টা করে। ইদানীং বাড়ির মালিককে, কিছু ভাড়া বাড়ানোর জন্য—নয়ত বাড়ির অংশটি দয়া

করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, অন্তত একটা মাত্র ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্য বাড়ির অংশের ভাড়াটিয়ার হাত চেপে ধ'রে কত তোষামোদই না করতে হয়! কারণ, ঘরের অভাবে মালিক বেচারা ছেলের বিয়ে দিতে পারছে না।

গরম পিঠের মতো যাঁদের নভেল বিক্রী হয় অথবা যাঁদের বই পুরস্কৃত হয়েছে প্রকাশকরা যে তাঁদের তোষামোদ করবে, সম্পাদকরা প্রচুর দক্ষিণা দিয়েও যে কাতর কণ্ঠে তাঁদের লেখা প্রার্থনা করবে, নবীন নবীন লেখকরা যে সম্পাদকদের দ্বারে ধরনা দেবে এবং নবীন গ্রন্থকার যে প্রকাশকদের করুণা প্রার্থনা করবে—এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। যে প্রকাশক সময়মতো ন্যায্য প্রাপ্য দেন, তাঁর কাছে আমার মতো অ-নভেলী গ্রন্থকারদের কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে পড়তে হয়—আমাদের ধন্যবাদটা তোষামোদ ছাড়া আর কিছু নয়।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নির্জলা প্রশংসার সমালোচনাগুলো স্তাবকতার মতোই শোনায়। বড় ডাক্তার বা উকিলদের পুরা ফী দিয়েও অনুনয় বিনয় করতে হয়।

ছেলে প্রমোশন না পেলে বা টেস্টে ফেল হলে হেড মাস্টারের তোষামোদ করতে হয় বরাবরই। ইদানীং ছেলে ভর্তি করাতে হলেও তার চেয়ে ঢের বেশী তোষামোদ করতে হয়।

স্কুলকলেজে ছেলেদের তোষামোদ করে বিদ্যাদান করতে হয়। ক্লাসে তাদের গোল থামাবার জন্য শিক্ষককে হাতজোড় করতেও হয়। শুধু বাবা, বাছা সম্বোধনে কাজ হয় না।

নিয়োক্তাকে তোষামোদ করতে হয় অনুজীবীদের, উপরওয়ালাকে তোষামোদ করতে হয় অধস্তন অর্ধাশনী কর্মীদের, কলকারখানার মালিককে তোষামোদ করতে হয় শ্রমিকদের।

বাক্যগুলো দ্ব্যর্থক হ'য়ে গেল। তা হোক, দুই অর্থেই সত্য আছে ক্ষেত্র হিসাবে।

পেট ভরে দুবেলা খেতে না দিলে বা না দিতে পারলেও তোষামোদ দিয়ে বাকীটা পুষিয়ে দিতে হয় অনেক সময় নিযোক্তাকে!

কাউন্টারের মসনদে যিনি বসেন, কাউন্টারের বাইরের জনতার তোষামোদ তাঁর অবশ্য প্রাপ্য। হাটবাজারে একদামে জিনিস বিক্রী হয় না—কাজেই বিক্রেতাদের সঙ্গে তোষামোদের সুরে দরদস্তুর করতে হয় অল্পবিত্ত ক্রেতাদের।

ধনীদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঝি-চাকর রাখেন, তাদের কাজ কম, মাইনে বেশী। তাঁদের ঝি-চাকরের তোষামোদ করতে হয় না। আমাদের মতো ছাপোষা লোকদের একটি ঝি বা একটি চাকরের উপর নির্ভর করতে হয়—তারা না এলেই সর্বনাশ, চলে গেলে দ্বিতীয় বা দ্বিতীয়াকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কাজেই তাদের রীতিমত তোষামোদ করে চলতে হয়।

তোষামোদ আমাদের পারিবারিক জীবনকেও আক্রমণ করেছে —পেনসনহীন পিতা যে ভাষায় যোগ্য পুত্রের সঙ্গে কথা কন, শাশুড়ী যে ভাষায় শিক্ষিতা পুত্রবধূকে কিছু বলতে চান, কোটপ্যাণ্ট পরা শিক্ষিত স্বামী যে ভাষায় সোহাগিনী পত্নীকে কোন খেয়াল বা আবদার হতে বিরত থাকতে বলেন, সে ভাষা শুনলে তোষামোদের মতই মনে হয়।

পারিবারিক জীবনে অশান্তি এড়াবার একমাত্র উপায় তোষামোদের সুরে কথা বলা।

সামাজিক জীবনেও আমাদের সৌজন্য ক্রমে তোষামোদের রূপ ধরছে।

সামাজিক জীবনে তোষামোদ এড়াবার উপায় একেবারেই নেই। আত্মীয়স্বজনগণ কথায় কথায় অভিমান করেন। সকল বিষয়েই ত্রুটী ধরেন, সব সময়েই মনে করেন—যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না তাঁদের, উপেক্ষা করা হচ্ছে, বিভিন্ন স্বজনের মধ্যে

আচরণের তারতম্য হচ্ছে। কাজেই তোষামোদের দ্বারা তাঁদের তুষ্ট রাখতে হয়।

যে সমাজে কন্যাদায়ই সবচেয়ে বড় দায়, সে সমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে বহুজনের দ্বারে দ্বারে তোষামোদ করে বেড়াতে হয়। কন্যার বিবাহ হওয়ার পরও জামাই-বাড়ীকে তুষ্ট রাখবার জন্য সারা বৎসরই তোষামোদ চালাতে হয়। যাতে সেবাপরাধ না হয়, সেজন্য খুবই সতর্ক থাকতে হয়। এ বিষয়ে অন্য দেশের সমাজের সঙ্গে এ দেশের সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়।

গ্রাম্য বিচার

আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন একদিন একটি গ্রামে আমার এক সহপাঠীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম (১৯১০ সালের গুডফ্রাইডের ছুটিতে)।

এ অবশ্য পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। এখন গাড়াগাঁয়ের লোকের মতিবুদ্ধির ঢের পরিবর্তন হয়েছে। আমি সেকালের মতিবুদ্ধির একটা নিদর্শন দিচ্ছি।

সকালবেলায় গ্রামটা ঘুরে এসে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপে একটু বস্‌লাম। নবাগত লোক দেখলে গাঁয়ের উচ্চজাতির লোকেরা আলাপ কর্‌বার জন্য আদর ক'রে কাছে বসাত। আমাকে বসতে ব'লে একটা মোড়া আগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। আমার বাড়ী, মামার বাড়ী, বাপের নাম, জাত, পেশা, বয়স, গাঁইগোত্র (অল্প বয়স বলে 'ব্যাতনটা' জিজ্ঞাসা করেননি) ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করবার পর বললেন—একটু তামাক ইচ্ছে করেন ?

আমি—না, ধন্যবাদ, আমি তামাক খাই না।

ব্রাহ্মণ—ওঃ আপনারা কলেজের ছেলে, সিগরেট খান।

আমি—না, আমি সিগারেটও খাই না। আচ্ছা, ঐ বড় পুকুরটা দেখলাম—ওটা আপনাদের জমিদার বংশের বড়বাড়ীর—না—ছোট বাড়ীর ?

ব্রাহ্মণ—ওটা বড়বাড়ীর, নতুন কাটানো।

আমি—বড়বাবু লোকটি খুবই ভালো দেখছি—গ্রামে অনেক ভালো কাজ করেছেন—দেখছি। ঐ পুকুরটা খুব বড় দীঘি বললেই হয়। দুটা ঘাটও বাঁধানো। এতে গাঁয়ের জলকষ্ট দূর হয়েছে।

ব্রাহ্মণ—তা আর কই হলো ? পুকুর কাটালো, কিন্তু প্রতিষ্ঠা কর্‌ল না। আমরা নিষ্ঠাবান হিন্দু, ও-পুকুরে আমরা নামি না—ভদ্রলোকরা বড় কেউ নামে না—ওটা ছোটলোকদের পুকুর হয়েছে।

আমরা ঐ ছোটবাবুর সেই পুরানো পুকুরেরই জল খাই। শীতের পর হতে জল কমে যায়—তবু সেখানেই আমাদের স্নান পান চলছে। ও পুকুরটায় মাছ খুব—মাঝে মাঝে জাল ফেলা হয়, তাতে জলটা একটু ঘোলা হয় বটে, কিন্তু আমরা একটা ক'রে মাছ পাই। বড়বাবুর পুকুরই হয়েছে, একটি আঁশও আমরা পাই না।

আমি—বড়বাবু তাঁর পুকুরে মাছ ধরালে আপনাদের দেন না ?

ব্রাহ্মণ—না মশায়, ওর বুজরুগী আছে, বলেন জালে মাছ ধরলে পানীয় জল খারাপ হয়ে যাবে। আরে ও জল তো খায় ছোট-লোকে। সে খেয়াল নেই।

আমি—সত্যি, এত ভারি অন্যায় ! গাঁয়ের শতকরা নব্বই জন লোক তো ছোটলোক। তা হলে বুঝলাম ঐ পুকুরেই তো গাঁয়ের বেশীর ভাগ লোকই পানীয় জল পায়। উনি গাঁয়ে একটা স্কুল করে দিয়েছেন, এতে গাঁয়ের খুবই উপকার হচ্ছে ত ?

ব্রাহ্মণ—ছাই উপকার হচ্ছে। যত ছোটলোকের ছেলেরা ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। আমার ছেলেকে স্কুলে দিইনি। তাকে আমি সংস্কৃত পড়াব। বছর পাঁচছয়ের মধ্যে গাঁয়ে রাখাল মুনিশ চাকর বাকর আর পাওয়া যাবেনা, বলে দিচ্ছি। স্কুলে আবার এক হেডমাষ্টার আনিয়েছেন, নীচ জাতের লোক। বামুন ছেলেদেরও তার কাছে পড়তে হচ্ছে।

আমি—সত্যি, এ-ত বড়ই অসঙ্গত। গাঁয়ে একটা তিনি দাতব্য ঔষধালয়ও খুলেছেন দেখলাম।

ব্রাহ্মণ—হাঁ খুলেছেন বটে, তাতেও ছোটলোকেরই সুবিধা হয়েছে ! ওষুধ আনতে গিয়ে দেখেছি—শিশি হাতে যত ছোটলোক। তাদের সঙ্গে বসে থাকতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাই ছাই ভদ্র-লোকদের বস্‌বার জন্য পৃথক বেঞ্চি রাখ, পৃথক ঘর রাখ। ছোটলোক

রোগীদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বস্‌তে হয়। বড়কর্তা আবার নিয়ম করে দিয়েছেন—যে আগে যাবে—তাকেই আগে দেখে ওষুধ দিতে হবে, ব্রাহ্মণ সজ্জন বলে কোন খাতির নেই, ডাক্তারটাও শুদ্দুর। দেব দ্বিজে ভক্তি নেই। দাওয়াইখানা খুল্‌লি খুল্‌লি ভদ্রলোকের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা কর—তা না একবারে এলাহি কাণ্ড। পারৎপক্ষে ওদিকে যাই না। নবীন কবরেজের বড়িই আমার ভালো। তা ছাড়া ওষুধ বলে জলই চালায় কিনা তাইবা কে জানে? আমরা পোষ্টাফিস থেকে কুইনিন কিনে জ্বর হ'লে খাওয়াই। জ্বর হলে ডাক্তারও ডাকি না, কবরেজও ডাকি না। জ্বর মানেই তো ম্যালেরিয়া, তার ওষুধ তো কুইনিন।

আমি—ঠিকই করেন। বড়বাবুর ভারি অন্যায়। ওঁর বাড়ীতে শুনেছি খুব বড় একটা লাইব্রেরি আছে—খুব পড়াশুনা করেন বুঝি সারা দিন।

ব্রাহ্মণ—হুঁ, বড়বাবু বি-এ পাশ ক'রে আর কলকাতার বেহ্মদের সঙ্গে মিশেই ত নাস্তিক হয়েছে। লাইবেরারি করেছে—এদিকে একখানা গুপ্তপ্রেশের পাঁজি কি নিত্যকর্মপদ্ধতি বাড়ীতে খুঁজে পাবে না। লাইবেরারি-ত ইংরিজি আর সংস্কৃত বইএ ভরতি। ওতে আর আমাদের লাভ কি? নিজের দিন কাটাবার জন্যে লাইবেরারি করেছে। ইংরেজি খবরের কাগজ নেয়—তাতে আর আমাদের কি? ছোটবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে গেলে হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী—তিনখানা কাগজ পাওয়া যায়।

আরে মশায় একটা হাতী ছিল, সেটা ছিল গাঁয়ের শোভা, জমিদার বাড়ীর ইজ্জৎ। সেটা বিক্রী করে কিনলে ঘোড়ার গাড়ী। আর ঐ জন্যইত এষ্টেসেনের রাস্তা পাকা হ'ল। বাবু পাল্কী চড়েন না, বলেন কিনা মানুষের ঘাড়ে চড়ে যাওয়া মানুষকে অপমান করা। বেহারাগুলো দুপয়সা পেত—সেটা বন্ধ করে দিলে। তাদের জমি দিয়ে বললে—'চাষ কর' নগদ টাক আর চাষ হ'লো

সমান ? তারা চাষ করবে কি করে ? জমি হলেই তো চাষ হয় না। তারা লোকের ক্ষেতে মজুর খাটে।

আমি—এত ভারি অন্যায়। বড়বাবু কি ঈশ্বরও মানেন না ?

ব্রাহ্মণ—ভগবানই জানেন। তবে মানেন কি করে বলি ? দুর্গোৎসব পূজাপার্বণ ত সব বন্ধ। গুরুপুরুতের প্রবেশ নেই বাড়ীতে। শুনি নাকি ওঁর কে একজন গুরু আছেন তিনি কখনো গাঁয়ে আসেন নি। মাঝে মাঝে বড়বাবু তাঁর আশ্রমে যান। হিন্দুর কিছুই যে মানে না—সে ত ম্লেচ্ছ, নাস্তিক। আরে বাপু তুই হলি শাক্তের ছেলে, নিজের পিতৃধর্ম পালন কর—যেমন করছে ছোটবাবু। মদ ছোঁয় না, মাংস খায় না। মদমাংস খাওয়া ও পিতৃধর্ম ছাড়লি ছাড়লি, বয়েস হয়েছে হরিনাম কর, মালা জপ কর, কেত্তন শোন, দুর্গোৎসব না করিস, দোলঝুলন কর—ব্রাহ্মণবৈষ্ণবদের ভোজন করা। তাও না। ওর ধর্ম কর্ম কিছু নেই। শুনে অবাক হবেন, অর্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নান পর্যন্ত করতে গেল না। বলে কি জানেন —নদীতে ডুব দিলে আবার পুণ্য হয়, পুণ্য এত সস্তা নয় !

জমিদারির কাজকর্ম দেখে ওর পিসতুতো ভাই। জমিদারির কাজকর্ম কিছু বোঝে না—সারাদিনই লাইবেরারিতেই বই পড়ে— মাথামুণ্ডু কি পড়ে কে জানে ? আর ফুলবাগানের সখ আছে—গাঁ ঢুকতে একটা বড় বাগান দেখলেন না ? বৈকালবেলায় ঐ বাগানে গিয়ে মালীদের কাজকর্মের তদারক করে, ফুলের বাগান করেছে— পূজোই যদি না করবি তবে ফুল নিয়ে করবি কি ? পূজোর জন্যে ফুল তুলতে গেলে বাগানের দারোয়ান অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

আমি—বড়বাবুর ছেলেপুলে কি ?

ব্রাহ্মণ—দুই মেয়ে এক ছেলে। ছেলেটা এম-এ পাশ করেছে —তাকে বিলেতে পাঠাবে। একমাত্র ছেলে—ধনী লোক, রোজকার করে খেতে হবে না। তাকে সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে পাঠাতে

চায়। জাতজন্ম মানে না, লোকটার স্নেহ মমতাও নেই। মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়েছে—বড়টার বিয়ে দিয়েছে কলেজের এক মাষ্টারের সঙ্গে। ছোটটার বিয়ে দিয়েছে এক মুনসফের সঙ্গে। জমিদারের মেয়ে, কোথায় জমিদারবাড়ীতে বিয়ে দিবি, তা নয়, গরিবের ঘরে বিয়ে দিলে। আর আমাদের ছোটবাবুর দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছে দুই দুঁদে জমিদারবাড়ীতে। একেই বলে সমানে সমান কাজ। করণকারণ করতে হয় সমানে সমানে। বড় বাবু মেয়েদেরও ইংরেজী পড়িয়েছে—মেমসাহেব বানিয়েছে। তারা জুতো পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনাচারের কথা আর বলবেন না। ছোটবাবুর মেয়ের বিয়েতে সাত দিন ধরে ভোজ, থিয়েটার, বাইজীর গান—আর বড়বাবু মেয়ের বিয়ে দিয়ে এল কলকাতার বাড়ী থেকে। আমাদের বেলায় নেবুডঙ্কা। গ্রামে এসে একটা করে পিতলের কলসী আর এক জোড়া করে কাপড় আর এক থালা মিঠাই বিলি করা হ'ল। বাস্। ছেলের ২৪ বছর বয়স হ'ল। এখনো বিয়ে দেওয়ার নাম নেই। ছোটবাবুর ছেলের বয়স ১৮ বছর, আসছে মাসে এক বড় জমিদার বাড়ীতে তার বিয়ে। এখন হতে আয়োজন হচ্ছে—একলক্ষ টাকা ব্যয় হবে। গড়ের বাছি আসবে। ভালো ভালো বাইজী, তয়ফাওয়ালী আসবে। পুকুরে মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয়েছে। গাঁয়ে চারটা ইন্দারা—বড় কর্তা দিয়েছেন তিনটা—একটা তাঁর কাছারি বাড়ীতে, একটা ছোট জাতের পাড়ায়—একটা ইস্কুল বাড়ীতে। ছোটকর্তা তাঁর কাছারি বাড়ীতে ইন্দারা কাটিয়েছেন খরানির সময়ে জলের অভাব হলে ছোটকর্তার কাছারি বাড়ীর ইন্দারা থেকে আমরা জল নিই।

আমি—কেন বড় কর্তার কাছারি বাড়ীর ইঁদারা তিনি ব্যবহার করতে দেন না?

ব্রাহ্মণ—ঐ ইন্দারায় কে একটা মরা কুকুর ফেলে দিয়েছিল ক'বছর আগে। সেজন্য ও জল আমরা নিইনা—ইন্দারার পঙ্কোদ্ধার

ক'রে ওঁর বাড়ীর লোক দিব্যি ব্যবহার করছে। অশুচি হয়ে গেল ইন্দারা—তার শাস্ত্রমত অঙ্গসংস্কার হয়নি।

আমি—দুভাইএর মধ্যে কিরূপ ভাবসাব, ঝগড়াঝাঁটি নেইত?

ব্রাহ্মণ—এক হাতে ত তালি বাজে না। বড়বাবু বড় ভীতু লোক—ছোটবাবু দুঁদে লোক। বড়বাবু ভয়ে ভয়ে ছোট বাবু যা চেয়েছেন তাই ছেড়ে দিয়েছেন। ছোটবাবুর কোন কাজে বড়বাবু বাধা দিতে সাহস করেন না—কাজেই ঝগড়াঝাঁটি নেই। তবে ছোটবাবু বলে—'দাদাত অনাচারী নাস্তিক, কাজেই আমাকে রায়বংশের মানইজ্জত, কুলপ্রথা, ধর্মকর্ম সব বজায় রাখতে হবে। কি করব, আমারই দিন দিন দেনা হয়ে যাচ্ছে।' ছোটবাবু সম্পত্তির প্রায় দশ আনা পেয়েছেন। ছোটবাবু বীরপুরুষ। জানেনত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ছোটবাবুরই ষোলআনা মালিক হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত হবেনও তাই। ছোটবাবুর পাঁচ ছেলে—বড়বাবুর এক ছেলে, তারও আজো বিয়েই হ'ল না। আবার যাচ্ছে ম্লেচ্ছদের দেশে, হয়ত খিরিষ্টান হবে। তা ছাড়া, একটা ছেলে, ভগবান না করুন কিছু একটা হয়ে গেলে ছোট বাবুই ষোল আনার মালিক হবেন। থাকৃগে ওসব কথায় কাজ নেই।

আমি—আপনি বল্‌লেন না ষ্টেশনে যাবার পথটাও ত উনিই খরচ ক'রে পাকা ক'রে দিয়েছেন? তাতে গাঁয়ের খুব উপকারই ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ—হাঁ, তা করেছেন ওঁরই নিজের দরকারে। ওঁর ঘোড়ার গাড়ী আছে—হরদম যাতায়াত করছেন। ছোটবাবু পাল্কি করে যাতায়াত করেন—নয়ত ঘোড়ায় চড়ে যান। ছোটবাবু খুব ভালো ঘোড়সওয়ার, খুব বড় শিকারী। সরকারী লোকেরা হরদম আসছে। তাদের জন্য একটা হাতী আছে। আমরা ত ক্বচিৎ কখনো ও পথে হাঁটি। ওতে আমাদের আর কি ফায়দা বলুন? এই দেখুন না—ঐ অশত্থ গাছটার গোড়া বাঁধিয়ে দিয়েছেন—ওখানে গাঁয়ের লোকে

সন্ধ্যের সময়ে বসে। বল্‌লাম—গোড়া বাঁধালেন খরচ ক'রে বড়বাবু, গাছটা প্রতিষ্ঠা করুন শাস্ত্রমতে। কার কথা কে শোনে? শুনে একটু হাসলেন।

আমি—আপনি বলছেন তবে লোকটি আদৌ ভালো নয়।

ব্রাহ্মণ—ভালো? অধার্মিক, নাস্তিক, দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। বাড়ীতে বারো মাসে কোন পূজা আর্চা নেই, ব্রাহ্মণভোজন নেই।

আমি—ছোটলোকদেরও পাত পড়ে না।

ব্রাহ্মণ—ও বাবা, তা আবার পড়ে না? শুনলে অবাক হবেন বাপ মায়ের দিবসীতে ব্রাহ্মণ ভোজন না করিয়ে গাঁয়ের ছোট লোকদের খাওয়ান। পৌষ মাসে তাদের পিঠেপুলি খাওয়ান। তাদের নিয়ে নবান্ন করেন, বলেন—তারাইত অন্নের মালিক, তারাই অন্নদাতা। হুজুরের মতে আমরা হলাম জমির মালিক, আমরা অন্নের মালিক নই। খাজনা ত আমরাই দি, ছোট লোকে মজুর খাটে। তারা মজুরী নেয়, খাজনা দেয় কারা? তাদের পোয়া বারো, তারাও বড়বাবু বলতে অজ্ঞান। ম'শায় শুনলে অবাক হবেন ভরা তেরস্পর্শের দিন কলকাতা চলে গেল! ওঁর পরিবার নিষেধ করেছিল কত, এমন কি ওর ভাইও বারণ করেছিল, শুন্‌লে না। ভাই বল্‌লে—সব বিষয়েই তোমার গোঁয়ারতমি, ভালো নয়। আমরা ত ভাবলাম বাছাকে আর ফিরতে হবে না।

আমি—কোন বিপদ আপদ হয়নি যখন, তখন আর দোষ কি হয়েছিল?

ব্রাহ্মণ—দোষ নয়? একটা কিছু বিপদ আপদ হতে তো পারত? শাস্ত্র মানলে না ত? নাস্তিক ত? পাঁজিকে যারা মানে না তাদের বিপদ আপদ হবেই বা কেন? তবে শাস্ত্র না মানার শাস্তি পেতেই হবে, আজ না হোক কাল। অশ্বত্থের ডাল ভেঙ্গে পড়ল, ব্রাহ্মণকে দান কর—তা না নিজের বাড়ীতে জ্বালানী কাঠ করলে। অব্রাহ্মণ হয়ে বাড়ীতে অশ্বত্থের কাঠ পোড়ালে,

ম'শায়। আরো শুনবেন ভর সূয্যিগেরণ—দুপুরবেলা। সেই গেরণের সময় দিব্যি চর্ব্য চূষ্য আহার কর্‌ল। রাঙাদি স্বচক্ষে দেখে এসে বল্‌ল। আমরাত অবাক। বড়লোক কিনা, গেরণ মানলে না। জাতজন্ম কিছু মানেনা, গুরু পুরুতের প্রবেশ নেই বাড়ীতে। বাড়ীর দেওয়ালে একটা দেবদেবীর পট নেই, যত দাড়িওয়ালা মানুষের আর চাপকান-কোট-পেন্টালুন পরা লোকের ছবি। গান বাজনার সখ আছে কিন্তু কীর্তন কোনদিন হয়না। কলকাতা হতে সব বাবু লোকেরা আসে তাদের গানের মজলিস বসে—আমাদের ডাকে, তা গান শুনতে যাই। কিন্তু আরে রামঃ, সে গান কি শোনবার মত? হিন্দী গান, একবর্ণ বোঝা যায় না। রামপ্রেসাদ, দাশু রায়, হরু ঠাকুর, নীলকণ্ঠ এসব মহাজনদের গান নয়, ম'শায়। কেৰ্ত্তনের ত নামগন্ধও নেই। গান শোনার নেমন্তন্ন, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পাট নেই। কতখন আর থাকা চলে? একটা গান ধরলে ওস্তাদ থামতে চায় না, না থামলে তো আসা যায় না, একবার গিয়ে আসরে বসলে পালিয়ে আসার সুযোগ পাওয়া যায় না।

গ্রাম্যদেবতার মন্দিরের নাটমন্দিরটা বড় গিন্নীমা তৈরি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কর্তা একদিনও মন্দিরে প্রণাম করতে যান না। মা বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, পুষ্কর, দ্বারকা আরও অনেক তীর্থে যেতেন, এখন যান পাহাড় পর্বতে। মা ঠাকরুন বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণভোজন হ'ত। এখন আমরা নিমন্ত্রণ পাই পয়লা বৈশাখ, কর্তার নিজের ও ছেলের জন্মতিথিতে; জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায়, দোল পূর্ণিমায় আর মহালয়ায়। একে ব্রাহ্মণভোজন বলা যায় না, কারণ বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য ইত্যাদি জাতির লোকদেরও নিমন্ত্রণ থাকে।

আমি—গাঁয়ে মহামারী হয় না?

ব্রাহ্মণ—চৈত্র বৈশাখে কলেরা হয় চিরকাল যেমন হয়ে আসছে

তেমনি। বড়বাবু বলেন গাজন চড়কের মেলা বন্ধ করে দাও, তা হলে কলেরা বন্ধ হবে, তা গাঁয়ের লোক শুনবে কেন? ছোটবাবুও শুনবেন কেন? বাবা বুড়ো শিবের ধর্মরাজের মেলা, তা-কি বন্ধ হতে পারে? আপনিই বলুন। বড়বাবু বলেন পুকুরের জল খেয়ো না, পুকুরের জল খাওতো ফুটিয়ে খাও। পুকুরের জল সকলেই খায়, যদি জলের দোষ হবে তবে কারও বা রোগ হয়, কারো হয় না কেন? যার দিন ফুরিয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ছোটবাবু গ্রাম্য দেবতার মন্দিরে প্রত্যহ পূজা দেন এই সময়ে, সন্ধ্যার সময়ে পথে পথে নগর সংকীর্তনের জন্য আটখানা খোল কিনে দিয়েছেন, তাতে বৈশাখের মাঝামাঝি মড়ক থেমে যায়। দেবদেবীর রোষ কি জল ফুটিয়ে কাটানো যায়? তবে মড়কে ভদ্রলোক বেশি মরে না, ছোটলোকই মরে বেশি। বড়বাবু তো চৈত্রবৈশাখে সপরিবারে পাহাড়ে থাকেন।

আমি—কখন কোন খাবার জিনিস আপনাদের বাড়ীতে পাঠান না?

ব্রাহ্মণ—মিথ্যে বল্ব না। আষাঢ় মাসে তালুক হতে আম কাঁটাল এলে পাঠায়। শীতকালে নাগড়ি ভরা খেজুর গুড় পাঠায়, আর পূজার সময় বড় গিন্নী একখানা করে শাড়ী আর কিছু মিষ্টি পাঠান।

তবে শুনছি নাকি ছেলেকে বিলেত পাঠাবে। তা হলে ওটুকুও আর নিতে পার্ব না। ম্লেচ্ছর দান ত নেওয়া যায় না।

মস্ত লোক হচ্ছে ছোটবাবু—হাঁ জমিদার বটে, দেবতুল্য লোক—দেবদ্বিজে কত ভক্তি!

আমি—শুনেছি ছোটবাবুর চরিত্র খারাপ, আর মদ খান।

ব্রাহ্মণ—দেখুন জমিদার মানুষ, বয়স কম, ও দোষটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তা ভদ্রলোকের ঘরের বৌ-ঝি নিয়ে টানাটানি কখনো করেন না। অসতী ছাড়া অন্য মেয়ের দিকে ওর নজর নেই। যারা আছে বাড়ীতেই আছে। কলকাতা হতে কখনো-সখনো বাইজিরা

আসে গানবাজনা করতে। তারা কয়েক দিন থেকে যায়। আর মদ খাওয়ার কথা বল্লেন? ওঁরা যে শাক্ত, কালীপূজা রয়েছে বাড়ীতে। প্রসাদী ক'রেই কারণ খান। তা কখনো রাস্তায় মাতলামি করা কি শুঁড়িবাড়ী যাওয়া সে সব নেই। বিলাতী মদ খান, সরকারী লোকেরা আসে তাদের ত দিতে হয়। তাড়ি, পাঁচুই এসব খান না। এসব দোষ একটু-আধটু না থাকলে কি জমিদার মানায়? আমাদের সঙ্গে তবে তাঁদের তফাৎটা কি?

আমি—আর শুনেছি ছোটবাবু বড় হুঁদে জমিদার, প্রজার উপর অত্যাচারও করেন খুব।

ব্রাহ্মণ—আজকাল কি নিরীহ গোবেচারী হয়ে থাকলে জমিদারি চলে? লেঠেল রাখতে হয়েছে। ঐ হাজারীর চর নিয়ে বিনোদপুরের ঘোষবাবুদের সঙ্গে এইত সেদিনও দাঙ্গা হয়ে গেল—খুনজখম হলো। শেষ পর্য্যন্ত ছোটবাবুরই জয়। তদন্ত হ'লো—সব চুপচাপ হয়ে গেল। ছোটবাবুর সঙ্গে সরকারী লোকদের দহরম-মহরম। সরকারী মহলে ছোটবাবুর মান কত? রায় বাহাদুর হয়েছেন, শীঘ্রি রাজা বাহাদুর হবেন। বড়বাবু বড় ভাই হয়ে কই একটা খেতাবও ত পেলেন না। ছোট লোকেরা তো খেতাব দেয় না, খেতাব দেয় সরকারী কর্তারা। তাদের সঙ্গে দোস্তি রাখতে হয়, বড়বাবু তাদের গ্রাহ্যও করে না। প্রজারা সব ছোটলোক—জানেন ত আজ কাল ছোটলোকের বাড় বেড়েছে—তাদের জবরদস্তি শাসন না করলে চলে না। যেমন কালকল্প বাবুর আমাদের তেম্‌নি ব্যবস্থা। একটি ছিদেমও খাজনা বাকি পড়তে পায় না। আর বড়বাবুর দেখুন গে—কত বাকি খাজনা। বছর বছর কত খাজনা মাফ দিতে হচ্ছে। ছোটবাবুর নায়েব গোমস্তারাও বড়লোক হয়ে গেল। ছোটবাবুর তরফে কাজ পেলে কেউ বড় তরফে কাজ করতে চায় না। বড়বাবুর তরফটা হয়েছে আমলাদের শিক্ষানবিশীর ঠাঁই—কাজকর্ম শিখে গেলেই ছোটবাবুর তরফে এসে বেশ দু-পয়সা

কামায়। পৈতৃক জমিদারি পেলেই হয় না। জমিদারি রাখবার বুদ্ধি, তাগত আর সাহস চাই।

আমি—ছোটবাবুর বাড়ীতে খুব পূজা আর্চার ধূম বুঝি ?

ব্রাহ্মণ—ধূম ব'লে ধূম ! বারো মাসে তের পার্বণ। ছুর্গোৎসবের ঘটা এ অঞ্চলে এমন আর কোথাও হয় না। নবমীর দিন প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়ী একটা করে গোটা পাঁটা। ব্রাহ্মণভোজনত লেগেই আছে। ছোটবাবু খুব ধার্মিক লোক—প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করেন—আরতির সময়ে পূজার দালানে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় রক্তচন্দনের ফোঁটা কপালে প'রে যখন 'মা মা' ক'রে ডাকেন দরাজ গলায়, তখন মনে হয় মা স্বয়ং প্রতিমার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। ছোটবাবুর গায়ে জোরও খুব, নিজের হাতে মহিষ বলিদান করেন।

ছোটবাবু হাতী চড়ে শিকারে যান, ঘোড়ায় চ'ড়ে মহালে যান, দাঙ্গাও তদারক করেন। আমরা পাড়াগাঁয়ে থেকেই থিয়েটার দেখি, ওঁর নিজের থিয়েটার আছে। বাপ-মার দিবসীতে প্রেমদাস, রামানন্দ, রাধিকে সরকারের কেত্তন হয়, পূজার সময়ে যাত্রা হয়, থিয়েটার হয়, কবির লড়াই হয়, শিবের গাজনেও ঘটা খুব। সব পার্বণেই দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্। দরাজ দিল, দরাজ বুক, দরাজ হাত। কাউকে দশ চাবুক মারলে দশ দ্বিগুণে বিশটাকা বকশিস দিয়ে দেন। ছোটবাবুর চাবুক খেলেও লাভ। ছোটবাবুর চাবুক খাওয়ার জন্য অনেকে ঘুরঘুর করে। ছোটবাবু এনটেসও পাশ করেন নি কিন্তু মুখে ইংরাজি যেন তুবড়ী ছোটে, সাহেব সুবোরা থ' মেরে যায়। ছোটবাবু সাহেবদের সঙ্গে খানা খান বটে, কিন্তু দেবদ্বিজে কি ভক্তি !

আমি হিসেব করে দেখেছি ছোটবাবুর বাড়ীতে বছরে ২০।৩০ দিন নেমন্তন্ন থাকে। কাঙালীচরণ চক্রবর্তীকে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ান—চক্রবর্তী খুড়ো ৬৫ বৎসর বয়সে ৫০টা পানতুয়া, ৩০টা রসগোল্লা, এক হাঁড়ি দই, একহাঁড়ি ক্ষীর খেতে পারেন কিনা।—

হাঁ ব্রহ্মতেজ বটে! ছোটবাবুর বাড়ীতে কি বড় বড় লুচি জানেন—গোটা থালা ভ'রে যায়—বালিশের মত এক একটা পানতুয়া। ধরুন পূজোর তিনদিন তিন, লক্ষ্মীপূজার দিন চার, কালী পূজোর রাতে পাঁচ—নবান্ন ছয়—

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্‌লাম—ও হিসেব শুনে কি হবে? আমি এখন আসি। ছোটবাবুর জয় জয়কার হোক। বড়বাবুর বাড়ীতে মস্ত বড় লাইব্রেরি আছে, সেটা দেখি গিয়ে।

পূজার বাজারে সাহিত্য

পরিমল বিজয়ার পর প্রণাম করতে এসেছিল। পরিমল ইতিহাসের অধ্যাপক, ইতিহাস ও সংস্কৃতে এম-এ, সংস্কৃতে সেকেণ্ড ক্লাস, ইতিহাসে ফার্ষ্ট ক্লাস। থিসিস সাবমিট করেছে। সে ইদানীং বাংলায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছে। থিসিস লিখতে গেলে অনেক মালমশলা যোগাড় করতে হয়, কাজেই থিসিস পেশ করে তার পক্ষে প্রবন্ধ লেখা খুবই সোজা। তবে বাংলা লেখায় সে নবব্রতী। সে বললে, পূজাসংখ্যার কাগজগুলো পড়ে কদিন কাটালাম—পড়ে হতাশ হয়ে পড়লাম। যে লেখা পড়ে কিছু জ্ঞান লাভ করা যায়, এমন তো কিছু চোখে পড়ল না।

আমি—পূজাসংখ্যাগুলি জ্ঞান পরিবেশনের জন্য প্রকাশিত হয় না। এগুলি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের চিত্ত-বিনোদন বা অবকাশ রঞ্জনের জন্য পরিকল্পিত। গল্পের বাজারে ভাল লেখা পাবে কেন? পটুয়াটোলায় দই কিনতে যাওয়া ধৃষ্টতা!

ছবিগুলো দেখে বুঝতে পার না—ও সব পত্রিকা কাদের জন্য?

পরিমল—চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধাদি না পেয়ে গল্পগুলোই তো পড়লাম। যেসব লেখকের ভাল ভাল গল্প পড়েছি—তাদের গল্পগুলিই তো বেছে বেছে পড়লাম কিন্তু সে-সব তাদের লেখা বলে মনে হয় না। অধিকাংশ লেখা পড়ে মন তো রসায় না, বরং বিষায়।

আমি—পূজার সময়ে সকল ব্যবসারই একটা মরশুমের সময়—পূজাসংখ্যা বার করাও একটা ব্যবসা ছাড়া কিছু নয়। যে বস্তুর চাহিদা বেশি থাকে তারই ভূরি পরিমাণে সরবরাহ করাই তো ব্যবসায় সাফল্যের নিদান। পূজাসংখ্যাগুলি বৃহদাকারে প্রকাশ করা একটা ব্যবসা, এই ব্যবসার মুখ্য উপাদান বিজ্ঞাপন, গৌণ উপাদান—গল্প এবং সেইরূপ লঘুতরল সাহিত্য, আর সিনেমার ছবি। গৌণ হলেও প্রকাশকদের ঐরূপ সাহিত্যের চাহিদা মিটাতে

হয়। যারা এই চাহিদার পণ্য সরবরাহ করে তাদের সংখ্যারও সীমা আছে, তাদের শক্তির ও অবসরেরও সীমা আছে। কাজেই অপকৃষ্ট বস্তু চালাবার এই তো সুযোগ। তবে রাশি রাশি লেখা তো পড়ে ওঠা যায় না—আমি পড়েছি, তুমিও পড়েছ কিছু কিছু, দুজনেই কিন্তু সব পড়ে উঠতে পারি নি। ভাল লেখা কিছু কিছু থাকতে পারে হয়তো, মিস করেছি, অখ্যাতনামার কলমেও ভাল লেখা এক-আধটা আসতে পারে। অল্পখ্যাত লেখকরা ভাল লেখাই পূজা সংখ্যার জন্য রাখে। তাদের যশ নেই, কিন্তু লেখায় রস থাকতে পারে। যশ দিয়ে বশ করতে চেষ্টা না করে তারা রস দিয়ে বশ করতে চেষ্টা করবে তাই তো স্বাভাবিক। তোমার আমার বিচারটাই তো ব্যবসায়ী বা লেখকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়—যাদের জন্য এসব লেখা তাদের ভাল লাগলেই হল—তাদের সময় কাটলেই হল। তাদের ভাল লাগতেও পারে, না লাগতেও পারে। কিন্তু তারা সবই পড়ে। পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেরই আকৈশোর গল্প পড়ার অভ্যাস আছে। তারা সাহিত্যের অন্য শাখার না হোক, গল্পের শাখার ভালমন্দ বিচার হয়তো করতেও পারে। যাই হোক, সে বিচার তো পড়ার পর, কিন্তু পড়ার আগেই কেনা হয়ে যায়—আকারের বৃহত্ব ও বাহ্যশ্রী ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করে। ফলে ব্যবসায়ীদের তাতে ক্ষতি হয় না।

পরিমল—কিছু যশস্বী লেখকের যশোহানি তো হতে পারে ভাল লেখা না যোগাতে পারলে ?

আমি—না, তাও হয় না। পাঠকরা ধরেই নেয়—চারিদিকে তাগিদ, সময়ের অল্পতার মধ্যে লেখাগুলি উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। পূজাসংখ্যার লেখার ত্রুটি তারা উপেক্ষা করে যেতে পারে। তা ছাড়া আমাদের জাতের গল্প পাঠকদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর নয়। কিছু মনে রাখার অভ্যাস তাদের নেই। তাদের অতীতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই—আছে শুধু বর্তমান। তাদের স্মৃতি রাশ রাশি রচনার ভারে

সমাচ্ছন্ন। কার কোনটা লেখা তারা জানতেও চায় না। মনেও রাখে না। অতি ব্যস্ততার ও অনবধানতার সৃষ্টি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। লেখকরাও এ বিষয়ে সচেতন। একজন প্রথম শ্রেণীর কথাসাহিত্যিক আমাকে বলেছিলেন, আমার পূজাসংখ্যার লেখাগুলো পড়বেন না—ও-গুলোকে ধীরে সুস্থিরে রি-রাইট করতে হবে—তার পর বই বেরুলে পড়বেন।

পরিমল—আচ্ছা, অপকৃষ্ট রচনা ও সামান্য দুই-এক পাতা লেখার জন্যও লেখকরা ৫০।৬০—এমন কি ১০০ টাকাও পাবেন তো?

আমি—তা নিশ্চয়ই পাবেন। সম্পাদক লেখা চেয়েছেন—লেখক লেখা দিয়েছেন। সম্পাদক যখন গ্রহণ করেছেন, তখন তার দক্ষিণাও তাঁকে দিতেই হবে। প্রকৃত পক্ষে সম্পাদক চেয়েছেন লেখকের নামটা। লেখার গুণাগুণ বিচার এতে চলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এটা নামেরই দাম। নামজাদা লেখকদের লেখা পড়ে দেখে ছাপতে দেওয়ার প্রথাই নেই। লেখকের মর্যাদা রক্ষাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। আর দক্ষিণার কথা বলছ—পূজাসংখ্যার লেখার মর্যাদা সব চেয়ে বেশি।

পরিমল—পূজার সংখ্যায় অনেক লেখা বেরোয়—সেই ভরসায় আমি দুটো প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তা কয়েকটি পত্রিকায় চালাবার চেষ্টা করলাম—কেউ নিল না। আমি দক্ষিণার লোভ করেছিলাম, তাও নয়। পূজার সংখ্যা ছাপা হয় বেশি, বিক্রী হয় খুব—অনেক পাঠক পাব, এই ভরসায় ছাপতে চেয়েছিলাম।

আমি—বেরুলেও পাঠক পেতে না—কারণ, গল্পের উলুবনে তা হারিয়ে যেত। কেউ পড়ত না।

পরিমল—শক্ত বিষয় নয়—একটা প্রবন্ধের নাম 'প্রাচীন বাংলার কৃষি ও খাদ্যশস্যাদি' আর একটার নাম 'সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় ইতিহাস।'

আমি—বাপ্ রে! ওসব জানার জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই—

স্কুল-কলেজে যে জ্ঞানলাভ হয়েছে, পরীক্ষার গুঁতোয় ও ছুতোয় তারই দাম কে দেয় ঠিক নেই, তার উপর আবার নতুন জ্ঞান? স্কুল-কলেজের বিদ্যাও ভুলে গিয়ে মাথাটা অনেক হাল্‌কা পাতলা হয়েছে—বর্তমান বাংলার খাদ্যশস্যাদির চড়া দামের ঠেলাতেই অস্থির, তার উপর প্রাচীন ভারতের খাদ্য-শস্য? আবার হালকা মাথায় নতুন জ্ঞানের ভার?

পরিমল—ওরা প্রবন্ধ নেয় না, কিন্তু কবিতা তো অনেকগুলো করে ছাপে—কবিতার কি অনেক পাঠক আছে?

আমি—কবিতারও পাঠক নেই। কবিতা সাধারণতঃ তু-বৈ-চ-হি রূপে ফাঁক ভর্তির জন্য ছাপা হয়; তবে পূজায় পাঁচ ফুলের সাজি সাজাতে হয়—শিকার-কাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, রম্যরচনা, কিছু থাকে প্রবন্ধের অনুকল্প স্বরূপ। কবিতাও কিছু দেওয়া হয়। এই তো পাঁচফুল হয়ে গেল।

পরিমল—ফুলের সঙ্গে প্রবন্ধের বিল্বপত্রও দু-চারটা থাকা কি উচিত নয়? আমার প্রবন্ধ দুটো শ্রীভারতী পত্রিকা নিয়েছে—পরে ছাপবে বলে।

আমি—পূজাসংখ্যা বটে, কিন্তু পূজার উপচার তো সাজিতে থাকে না—এ সাজি টেবিলে রাখবার জন্যে, কাজেই বিল্বপত্র থাকবে কেন? শ্রীভারতীতে বেরুলেও পাঠক পাবে না। কারণ, ঐ পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা খুব কম।

পরিমল—তবে প্রবন্ধের কি উপায়?

আমি—উপায় অবশ্যই আছে। প্রবন্ধ লেখ ইংরেজিতে। টাইপ করা কাপি সারা ভারতবর্ষের ইংরেজি মাসিকপত্রগুলিতে পাঠাও, ভারতের বাইরেও পাঠাতে পার, নিশ্চয়ই ছাপা হবে। তোমার তো টাইপরাইটার আছে, নিজেই তো থিসিস টাইপ করেছ। সর্বত্রই সুবিজ্ঞ এডিটার পাবে, তাঁরা আদর করবেন। উত্তরও পাবে, দক্ষিণাও পাবে। তার পর দেশী-বিদেশী প্রকাশকরা

বই ছাপবেন। সাহেব প্রকাশকদের পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের জন্য খুব অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মনীষীরা নিযুক্ত আছেন। ঐতিহাসিক প্রবন্ধে গবেষণার মৌলিকতা পেলে ও নতুন তথ্যের সন্ধান পেলেই তাঁরা লুফে নেবেন। বাংলা দেশে জ্ঞানচর্চা বিলুপ্ত হতে চলেছে, এখানে জ্ঞানবৃদ্ধিব জন্য জ্ঞানগর্ভ রচনার চাহিদা নেই বলে দেশের পত্রিকাগুলি প্রবন্ধবর্জিত হয়ে পড়ছে। ইতিহাসের পটভূমিকায় গল্প বা উপন্যাস যদি লেখ তবে তা বাংলাতেই লিখো। যে ইংরেজিতে লিখতে পারে, তার বাংলায় প্রবন্ধ লেখার কোন প্রয়োজন নেই। ইংরেজিতে লিখলে মুষ্টিমেয় কখানা পত্রিকার মুখাপেক্ষী হতে হবে না—তাদের কৃপার ওপর নির্ভর করতে হবে না। দেশেবিদেশে ফিল্ড খুব বড়, চিঠিপত্রের দ্বারাই কাজ হবে, সমজদার লোক অনেক মিলবে, পাঠক অনেক পাবে, বই ছাপাবার জন্যে প্রকাশকও পাবে। 'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'। বাঙালী জ্ঞানবৃদ্ধি চায় না বলে কোন রাজ্য বা রাষ্ট্রের লোক তা চায় না, তা তো নয়। তুমি ইংরেজিতে লেখ —দেশবিদেশে বহু পাঠক পাবে, আর বাংলার সাহিত্যিকরা যদি তোমার লেখা না-ও পড়ে, তবু তোমাকে খুবই শ্রদ্ধা করবে। আচ্ছা, তুমি দ্বারভাঙ্গায় মানুষ—হিন্দী নিশ্চয় খুব ভাল জান?

পরিমল—হ্যাঁ, হিন্দী তো আমার মাতৃভাষারই মতো।

আমি—তবে তো সমস্যার সমাধান এতেই হয়ে গেল। তুমি হিন্দীতেই প্রবন্ধ এবং যা খুশি গল্প লেখ। সারা ভারতবর্ষে বহু হিন্দী পত্রিকা আছে, তোমার লেখার আদর করবার লোক তা হলে হবে কোটি কোটি। আর্থিক সুবিধাও হবে—নানাভাবে আয়ও হবে। কি কি ভাবে আয় হবে তা আর বললাম না, তবে আর্থিক সুবিধা নিশ্চয়ই হবে। তা ছাড়া, সারা ভারতে, অন্ততঃ সারা উত্তর ভারতে তোমার প্রভূত যশ হবে। বাংলাদেশের ভরসায় থেকো না। যে ইংরেজী লিখতে পারে— হিন্দী লিখতে পারে, তার বাংলা লেখার কোন প্রয়োজন নেই।

